MATRICULATION
BENGALI SELECTIONS

NINTH EDITION

UNIVERSITY OF CALCUTTA
1949

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

* লেখক-পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বৎসর ১৩৪৮ (১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ) সনের স্থলে ভ্রমক্রমে ১৩৪৬ (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) মুদ্রিত হইয়াছে।

গদ্যাংশ

☞ এই পুস্তকে যে সমস্ত রচনা গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য যে সমস্ত স্বত্বাধিকারী আমাদিগকে রচনাবলী-প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রবেশিকার বাঙ্গালা পাঠ্য

[সংকলন]

পদ্যাংশ

রামের বনগমন

কৃত্তিবাস ওঝা

[নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায়-বংশে কবিবর কৃত্তিবাস ওঝা সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাসের পিতামহ ছিলেন মুরারি ওঝা, তাঁহার পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হন। এই গৌড়েশ্বর সম্ভবতঃ রাজা গণেশ। ইনি কবির রচিত শ্লোক-পঞ্চকের অপূর্ব্ব কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিকে অভিনন্দিত করেন এবং বাল্মীকির রামায়ণ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। এই আদেশ-পালনের ফল বঙ্গের অপূর্ব্ব ভাষা-রামায়ণ। আমরা এখন যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাই, তাহা আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণের পরিবর্ত্তিত রূপ—বর্ত্তমান যুগের ভাষায় পুনর্লিখিত।]

বিদায় লইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা-সম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ ভাগ্যদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ॥

চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা কর রাত্রি-দিনে॥
জানকী বলেন দুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
তুমি সে পরমগুরু তুমি সে দেবতা।
তুমি যাও যথা প্রভু আমি যাই তথা॥
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি আন গতি।
স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি॥
প্রাণনাথ কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হ'ব সঙ্গে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে।
দুখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে॥
যদি বল সীতা বনে পাবে নানা দুখ।
শত দুখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ॥
তোমার কারণে রোগ-শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুখ সুখ বলি মানি॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনক দুহিতে।
বিষম দণ্ডকবন না যাইও সাথে॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন কর এ সাহস॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥
পণ্ডিত হইয়া বল নির্ব্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়॥
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
হায় তায় বীর বলে কোন্ বীর জনে॥
বনে বেড়াইতে যদি কুশ-কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥

তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূলি গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সঙ্গে থাকি যদি পাই তরুমূল।
স্বর্ণ-অট্টালিকা নহে তার সমতুল॥
শ্রীরাম বলেন সীতা এই পরীক্ষায়।
বুঝিলাম মনোগত তব অভিপ্রায়॥
বনে বাস হেতু যদি একান্তই মন।
খসাইয়া ফেলহ গায়ের আভরণ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ-অন্তরে।
খুলিলেন অলঙ্কার যা ছিল শরীরে॥
সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা-সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন॥
পিতা মাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর॥
যে-ই তুমি সে-ই আমি বিধাতা তা জানে।
যদি হেথা থাকি একা কি করিবে বনে॥
সীতা সঙ্গে বনে বনে ভ্রমিবে কেমনে।
সেবকে ছাড়িলে দুখ পাবে দুই জনে॥
রাজার কুমারী সীতা দুখ নাহি জানে।
সেবক বিহনে দুখ পাবেন কাননে॥
শ্রীরাম বলেন ভাই যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুকবাণ লহ রে লক্ষ্মণ॥
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্ব্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে॥

পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভাল ভাল বাণ বাছি লইল বিস্তর॥
রাজ্য-খণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কাঁদে সবে নিজ বাসে॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিনজন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রী-পুরুষ কাঁদে যত পায় সবে শোক।
জানকীর পিছে ধায় অযোধ্যার লোক॥

রাখাল রাজা

উদ্ধবদাস

[উদ্ধবদাস নামে দুইজন পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় উদ্ধবদাস, অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি, বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয়বিধ ভাষায় পদ-রচনাতে ইঁহার কৃতিত্ব ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। পূর্ব্ববর্ত্তী উদ্ধবদাসের অনেক রচনা ইঁহার রচনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।]

বিবিধ কুসুম দিয়া সিংহাসন নিরমিয়া
কানাই বসিলা রাজাসনে।
রচিয়া ফুলের দাম ছত্র ধরে বলরাম
গদ্ গদ নেহারে বদনে॥

অশোক-পল্লব করে সুবল চামর করে
সুদামের করে শিখিপুচ্ছ।
ভদ্রসেন গাঁথি মালে পরায় কানাইয়ের গলে
শিরে দেয় গুঞ্জাফল-গুচ্ছ॥

স্তোক-কৃষ্ণ আনাগোনা ঠাঞি ঠাঞি বানায় থানা
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়।
শ্রীদামাদি দূত হৈয়া কানাইয়ের দোহাই দিয়া
চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়॥

করযুগ যুড়ি তথি অংশুমান্ করে স্তুতি
রাজ-আজ্ঞা-বচন চালায়।
বট করে বেদ-ধ্বনি পড়ে আশীর্ব্বাদবাণী
দাম-বসুদাম নাচে গায়॥

অতি মনোহর ঠাট নিরখিয়া রাজপাট
কতেক হইল রস-কেলি।
এ দাস উদ্ধব কয় সখ্য-দাস্যরসময়
সেবয়ে সকল সখা মেলি॥

কালকেতু

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

[মুকুন্দরাম ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের রাজা বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষক ও সভাকবি ছিলেন এবং রাজসম্মান-স্বরূপ 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন। ইনি 'চণ্ডী-মঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।]

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
জিনিয়া মাতঙ্গ-গতি যেন নব রতি-পতি
সবার লোচন-সুখ-হেতু॥

নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার শাবল।
গুণ শীল রূপ বাড়া যেন সে শালের কোঁড়া
জিনি শ্যাম-চামর কুন্তল॥

বিচিত্র কপাল-তটী গলায় জালের কাঁঠী
কর-যুগে লোহার শিকলি।
বুক শোভে বাঘ-নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
তনু-মাঝে শোভিছে ত্রিবলী।

কপাট-বিশাল বুক, জিনি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ-দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন।

দুই চক্ষু জিনি নাটা[১] ঘুরে যেন কুঁচ-ভাঁটা[২]
কানে শোভে স্ফটিক-কুণ্ডল।
পরিধান বীর-ধড়ি,[৩] মাথায় জালের দড়ি
শিশু-মাঝে যেমন মণ্ডল॥

লইয়া কাউড়া[৪] ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন-সংশয়।
যে জনে আঁকিড়ি ধরে পাড়য়ে ধরণী 'পরে
ভয়ে কেহ নিকটে না রয়।

১ নাটা—সোদালজাতীয় একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের ফলের বীজ, আকারে চোখের মত।
২ কুঁচ-ভাঁটা—কুঁচ বা গুঞ্জাফলের মত লাল ও কাল রঙ্গের ভাঁটা বা গোলা।
৩ ধড়ি—ধটী, ছোট মাপের কাপড়,—বীরধটী—বীর বা মালের (মল্লের) মত মাল-কোঁচা করিয়া পরা।
৪ কাউড়া—কাব্‌ড়া, ছোট লাঠি বা ডাণ্ডা।

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, তাড়িয়া শশারু[৫] ধরে
দূরে গেলে ছুবায়[৬] কুকুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে,
কান্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥

শ্যেন-কপোতের উপাখ্যান

কাশীরাম দাস

[বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গি গ্রামে কায়স্থবংশে কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পদবী ছিল "দেব"। শুনা যায়, কথকের মুখে ব্যাসসংহিতায় মূল মহাভারতের ব্যাখ্যান শুনিয়া ইনি বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারত রচনা করেন। কাশীরাম সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত ইঁহার মহাভারত গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে অপরিসীম শ্রদ্ধার সহিত পঠিত হইয়া আসিতেছে।]

লোমশ বলেন ডাকি ধর্ম্মের নন্দন।
শ্যেন-কপোতের কথা করহ শ্রবণ॥
এই যে বিতস্তা নদী শিবিরাজ্যদেশে।
সারসসারসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে॥
উশীনর নামে নৃপ আছিল তথায়।
যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায়॥
যজ্ঞের প্রভাবে ধরা কাঁপে থরথর।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষঃ ভাবিয়া কাতর॥

৫ শশারু---খরগোস 'শশ-রূপ'।
৬ ছুবায়---ছুঃ ছুঃ করিয়া লেলাইয়া দেয়।

সুরপতি চিন্তাকুল কনক-আসনে।
ইন্দ্রত্ব বা নয় বুঝি ভাবে মনে মনে॥
হেনকালে হুতাশন হন উপনীত।
উশীনর-যজ্ঞ-কথা করিল বিদিত॥
উভয়েতে যুক্তি করি অতি সঙ্গোপনে।
বিহগ-বেশেতে যান ছলিতে রাজনে॥
ধরিল কপোতরূপ দেব হুতাশন।
দেবরাজ শ্যেনরূপ করেন ধারণ॥
সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন্।
শ্যেনভয়ে কপোতক লইল শরণ॥
কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে উশীনর।
তোমারে রক্ষিতে দিব প্রাণ কলেবর॥
আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি এ পণ কভু নাহি হবে আন॥
শ্যেন কহে মহারাজ একি আচরণ।
মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ॥
সবে কহে ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা উশীনর।
ধর্ম্মহীন কর্ম্ম কেন কর নৃপবর॥
মহাপাপ খাদ্যে বাধা ক্ষুধার সময়।
ভক্ষ্য ছাড়ি দেহ মোর হয়ে সদাশয়॥
রাজা বলে পক্ষিরাজ কি করিব আমি।
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি॥
কপোত প্রাণের ভয়ে লয়েছে শরণ।
কেমনে কালেরে তারে করিব অর্পণ॥
পরিত্যাগ করে যেবা শরণ-আগতে।
গো-ব্রাহ্মণ-বধসম ভুঞ্জিবে পাপেতে॥
শ্যেন বলে মহারাজ করহ শ্রবণ।
আহার বিহনে নাহি বাঁচে জীবগণ॥

ধনজন ছাড়ি বাঁচে যাবৎ জীবন।
আহার ছাড়িলে জীব না বাঁচে কখন॥
ক্ষুধায় আকুল আমি না সরে বচন।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে যাইবে জীবন॥
আমি যদি মরি তবে আহার বিহনে।
দারাপুত্র আদি মম মরিবে জীবনে॥
এক প্রাণী দিলে যদি বাঁচে বহু প্রাণী।
অধর্ম্ম না হয় তাহে সত্যধর্ম্ম গণি॥
সামান্য লাভেরে ত্যজি বহু লাভ যাহে।
লইবে আশ্রয় তার শাস্ত্রমতে কহে॥
রাজা বলে যদি তব খাদ্য প্রয়োজন।
অন্য খাদ্য খাও তুমি রহিবে জীবন॥
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ মহিষ বরাহ।
এখনি আনিয়া দিব যেই মাংস চাহ॥
শ্যেন বলে অন্য মাংস মোরা নাহি খাই।
কপোত মোদের খাদ্য দেহ মোরে তাই॥
কপোতের মাংস দেহ করিব ভোজন।
এত শুনি সকাতরে কহেন রাজন্॥
শিবিরাজ্য চাহ কিংবা যাহা মোর আছে।
এখনি তা দিব তোমা না ডরিব পাছে॥
যা বলিবে করিব তা যাহে তুষ্ট তুমি।
আশ্রিত কপোতে কিন্তু নাহি দিব আমি॥
এত শুনি কহে শ্যেন শুনহ রাজন্।
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন॥
নিজ মাংসখণ্ড করি কপোতসমান।
দেহ মোরে তুলা-দণ্ডে করি পরিমাণ॥
তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয়।
সেই মাংসে তুষ্ট হব শুন মহাশয়॥

উশীনর নৃপমণি শ্যেনের বচন শুনি
ভাসিলেন আহ্লাদ-সাগরে।
আশ্রিতে রক্ষিনু জানি আপনারে ধন্য মানি
তুলা-যন্ত্র আনিয়া সত্বরে॥
নিজ হস্তে তুলা ধরি নিজ মাংস খণ্ড করি
কপোতের তুল্য করিবারে।
নিজ মাংস যত দেয় তবু নাহি তুল্য হয়
হুতাশন-কপোতের ভারে॥
ক্ষণকাল চিন্তা করি ভক্তিভাবে হরি স্মরি
তুলে বসে নিজে উশীনর।
হেরিয়ে নৃপের মতি শ্যেনরূপী সুরপতি
কহিলেন শুন নৃপবর॥
সুরপতি মম নাম রাজ্য করি সুরধাম
কপোত-বেশেতে হুতাশন।
ধার্ম্মিকতা দেখিবারে মোরা দোঁহে ছল ক'রে
আসিয়াছি তোমার সদন॥
হেরি তোমা ধর্ম্মনিষ্ঠ হইলাম বড় তুষ্ট
বদ্ধ হৈনু তব কর্ম্মফলে।
তোমার মহিমা ভবে যাবৎ ধরণী রবে
ধন্য ধন্য গাহিবে সকলে।

অন্নদার আত্মপরিচয় ও ভবানন্দভবনে গমন

ভারতচন্দ্র রায়

[রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় হুগলী জেলার পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ঐ গ্রামের জমীদার রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ পুত্র। যৌবনে বর্দ্ধমানাধিপতির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া ভারতচন্দ্রকে জন্মভূমি ত্যাগ করিতে হয়। পরে তিনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সভাকবিরূপে সসম্মানে স্থানলাভ করেন। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গল" এবং "বিদ্যাসুন্দর" মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ অনুসারে এই সময়ে রচিত হয়। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ৪৮ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র পরলোকগমন করেন। ইঁহার রচিত কাব্য বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্।]

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥

অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥

পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীনজাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে ল'য়ে চল॥
যার নামে পার করে ভব-পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনীর তাঁরে করে পার॥

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হ'য়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে ল'য়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল্‌॥
পাটনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥

পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি-উপরে॥

সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥
সোণার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥

তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলে পদ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য-উদয়।
সেই দয়া হ'তে মোরে দেহ পরিচয়॥

ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে॥
এতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কোন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দারনিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোমত যাহা চাহ দিব॥

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান।।

বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘরে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়।।
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল।।
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যয় না হয়।
সোণার সেঁউতি দেখি করিলা প্রত্যয়।।
আপন মন্দিরে গেলা ভক্তি-ভয়ে কাঁপি।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি।।
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান।
কে বাজায়, নাচে গায়, দেখিতে না পান।।
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা।
হইল আকাশবাণী অন্নদা আইলা।।
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া অটুট থাকিবে।।
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার।।

আগমনী

রামপ্রসাদ সেন

[অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে কুমারহট্ট (বর্ত্তমান হালিসহর) গ্রামে বৈদ্যবংশে ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি এক ধনিগৃহে মুহুরিরূপে প্রথম কার্য্য আরম্ভ করেন। কথিত আছে, ইঁহার রচিত শ্যামাসঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া ইঁহার প্রভু মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া ইঁহাকে গ্রামে থাকিয়া সাধনভজন ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিবার নির্দ্দেশ দেন। পরবর্ত্তী কালে নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ইঁহাকে একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। শাক্তপদরচয়িতৃগণের মধ্যে রামপ্রসাদের স্থান সর্ব্ব-প্রকারেই অগ্রগণ্য। সকল বাঙ্গালীর কাছেই রামপ্রসাদী সঙ্গীতের সমান আদর। আবেগময় সরলতা, ভাবের গভীরতা ও মাধুর্য্যে প্রসাদী সঙ্গীত বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন। হালিসহরে আজিও রামপ্রসাদের ভিটা ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডী আসন দেখা যায়।]

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল উঠ চল চল,
নন্দিনী নিকটে তোমার গো।
চল বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া
এস না সঙ্গে আমার গো ॥
জয়া, কি কথা কহিলি, আমারে কিনিলি,
কি দিলি শুভ সমাচার।
তোমায় অদেয় কি আছে, এস দেখি কাছে,
প্রাণ দিয়া শুধি ধার গো॥
রাণী ভাসে প্রেমজলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল-ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে—
গৌরী কতদূরে আর গো ॥
যেতে যেতে পথ উপনীত রথ নিরখি বদন উমার।
বলে—মা এলে মা এলে মা কি মা ভুলে ছিলে।
মা বলে একি কথা মার গো ॥

রথ হতে নামিয়া শঙ্করী মায়েরে প্রণাম করি
সান্ত্বনা করে বারবার।
দাস কবিরঞ্জনে সকরুণে ভণে, এমন শুভদিন আর কার গো ।।

শ্রেষ্ঠপূজা

রামপ্রসাদ সেন

মন, তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ।।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা ।।
জগৎকে সাজাচেছন যে মা দিয়ে কত রত্নসোণা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা ।।
জগৎকে খাওয়াচেছন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস্ তাঁর আলোচাল আর বুট-ভিজানা ।।
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি মেষ মহিষ আর ছাগল-ছানা ।।
প্রসাদ বলে ভক্তি-মন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক-দেখানো করবে পূজা,
মাতো আমার ঘুষ খাবে না ।।

শরৎ *

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[চব্বিশ-পরগনার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া গ্রামে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালেই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন এবং যৌবনের প্রারম্ভেই সখের ও পেশাদারী কবির দলের গান রচনা করিয়া যশস্বী হন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ইনি 'সংবাদ-প্রভাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রবর্ত্তন করেন। ইনি ব্রিটিশ যুগের আদিকবি এবং দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদি সাহিত্যরথিগণের সাহিত্য-গুরু। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৪৭ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

(১)

বরষা ভরসাহীন ক্ষীণ হয় দিন দিন
শুনিয়া শরৎ-আগমন।
গগনেতে জলধর শোকে পাণ্ডু-কলেবর
বরষার বিচ্ছেদকারণ॥

জলদ বিক্রমশূন্য চাতক বিষম ক্ষুণ্ণ
হাহাকার করে উর্দ্ধমুখে।
ময়ূর-ময়ূরীগণ করি নৃত্য বিস্মরণ
কাননে লুকায় মনোদুখে॥

* * *

কর্পূরে পূরিল বিশ্ব সেই মত হয় দৃশ্য
সিতপক্ষ শারদ নিশায়।
অথবা নিশিতে হেন অনুমান হয় যেন
শরদ পারদ মাখে গায়॥

* কবির রচিত দুইটি শরদ্বর্ণনা হইতে স্তবকগুলি সংকলিত।

(২)

নির্ম্মল পল্বল-জল সদা করে ঢলঢল
অমল কমল ফুল্লদল।
সুখে সরোবর অঙ্গে তরঙ্গ বহিছে রঙ্গে
কেলিরসে হইয়া তরল॥

শরতের অভিষেক হিম বর্ষে অতিরেক
বিজয়ের নিশান বলাকা।
বরষা সভয় মনে অতিশয় সঙ্গোপনে
জড়াইল তড়িৎ পতাকা॥

কেমন কালের গতি যেই হয় অধিপতি
সকলেই তাহার অধীন।
দেখহ প্রমাণ তার দলিত-অঞ্জনাকার
জলধর ছিল এতদিন॥

কিন্তু শরদাগমনে বারিদ বিষণ্ণমনে
ধরিয়াছে শুভ্রময় বেশ।
জেনেছে বিশেষ এই রাজমন্ত্রী চন্দ্র যেই
সেই শুক্লবস্ত্রে সমাবেশ॥

* * *

ভেকের ভীষণ গর্ব্ব একেবারে হ'ল খর্ব্ব
সর্ব্বনাশ বলবুদ্ধি-হত।
নাহি আর ডাক হাঁক ফুরাইল সব জাঁক
পঙ্কজলে মগ্ন অবিরত॥

নিবিল যৌবনদীপ নীরব হইল নীপ
ধরাধিপ শুনিয়া শরদ।
পরিণত পুষ্পচয় ফলরূপে দৃশ্য হয়
মধুমক্ষী ভুঞ্জে তার মদ॥

(৩)

ছয় ঋতু মধ্যে ধন্য সকলের অগ্রগণ্য
শরদের জয় সবে বলে।
যাহাতে যোগীন্দ্রজায়া মহেশ্বরী মহামায়া
আবির্ভূতা অবনীমণ্ডলে ।।

মেঘনাদ ও বিভীষণ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫এ জানুয়ারী মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দু কলেজে ও বিশপ্‌স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রজীবনেই ইনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 'মাইকেল' উপনাম গ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে ইংরাজিতে সাহিত্য রচনা করিতেন, পরে তিনি বুঝিলেন মাতৃভাষায় রচনা না করিলে কবিপ্রতিষ্ঠা-লাভের আশা নাই। তখন তিনি একনিষ্ঠভাবে মাতৃভাষার্ চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য,' 'পদ্মাবতী নাটক,' 'বীরাঙ্গনা কাব্য,' 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'মেঘনাদবধ কাব্য' 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক।

য়ুরোপে যাইয়া মধুসূদন ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইঁহার শেষজীবন দারিদ্র্য, ব্যাধি ও মানসিক অশান্তির ইতিহাস। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্য'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রবর্ত্তক মহাকবি।]

"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা বিষাদে,—
"জানিনু, কেমনে আসি' লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ ?—নিকষা সতী তোমার জননী!—
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ!—শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ!—ভ্রাতৃ-পুত্র বাসব-বিজয়ী!

নিজ গৃহ-পথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি' রাজার আলয়ে?—
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে;—
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে;—
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।"

উত্তরিলা বিভীষণ,—"বৃথা এ সাধনা,
ধীমন্! রাঘব-দাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি,—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি?—কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা' দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি' কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জন্ম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবাল-দলের ধাম?—মৃগেন্দ্র-কেশরী
কবে, হে বীর-কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্র-ভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি;
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্র-মতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা?

নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি' না হাসিবে
এ কথা। ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি। দেখিব আজি, কোন্ দেব-বলে,
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের। কি দেখি'
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রগল্‌ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি' নরাধমে;
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী!—হা বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য! প্রফুল্ল কমলে
কীট-বাস!—কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি—ভ্রাতৃ-পুত্র তব?—
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?

মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,
মলিন-বদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষ্যি' রাবণ-আত্মজে,—
"নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভর্ৎস মোরে
তুমি। নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।
বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে
পাপ-পূর্ণ লঙ্কা-পুরী; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল-সলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পর-দোষে কে চাহে মজিতে?"

রুষিলা বাসব-ত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র, কোপি'

কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্ম-মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন,—তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা!
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা। হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে?—
গতি যা'র নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"

আত্মবিলাপ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

১

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।
জীবন-প্রবাহ বহি' কালসিন্ধু-পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা, ছুটিল না একি দায়?

২

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুমভাতি
কত দিন র'বে?
নীরবিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলঝলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে কি সুখ তার?—
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণ-প্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে।
মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে,
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত পাবক-শিখালোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি?
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়,
না দেখিলি, না শুনিলি এবে রে পরাণ কাঁদে।

৫

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র, হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে।
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন কেমনে?

৬

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে;—
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে;—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ,
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায়?

৭

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল-জলে
যতনে ধীবর,
শত মুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে
ফেলিস্ পামর।
ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায়রে ভুলিবি কত আশার কুহকচ্ছলে?

কাশীরাম দাস

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালিয়া সংস্কৃতহ্রদে রাখিলা তেমতি,
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি' ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি' মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেইরূপে ভাষা-পথ খননি' স্ববলে
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান,—
হে কাশী! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান্।।

———

বটবৃক্ষ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দেব-অবতার ভাবি' বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ। প্রত্যক্ষ এ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরুরূপ ধরি'!

জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,
তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি'
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পুজি' তাঁরে।

শতপত্রময় মঞ্চে তোমার সদনে,
খেচর-অতিথিব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ-ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি' হৃষ্টমনে,—
মৃদুভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি' দেহদাহ শীতলি' যতনে।
দেব নহ, কিন্তু গুণে দেবতার মত।

———

নীলধ্বজের প্রতি জনা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব ; গর্জ্জে গজ ; উড়িছে আকাশে
রাজকেতু ; মুহুর্ম্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি'
রণমদে রাজসৈন্য ;—কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে,
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি
মহাবাহু। যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি' নিনাদে,
টুট' কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে !
খণ্ড' মুণ্ড তার, আন শূল-দণ্ড-শিরে !
অন্যায়-সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশ', মহেষ্বাস, তারে !—ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।
জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি' গেছে স্বর্গ ধামে,—
কি কাজ বিলাপে প্রভু ? পাল' মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম—ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ' ভুজবলে।

হায়, পাগলিনী জনা ! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি। তব সিংহাসনে

বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—

কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর* নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি' পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হ'লে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ' সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি নৃমণি?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম, অসি?
না ভেদি' রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,—
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?

* * *

জানি আমি, কহে লোক রথিকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ, বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ংবরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে; কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিনিল।
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে॥

* মাইকেল 'মাহিষ্মতী'র স্থলে 'মাহেশ্বরী'ই লিখিয়াছেন।

শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কু-ছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি'? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ, মোরে, শুনি,
মহারথি-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায় মাঝারে আনি' মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত্ত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে।

কি না তুমি জান রাজা? কি কব তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল'
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে, কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির, হে বিধাতঃ, পার্থের সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?—
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী,
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?

কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে

পরাধীনা! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনি
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ।) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে!—

হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন নানা কষ্ট স'য়ে
এ উদরে? কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি, বাছা,
এ তাপ, আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে?
কেন বা জ্বলিস্ মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি' খেদে, মর্ অরে মণিহারা ফণী!—

যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নবমিত্র পার্থ সহ! মহাযাত্রা করি'
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে!
ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষত্র-কুল-বধূ,
কেমনে এ অপমান স'ব ধৈর্য্য ধরি'?

ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে ;
ফিরি' যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি',
নরেশ্বর, "কোথা জনা" বলি' ডাক যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা" বলি' !

সমাপ্তে

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি')
ও প্রতিমা। নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি'।

শুকাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল-কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিস্মরি'
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম। ডুবিল সে তরী
কাব্য-নদে, দেখাইনু যাহে পদ-বলে—

অল্পদিন। নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি। ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
এবে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি' যাই দূর-বনে।
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষবারে—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ ভারত-রতনে।

নিদাঘ-বর্ণনা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'পদ্মিনী-উপাখ্যান,' ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্ম্মদেবী' এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শূরসুন্দরী' নামে তিনখানি কাব্য প্রকাশ করেন। ইনি 'কুমারসম্ভব' কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। স্বদেশপ্রীতি ও বীরত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সে সকল কবিতা এককালে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সমাদৃত হইত।]

কত দিনান্তরে ঋতু-নিদাঘ-প্রবেশ।
খরতর কর-শর বরিষে দিনেশ॥
আতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ, আতপ্ত পবন।
উপবনে যায় লোক ত্যজিয়া ভবন॥
তাপে তপ্ত মৌনব্রত বিহঙ্গমগণ।
পল্লবের আড়ে করে দেহ সংগোপন॥
আরক্তিম তালু কণ্ঠ, বিশুষ্ক রসনা।
মুক্তমুখে করে পবনের উপাসনা॥
কোথায় রয়েছে বায়ু না হয় সন্ধান।
সুষুপ্ত জগৎ কিবা শ্বাসগত প্রাণ॥
শ্বাসের সঞ্চার নাই, স্তম্ভিত বিহ্বল।
চিত্র-লিখিতের প্রায় অচল সকল॥
জগৎজীবন যেই, অভাবে তাহার।
জগতে কি থাকে আর শোভার সঞ্চার?
একে অন্তর্হিত বায়ু তাহাতে তপন।
বরিষে কিরণ যেন হোম-হুতাশন॥
যেন জ্বরে দগ্ধ তনু বসুমতী মাতা।
অকালে কি সৃষ্টিনাশ করিবেন ধাতা॥

বিক্রমবিহত ব্যাঘ্র লুকায় গহ্বরে।
বারি অন্বেষিয়ে ফিরে মহিষনিকরে॥
বন-বরাহের দল পঙ্কিল পুকরে।
গড়াগড়ি যায় তাপনিবারণ তরে॥
ভয়ঙ্কর ভাব একি নিরখি কাননে।
অবতীর্ণ হুতাশন সহস্র আননে॥
বিকচ কুসুম্ভ কিবা সিন্দূর-বরণ।
অমনি প্রবলবেগে উঠিল পবন॥
পবনে পাবকে মিলে ঘন আলিঙ্গনে।
ভস্ম-সার করিতেছে তরু-লতাগণে॥
পলায় বিহগকুল ত্যজিয়া বিটপী।
তরু পরিহরি' ধায় দলে দলে কপি॥
তরু দহি' নিরাশ্রয় প্রচণ্ড অনল।
বনভূমে তৃণদলে পড়ে অনর্গল॥
বেণুবনে অতি বেগে দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে।
চট্‌পট্ ঘোর শব্দ গহন কাননে॥
কিবা চারু কষিত-কাঞ্চন-কলেবরে।
শিমুলের বনে জ্বলে কোটরে কোটরে॥
পলায় কুরঙ্গদল হইয়া বিকল।
ভয়ঙ্কর ভাব এ কি ধরে দাবানল॥
কি শোভা রজনীকালে শিখরে শিখরে!
প্রকটিত দাবানল দ্বিতীয় প্রহরে॥
নীলবর্ণ নগশ্রেণী দীর্ঘ কলেবর।
থাকে থাকে দাঁড়াইয়া যেন নিশাচর॥
অনলের শিখারাজি শোভে শির'পর।
দ্রব-স্বর্ণময় কিবা মুকুট সুন্দর॥
কভু লুপ্ত কভু দীপ্ত হয় প্রতিক্ষণে।
অভিনব আশা যথা প্রেমিকের মনে॥

শিখরে নিভিলে অগ্নি প্রভাতসময়।
ধূমময় দেখা যায় চারু চূড়াচয়॥
প্রভাত-ভানুর ছটা লাগিয়াছে তায়।
ধীর সমীরণে চলে অচলের কায়॥
কভু আসি পড়িতেছে চরণে তাহার।
শ্যামার চরণে কিবা জবাপুষ্প-হার।

সাগরের গর্ভ ত্যজি' হেরি খনে খনে।
ভানুকরে বাষ্পরাশি উঠিয়া গগনে॥
নানারূপ মেঘাকারে হয় পরিণত।
আকাশেতে চলিতেছে গজযূথমত॥
প্রভাতে প্রত্যহ আসি' হয় দৃশ্যমান।
কিন্তু কভু বিন্দুবারি নাহি করে দান॥
কখন কখন তর্জ্জে গর্জ্জে ঘোরতর।
চমকে চপলাবালা হাসায়ে অম্বর॥
বোধ হয় এইক্ষণে হইবে বরষা।
স্বপ্নের সমান সেই বিফল ভরসা॥
দিন দিন ক্ষীণ-বারি যত জলাশয়।
বিষম বিপদাপন্ন জলচরচয়॥
শুকায়েছে সরোবরে সরোজের বন।
কোনমতে স্বল্প জলে বাঁচায় জীবন॥
হায় যেই ভানুকরে ফুটে শতদল।
সেই ভানু-করে তার জীবন বিকল॥

প্রকৃতির আহ্বান

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

[বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নিমতলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্য অপূর্ব্ব সুললিত গীতি-কবিতা-সংগ্রহ। ইহা বাঙ্গালা ১২৮১ সালে 'আর্য্যদর্শন' পত্রে প্রকাশিত হয়; ইহাই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্রেণীর কাব্য আর প্রণীত হয় নাই। পরে 'বঙ্গসুন্দরী,' 'সাধের আসন,' 'বন্ধুবিয়োগ,' 'প্রেমপ্রবাহিণী,' 'নিসর্গ সন্দর্শন,' 'মায়াদেবী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ও বহু সঙ্গীত রচনা করিয়া ইনি অসামান্য যশ অর্জন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩০১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিবর বিহারীলাল দেহত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনায় ইঁহার প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।]

১

সর্ব্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন;
চারি দিকে ঝালাপালা,
উঃ কি জলন্ত জ্বালা।
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-পতন।

২

লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি,
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি;
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে,
মাঠে শুয়ে দূর্ব্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।

৩

শূন্যময় নির্জ্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।

৪

সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে,
কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে।
অগ্নিভরা, বিষভরা,
রে রে স্বার্থভরা ধরা!
কত আর থাকিবি ধরিয়ে?

৫

কভু ভাবি ত্যেজে এই দেশ,
যাই কোন এ হেন প্রদেশ,
যেথায় নগর গ্রাম
নহে মানুষের ধাম,
প'ড়ে আছে ভগ্ন-অবশেষ।

৬

গর্ব্বভরা অট্টালিকা হায়,
এবে সব গড়াগড়ি যায়;
বৃক্ষলতা অগণন
ঘেরি' ক'রে আছে বন,
উপরে বিষাদ-বায়ু বায়।

৭

প্রবেশিতে যাহার ভিতরে,
ক্ষীণ প্রাণী নর ত্রাসে মরে ;
যেথায় শ্বাপদদল
করে ঘোর কোলাহল,
ঝিল্লী সব ঝিঁ ঝিঁ রব করে।

৮

তথা তার মাঝে বাস করি',
ঘুমাইব দিবা-বিভাবরী ;
আর কারে করি ভয়,
ব্যাঘ্রে সর্পে তত নয়,
মানুষ-জন্তকে যত ডরি।

৯

কভু ভাবি কোন ঝরনার,
উপলে বন্ধুর যার ধার,
প্রচণ্ড প্রপাত ধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দ্দিকে হতেছে বিস্তার ;—

১০

গিয়ে তার তীর-তরু-তলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব-সম র'ব স্থির
কান দিয়ে জল-কলকলে।

১১

যে সময় কুরঙ্গিণীগণ,
সবিস্ময়ে মেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন ;—

১২

সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে,
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যু-কালে মিত্র এলে,
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে,
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে।

১৩

কভু ভাবি সমুদ্রের ধারে,
যেথা যেন গর্জ্জে একেবারে
প্রলয়ের মেঘসঙ্ঘ ;
প্রকাণ্ড তরঙ্গ-ভঙ্গ
আক্রমিছে গর্জ্জিয়া বেলারে।

১৪

সম্মুখেতে অসীম, অপার,
জলরাশি রয়েছে বিস্তার ;
উত্তাল তরঙ্গ সব,
ফেনপুঞ্জে ধবধব,
গণ্ডগোলে ছোটে অনিবার।

১৫

মহাবেগে বহিছে পবন,
যেন সিন্ধু সঙ্গে করে রণ ;
উভে উভ প্রতি ধায়,
শব্দে ব্যোম ফেটে যায়,
পরস্পরে তুমুল তাড়ন।

১৬

সেই মহারণ-রঙ্গস্থলে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে বিরলে,
(বাতাসের হুহু রবে,
কান বেশ ঠাণ্ডা রবে ;)
দেখিগে, শুনিগে, সে সকলে।

১৭

যে সময়ে পূর্ণ সুধাকর
ভূষিবেন নির্ম্মল অম্বর,
চন্দ্রিকা উজলি' বেলা
বেড়াবেন ক'রে খেলা,
তরঙ্গের দোলার উপর ;

১৮

নিবেদিব আমি তাঁর কাছে,
মনে মোর যত খেদ আছে ;
শুনি, নাকি মিত্রবরে,
দুখের যে অংশী করে,
হাঁপ ছেড়ে প্রাণ তার বাঁচে।

১৯

কভু ভাবি পল্লীগ্রামে যাই,
নামধাম সকল লুকাই ;
চাষীদের মাঝে র'য়ে,
চাষীদের মত হ'য়ে,
চাষীদের সঙ্গেতে বেড়াই।

২০

প্রাতঃকালে মাঠের উপর,
শুদ্ধ বায়ু বহে ঝর্‌ঝর্‌,
চারি দিক মনোরম,
আমোদে করিব শ্রম ;
সুস্থ স্ফূর্ত্ত হবে কলেবর।

২১

বাজাইয়ে বাঁশের বাঁশরী,
শাদা সোজা গ্রাম্য গান ধরি',
সরল চাষার সনে,
প্রমোদ-প্রফুল্ল মনে
কাটাইব আনন্দে শর্ব্বরী।

২২

বরষার যে ঘোরা নিশায়,
সৌদামিনী মাতিয়ে বেড়ায় ;
ভীষণ বজ্রের নাদ
ভেঙে যেন পড়ে ছাদ,
বাবু সব কাঁপেন কোঠায় ;

২৩

সে নিশায় আমি নদীতীরে,
নড়্‌বোড়ে পাতার কুটীরে,
স্বচ্ছন্দে রাজার মত
ভূমে আছি নিদ্রাগত ;
প্রাতে উঠে দেখিব মিহিরে।

২৪

বৃথা হেন কত ভাবি মনে,
বিনোদিনী কল্পনার সনে ;
জুড়াইতে এ অনল,
মৃত্যু ভিন্ন অন্য জল
বুঝি আর নাই এ ভুবনে!

দধীচির তনুত্যাগ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[হুগলী জেলার গুলিটা গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থায় বহু কষ্ট করিয়া তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাস করিয়া তিনি 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে' মাসিক ৫০ টাকা বেতনে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন ; ইহার পরে বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এক বৎসর মুন্সেফের কার্য্য করেন। তৎপরে হাইকোর্টের উকীল হইয়া দীর্ঘকাল সরকারী উকীলের কার্য্য করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের প্রভূত অর্থাগম হইত, কিন্তু তিনি সঞ্চয়ী লোক ছিলেন না ; এ জন্য বার্দ্ধক্যে হঠাৎ অন্ধ হইয়া

পড়াতে তিনি দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হন। তখন তাঁহাকে গভর্নমেণ্টের সামান্য বৃত্তি ও সাধারণের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। পঠদ্দশায় তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; ঐ সময়েই তাঁহার 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' লিখিত। তৎপরে 'ভারত-সঙ্গীত' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশের পর তাঁহার যশ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময়ে তাঁহার 'কবিতাবলী,' 'ছায়াময়ী,' 'আশাকানন,' 'দশমহাবিদ্যা' প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়। 'বৃত্রসংহার কাব্য'ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।]

পৌলোমী-ভরসা ইন্দ্র মুগ্ধ ঋষিভাষে,
অলক্ষ্যে অদৃশ্যভাবে ছিলা এতক্ষণ,
পূর্ণজ্যোতিঃ দেবকান্তি এবে প্রকাশিলা,
নীরদলাঞ্ছন কেশ প্লাবিত কিরণে,
বক্ষেতে বিশাল বর্ম্ম—ভাস্কর যেমন
প্রভাতে অরুণোদয়ে কুহেলি-আবৃত।
শোভিছে অতুল তূণ, সুন্দর কার্ম্মুক—
কাদম্বিনী-কোলে যাহা চির-শোভাময়।
জ্বলিছে সহস্র অক্ষি; যথা তারাদল
নিশীথে শর্ব্বরীকোলে। উঠি' তপোধন
সম্ভ্রমে সস্মিত মুখে অতিথি সম্ভাষি',
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন।
জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে—
"আশ্রমে কি হেতু গতি? কিবা অভিলাষ?"

ভগ্নচিত্ত আখণ্ডল নেহারি' নির্ম্মল
কৃপালু ঋষির মুখ,—ভগ্নচিত্ত যথা
দয়ালু দর্শকবৃন্দ নবমীর দিনে
যূপকাষ্ঠে বান্ধে যবে নির্দ্দয় কামার
মহিষমর্দ্দিনী-দশভুজা-মূর্ত্তি আগে
অসহায় ছাগ-মেষ পূজায় অর্পিতে।—
কে পারে আনিতে মুখে সে নিষ্ঠুর বাণী?

কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা ? কে হেন দারুণ
প্রাণিমাঝে ? নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর।
স্তব্ধ ঋষি ক্ষণকাল, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ ; গদ্‌গদ স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,—
"পুরন্দর শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি—পবিত্র আশ্রম।
এ জীর্ণ পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হয়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নেরও অতীত।"

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র উত্তরীয় ধরি',
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি' সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড় সুশীতল, পল্লব-শোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ আকুল-হৃদয়,
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।
জ্বলিল চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুলু,
সর্জ্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের দাম
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতিঃ সুবিমল
নির্ম্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ডে, ওষ্ঠাধরে!
সুললাটে আভা নিরুপম, বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মালা বক্ষঃস্থলে।

বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে।
চাহি' শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন অশ্রুধারা মুছায়ে সবার
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কয় জন?
হিতব্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা?
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব?
লভি' জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে?
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারা ক্ষয়
পায় সে কতই রূপে। কেন তবে হেন
ঘটে যদি কার' ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-সাধনে?
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগৎ-কল্যাণ-হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"

ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি,
আশিসিলা শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি' অন্তিমে আমার
কর শুচিদেহ মম বারেক পরশি'।"

অগ্রসরি' শচীপতি সহস্র-লোচন
তপোধন শির স্পর্শি' সুকর-কমলে,

কহিলা আকুল স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ। কহিলা বাসব—
"সাধু-শিরোরত্ন ঋষি, তুমিই সাত্ত্বিক,
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন।
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির-মোক্ষফলপ্রদ—নিত্য হিতকর।
এ জগতে জীবময় অকূল জলধি,
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্বপ্রায়
জীবদেহ অনুদিন। এ ভবমণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ।
ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল
হ্রাস-বৃদ্ধি নাহি জানে নিয়ত গভীর
স্রোতোময়। অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত নিষ্ফলে প্রাণি-দেহের নিধনে।
প্রাণি-মাত্রে কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্য্যে জীবন-ধারণে।
বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু-পরিমাণে
বাড়ে দিবা-বিভাবরী, সাগরগর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশঃ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,
তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু-কার্য্যে মানবের প্রতি অহরহঃ।
কর্ত্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ-পরিহার,
জীবকুল-কল্যাণ-সাধন অনুদিন।
পরহিত-ব্রত ঋষি ধর্ম্ম যে পরম,
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।

মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ, ঋষিকুলচূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।
কি বর অর্পিব আমি, নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোন বর, এ সুকীর্ত্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে।
তব বংশে জনমি মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমিমাঝে।”

বলিয়া রোমাঞ্চতনু হইলা বাসব,
নিরখি' মুনীন্দ্র-মুখে শোভা নিরমল;
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ-গান
উচ্চৈর্হরিসঙ্কীর্তন মধুর গভীর—
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনিশোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমুহ অরণ্য ভেদি সৌরভ-উচ্ছ্বাস,
বন-লতা তরুকুল শোক-অবনত।
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি'
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি'
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি'
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি'।
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

মাতৃস্তুতি

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

[যশোহর জেলার অন্তর্গত জগন্নাথপুর গ্রামে ১২৪৪ সালের শেষভাগে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম প্রমথনাথ মজুমদার। 'মহিলা' কাব্য রচনা করিয়া ইনি বাঙ্গালা দেশে যশস্বী হ'ন। উহার প্রথমাংশ ১২৭৮ সালে রচিত হয়। ১২৮৫ সালের প্রারম্ভে মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে কবির মৃত্যু ঘটে।]

১

সুকোমল অঙ্কে নিয়া অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পীযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া, স্নেহবাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননি, কর পুনঃ বালক আমায়।
তব অঙ্ক পরিহরি' সংসারে প্রবেশ করি',
সদা মত্ত থাকি মা গো বিষয়ের রণে।
তুমি গড়েছিলে যাহা, আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম-স্বর্গ-কথা কিছু নাই মনে।
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে।

২

কভু ভার-নিপীড়িতা বসুন্ধরা বিচলিতা;
দোষ পেলে রোষ হয় উদিত পিতায়;
সরসীর সুধা-পয়, হিমপাতে শিলা হয়;
সতত না পূর্ণ রয় সুধাংশু সুধায়;
করে মেঘ ধারাপাত, কভু ঘটে বজ্রাঘাত,
জগৎপ্রাণ, প্রাণ হরে মাতিয়া বাত্যায়;

রবির মুখের হাসি, বারিদে আবরে আসি'
সমান প্রকৃতি কারু দেখা নাহি যায়!
চির-অবিকারী মাতঃ মমতা তোমায়!

৩

হে মাতঃ! হৃদয়ে ধর', সন্তানের ত্রাস হর',
তোমা বিনা ভবদুঃখে কোথা পরিত্রাণ?
তুমি পরশিলে করে, জ্বরজ্বালা-তাপ হরে,
তব অঙ্ক, শঙ্কা-শূন্য বৈকুণ্ঠ-সমান!
তুমি মুখে দিবে যাহা, মৃত্যুহরী সুধা তাহা,
আশীর্ব্বাদ তোমার,—অভেদ্য অঙ্গত্রাণ!
তব কাছে স্বর্গবাস তব তুষ্টি শ্রেষ্ঠ আশ,
ভবে নাই ধর্ম্ম তব সেবার সমান।
জীবে কৃপা করি তুমি ঈশ মূর্ত্তিমান্!

৪

ধরা হীরা হয় হায়! সিংহাসন রচি' তায়,
বসাইতে পারি যদি তাহাতে তোমায়,
ফুল হয় তারাদল, চন্দন সাগর-জল,
শত কল্প বসি' যদি পূজি তব পায়,
সুধাকর সুধাগারে, পারি যদি আনিবারে,
নিত্য যদি সেই সুধা করাই ভোজন,
পারিজাত-দল দিয়া, নিত্য শয্যা বিরচিয়া,
করাইতে পারি যদি তোমায় শয়ন,
তবু না শুধিতে পারি তোমার পালন।

৫

তুমি মা! না ধর দোষ, তুমি নাহি কর রোষ,
দুঃশীল মানব, প্রাণে বেঁচে থাকে তায়!
শত অপরাধ করে তবু না মানব মরে,
শুধু তব হৃদয়ের প্রেম-মহিমায়!
বাণী বর্ণিবারে চায়, শেষ যদি সদা গায়
তবু তব মহিমা না হয় সমাধান।
হে সুর, অসুর, নর, যেবা তনু বুদ্ধি ধর;
এস মিলি করি সবে মাতৃস্তুতি গান।
বিশ্ব যাঁর কর-গড়া কন্দুকসমান।

প্রবীর ও অর্জুন

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

[কলিকাতা বাগবাজারে বসুপাড়ায় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। গৃহে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইঁহার রচিত প্রায় ৭০খানি নাটক আছে; তন্মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল,' 'অশোক,' 'বুদ্ধদেব,' 'শঙ্করাচার্য্য', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস,' 'পাণ্ডবগৌরব,' 'চৈতন্যলীলা,' 'জনা,' 'দক্ষযজ্ঞ,' 'কালাপাহাড়,' 'বলিদান,' 'শাস্তি কি শান্তি,' 'চণ্ড', 'পূর্ণচন্দ্র,' 'হারানিধি,' 'বিষাদ,' 'মুকুলমুঞ্জরী,' 'সিরাজ-দ্দৌলা,' 'মীরকাসিম,' 'ছত্রপতি শিবাজী,' 'গৃহলক্ষ্মী,' 'ম্যাকবেথ,' প্রভৃতি নাটকে ইনি ইঁহার প্রতিভার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন এবং তাহার ফলে ইনি বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

অর্জুন—বীর্য্যবান্ রথিশ্রেষ্ঠ তুমি হে কুমার,
যজ্ঞের তুরঙ্গ মোরে দেহ ফিরাইয়ে।
প্রকাশিলে অতুল বিক্রম,

তোমা সম বীর নাহি ত্রিভুবনে,
কীর্ত্তিগান চিরদিন রহিবে ধরায়,
কৃষ্ণসনে অর্জ্জুনে জিনেছ রণে।
সমরে নাহিক কাজ দেহ বাজী ফিরে।

প্রবীর—রণসাধ অবসাদ যদি ধনঞ্জয়,
চাহ যদি ফিরে দিব হয়।
কিন্তু ধনঞ্জয়! বুঝিতে না পারি
উপহাস কর কি আমার সনে?
ফাল্গুনি সমরক্লান্ত সম্ভব না হয়।

অর্জ্জুন—সত্য, নহি রণক্লান্ত; শুন বীরবর,
দেব-বরে জিনেছ সমরে কালি মোরে;
আজি যুদ্ধে হবে পরাভব,
দেব-কৃপা অদ্য মম প্রতি।

প্রবীর—অশ্ব দিব ফিরাইয়ে পরাজয় মানি',
ভেব না সম্ভব কভু।
দেবতার বলে যদি বলী তুমি আজি,
দেব-রোষ যদি মম প্রতি,
ক্ষত্রিয়-শোণিত বহে ধমনীতে মম,
রণে নাহি দিব ক্ষমা।

অর্জ্জুন—অবিলম্বে দেহ রণ, সাজ রথিবর।

শ্রীকৃষ্ণ—দেব-মায়া বুঝ রথিবর।
বিরূপ শঙ্কর,
যুদ্ধে তব জয় নাহি হবে।
ভাব মনে,
এ ঘোর শ্মশানে কিরূপে এসেছ তুমি;
ভেবে দেখ, রণসজ্জা কে হরিল তব?
নরের সহিত বাদ নরের সম্ভবে,
দেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পতন নিশ্চয়।

প্রবীর—বুঝিয়াছি, চক্রি, চক্র সকলি তোমার।
ধিক্ ধিক্ মৃত্যু শ্রেয়ঃ, এ জীবনে ধিক্।
* * * অস্ত্র ধনু হরিয়াছ হরি।
ভাব কি হে তাহে মম হবে পরাজয়?
দেখিব কেমনে তুমি রাখিবে অর্জ্জুনে,—
শীঘ্র সাজি' রণসাজে হইব উদয়।
অর্জ্জুন—ধনু অস্ত্র বর্ম্ম আদি দিতেছি তোমায়,
ইচ্ছা যদি ধর করে গাণ্ডীব আমার,
লহ কপিধ্বজ রথ, সারথি নিপুণ,
অবিলম্বে সাজহ সংগ্রামে।
শ্রীকৃষ্ণ—কিন্তু বীর! যুদ্ধে কার্য্য কিবা?
প্রবীর—ইচ্ছা তব করিব কি পাণ্ডবের সেবা?
কহ, কৃষ্ণ, পাণ্ডব কি হেতু তোমা পূজে?
কপটের শিরোমণি তুমি,
ছলমাত্র বল তব;
মধুর বচনে কহ, 'মাগ' পরাভব'।
শুন ওহে যাদব-প্রধান! কহ শুনি,—
ধর্ম্মের স্থাপন-হেতু তব অবতার;
এ কথার অর্থ নাহি হয় প্রণিধান।
শুন যদুবীর, রাজা যুধিষ্ঠির
ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম-অবতার—
তারে তুমি মিথ্যা কহাইলে।
তব উপদেশে,
গুরুজনে কৌশলে বধিল পাণ্ডু-সুত।
জগবন্ধু নারায়ণ যদি হে কেশব,
একের কি হেতু বন্ধু, বৈরী অপরের?
পাণ্ডবের সখা, আর নহ সখা কারো?
মিষ্টভাষে উপদেশ দিতেছ আমায়,

ক্ষত্রধর্ম্ম দিব বিসর্জ্জন—
বিনাযুদ্ধে পরাজয় মাগি'।
শ্রীকৃষ্ণ—রাখ রাখ রাজপুত্র বচন আমার
অশ্বমেধ অনুষ্ঠান মম উপদেশে,
রাখ অনুরোধ,
পার্থে দেহ ফিরাইয়ে বাজী;
মম কার্য্যে বিঘ্ন নাহি কর।
তোমা দোঁহে কেহ নহে ঊন।
সমরে সোসর তুমি বীরবর;
কীর্ত্তি তব রবে লোকময়,
করি' রণজয়
হয় দেহ ফিরাইয়ে আমার বচনে।
অপযশ কভু তব না হবে কুমার।
প্রবীর—অনুরোধে ফিরাইব বাজী?
অনুরোধ না মানিব;—
সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিব,
প্রাণে মম জন্মেছে ধিক্কার।
এস ধনঞ্জয়,
দেহ যেবা অস্ত্র তব অভিলাষ,
দেহ রণ, অধিক বিলম্ব কেন আর?
অর্জ্জুন—বাছি' লও ধনু অস্ত্র ইচ্ছামত তব,
কিংবা বীর আইস শিবিরে,
যত অস্ত্র আছে তথা দেখাই তোমায়,
যাহা রুচি তাহা তুমি করিও ধারণ।
প্রবীর—দেহ অস্ত্র, সাজ বীর, হও হে সত্বর।
অর্জ্জুন—দুইখান রথ দূরে কর দরশন,
যাহে ইচ্ছা তব বীর কর আরোহণ।

[অর্জ্জুন ও প্রবীরের প্রস্থান

(যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জ্জুন ও প্রবীরের পুনঃপ্রবেশ)

অর্জ্জুন—বীরবর, ক্ষমা দেহ রণে।
করিয়াছ দুষ্কর সমর,
দেবনরে অসম্ভব।
ক্লান্ত তুমি বিশ্রাম লভহ।
বিকলাঙ্গ দারুণ প্রহারে,
তবু কেন যাচিছ সমর?
প্রবীর—যুদ্ধ—যুদ্ধ, কর আক্রমণ।
[যুদ্ধ ও পতন।
অর্জ্জুন—হায়! বীরবর হইল নিপাত,
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয়কার্য্য, বধিলাম শিশু;
বীরকুলক্ষয়হেতু জনম আমার।
বৃষকেতু—ঐ আসিতেছে বিভীষণা এই দিকে,
সঙ্গে নারী উন্মাদিনী এলোকেশী।
পলায় পাণ্ডবসৈন্য ডরে।

* * *

অর্জ্জুন—হরি, জীবিত কুমারে হেরি,
ঔষধে হে হবে কি উপায়?
আহা বীরশ্রেষ্ঠ রথীন্দ্র প্রবীর।
শ্রীকৃষ্ণ—খেদ কর শিবিরে যাইয়া।
আসে অই উন্মাদিনী;
পুত্রবধ ক'রেছ কৌশলে,
তার কোপানলে ভস্ম হবে এইক্ষণে;
শীঘ্র চল ত্যজি' রণস্থল।

আশা

নবীনচন্দ্র সেন

[চট্টগ্রামের নওয়াপাড়া গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি.এ. পাশ করিয়া ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। বাঙ্গালার ইতিহাস অবলম্বনে ইনিই সর্বপ্রথম কাব্য রচনা করেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য লিখিয়া ইনি তদানীন্তন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হন। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য ব্যতীত ইনি 'অবকাশ-রঞ্জিনী,' 'রঙ্গমতী,' 'কুরুক্ষেত্র,' 'রৈবতক,' 'প্রভাস,' 'অমিতাভ,' 'অমৃতাভ,' 'খৃষ্ট,' প্রভৃতি বহু কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিন খানির মিলিতরূপ একখানি মহাকাব্য। শ্রীকৃষ্ণের জীবন, নবধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনের মহাব্রত ও মহাবাণী এই মহাকাব্যের উপজীব্য। কবির আত্মজীবনী 'আমার জীবন' সরস গদ্যরচনার অসামান্য নিদর্শন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩এ জানুয়ারী ইঁহার মৃত্যু হয়।]

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।
দুর্ব্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না স্বজিত বিধি, হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে,
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ-প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির-শোভা! পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস!

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!

ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানবসকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়। অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।

ওই যে কাঙ্গাল বসি' রাজপথ-ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি!—কঙ্কাল-শরীর,
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ-আধার ;
দু'নয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি' দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপিত ; রুগ্ণ কলেবর ;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কাণে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

অথবা সুদূরে কেন করি অন্বেষণ?
দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি।
নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
করে নি, সে পথে কেন হবে মম গতি?
বঙ্গ-ইতিহাস, হায়, মণিপূর্ণ খনি।
কবির কল্পনালোকে কিন্তু আলোকিত
নহে যা, কেমনে আমি, বল কুহকিনি,
মম ক্ষুদ্র কল্পনায় করি প্রকাশিত?
না আলোকে যদি শশী তিমিরা রজনী,
নক্ষত্রের নহে সাধ্য উজলে ধরণী।

কোন্ পুণ্যবলে সেই খনির ভিতরে
প্রবেশি' গাঁথিয়া মালা অবিদ্ধ রতনে
দোলাইব মাতৃভাষা-কম-কলেবরে,—
সুকবি সুকরে গাঁথা মহাকাব্য-ধনে
সজ্জিত যে বরবপুঃ? কিংবা অসম্ভব
নহে কিছু, হে দুরাশে, তোমার মায়ায়;
কত ক্ষুদ্র নর, ধরি পদচ্ছায়া তব,
লভিয়াছে অমরতা এ মর ধরায়
অতএব দয়া করি' কহ, দয়াবতি!
কি চিত্রে রঞ্জিছ আজি শ্বেত-সেনাপতি?

বীর অভিমন্যু

নবীনচন্দ্র সেন

শোকোন্মত্ত ধনঞ্জয় যাইতে ছুটিয়া
আস্ফালি' গাণ্ডীব অসি ধরিলা কেশব,—
জ্ঞানবক্ষে শোকবেগ হইল রোধিত।
"এই বিশ্ব লীলা-ভূমি"—গদ্‌গদ স্বরে
কহিলেন নারায়ণ,—"বিশ্বনিয়ন্তার,
নিয়তির ক্রীড়াক্ষেত্র। জড় ও চেতন
আসে এই রঙ্গভূমে, হয় তিরোধান,
করি' ক্ষুদ্র অভিনয় নিয়তির করে।
জ্বলিছে নিবেছে দীপ আলোকিয়া গৃহ
ইচ্ছায় গৃহীর, সাধি' কার্য্য গৃহস্থের,—
আলোকপ্রদান, পার্থ! নিয়তি দীপের।

আমি নর ক্ষুদ্র দীপ, গৃহী নারায়ণ।
আমি নর, মনুষ্যত্ব নিয়তি আমার।
জন্মিতেছি, মরিতেছি, নিয়তি আমার
পালিতেছি এইরূপে জন্ম-জন্মান্তরে
নারায়ণ-লীলাভূমে, ক্ষুদ্র চক্র আমি
সেই মহালীলাযন্ত্রে, নিয়তি-পালন
সুখ মম, ঘোর শোক নিয়তি-লঙ্ঘন,—
ধনঞ্জয়! নাহি শোক দ্বিতীয় আমার।
দেখ বৎস, সাধি' বীর-নিয়তি তাহার
মানব-উদ্ধার-ব্রতে, ব্রতে নিয়ন্তার,
লভিয়াছে সুখ-নিদ্রা কোলে জননীর
শান্তিময়ী, প্রীতিময়ী। নহে শোক-অশ্রু
ধনঞ্জয়! আনন্দাশ্রু কর বরিষণ।
তোমার, আমার, আজি ভগ্নী সুভদ্রার,
সার্থক জীবন। আজি ধন্য জগতের
দুই মহাকুল। দুই শক্তি-স্রোতস্বতী
অভিমন্যু বীরদর্পে করি' সম্মিলিত,
করিয়াছে কি প্রয়াগে আজি পরিণত!
কর শোক পরিহার। করি' অনুসার
চল এই মহাগতি, সাধিয়া নিয়তি
এইরূপে, দুই জনে লভি নিরবাণ।"

ধনঞ্জয় শোকবেগ করি' সংবরণ
পুত্র-সারথির পানে চাহি জিজ্ঞাসিলা—
"কহ সূত! কোন্ মতে করি' মহারণ
লভিল এ মহাশয্যা কুমার আমার?"

*　　*　　*

"ওকি দেখা যায়!"—ত্রস্তে কহিলা সারথি,
চমকিল শ্রোতাগণ আতঙ্কে বিস্ময়ে—
"দেখিলাম বজ্রাঘাতে মহাশৈলমালা
হয় যথা বিচুর্ণিত, হইল চুর্ণিত
কুমারের অস্ত্রে চক্রব্যূহের প্রাচীর।
বিদারিয়া হুহুঙ্কারে শৈল অবরোধ
ছুটি' যথা মহানদ প্রবেশে সাগরে,
ফেনিল তরঙ্গে সিন্ধু করি' প্রকম্পিত,
মুহূর্ত্তে বিদারি' চক্রব্যূহ পরাক্রমে,
উড়াইয়া মহাবেগে, তৃণ-মুষ্টি মত,
মত্ত করী সিন্ধুরাজ দ্বার-রক্ষাকারী,
পশিল কুমার কুরু-সৈন্যের সাগরে
উৎক্ষোভিত, উদ্বেলিত, ভীত, প্রকম্পিত।

* * *

মুহূর্ত্তে কুমার-বীর্য্য প্রভঞ্জন-দর্পে
বহিল জলধিগর্ভে, জলধি-নির্ঘোষে
ধ্বনিল বিজয়শঙ্খ, প্রতিধ্বনি তুলি'
শত শত মহাশঙ্খে কৌরব-বেলায়।
কৌরবের সৈন্যারণ্যে উঠিল জ্বলিয়া
হুহুঙ্কারে দাবানল অস্ত্রে কুমারের;
কৌরবের হাহাকারে ছাইল গগন।
দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপ, অশ্বত্থামা,
বৃহদ্বল, দুঃশাসন, শল্য—একে একে
করিয়া সংগ্রাম ঘোর হইয়া লাঞ্ছিত,
পলাইল বার বার শৃগালের মত।

* * *

তখন ব্যূহিত সৈন্যে, ধনু বীরেন্দ্রের
বর্ষিতে লাগিল মৃত্যু বরিষার মত,
পড়িল কৌরব-সৈন্যে মহাহাহাকার।
নিরুপায় সপ্তরথী একত্রে তখন
—ক্ষত্রিয়ের সে কলঙ্ক কহিব কেমনে?—
আক্রমিল একমাত্র শিশু অসহায়,
আক্রমে নিষাদগণে শার্দ্দূল যেমতি
জালাবদ্ধ,—বসুন্ধরে! যাও রসাতল!
কর্ণ কাটিলেন ধনু;—অশ্ব ভোজরাজ।
ছিন্নধনু, রথহীন, খড়্গচর্ম্ম ধরি'
রথ হ'তে লম্ফ দিয়া পড়িলে ভূতলে
শত্রুমধ্যে, মেঘমধ্যে ক্ষিপ্ত সিংহ যথা,—
দ্রোণ অসি, কর্ণ চর্ম্ম ফেলিলা কাটিয়া।
তখন ধরিয়া চক্র, চক্রধরমত
শোভিল কুমার তব। কাটিয়া অরাতি
আসিছে ফিরিয়া চক্র করে কুমারের
মুহুর্মুহুঃ খেলা করি' বিদ্যুতের মত।
বরষি' অজস্র শর সপ্তরথী মিলি'
কাটিলা সে মহাচক্র, বিঁধিলা শরীর
বীরেন্দ্রের অবিচ্ছিন্ন। সেই বীর-শোভা,
পুষ্পিত কিংশুকসম বিক্ষত মুরতি,
ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ, আরক্ত নয়ন
আকর্ণ-বিস্তৃত, ঊর্দ্ধে ধৃত-চক্র বাহু,
সপ্তরথি-সংবেষ্টিত সে নির্ভীক রণ,
ঘন ঘন সিংহনাদ ঘোর অট্টহাসি,
যে দেখেছে, যে শুনেছে তব তনয়ের
ভুলিবে না ইহজন্মে। ছিন্ন-চক্র, শিশু
তখন লইয়া গদা, গদাধরমত

ছুটিল, পড়িয়া ভূমে ভয়ে দ্রোণাত্মজ
রথ হ'তে তিন লম্ফে গেল পলাইয়া।
সুবলনন্দন সপ্ত, সপ্ততি গান্ধার,
রথী সপ্তদশ, দশ মাতঙ্গ বিনাশি',
চূর্ণ করি' অশ্বরথ সারথিসহিত
দুঃশাসন-তনয়ের, গদাযুদ্ধে ঘোর
গদাঘাতে দুইজন পড়িলা ভূতলে।
না উঠিতে পুত্র তব,—অবসন্নপ্রাণ
রণ-শ্রমে, রক্তস্রাবে,—দুঃশাসন-সুত
—ক্ষত্রকুলে কুলাঙ্গার নৃশংস পামর,—
প্রহারিল গদা অর্দ্ধ-উত্থিত মস্তকে,—
ধনঞ্জয়! পুত্র তব উঠিল না আর।"

বঙ্কিম-প্রয়াণে

গোবিন্দচন্দ্র দাস

[গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার জয়দেবপুর গ্রামে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জীবন দারুণ দারিদ্র্য, অত্যাচার ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। ইনি অধিক লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। ইনি স্বদেশভক্ত স্বভাব-কবি। ইঁহার রচনার মধ্যে একটি নির্ভীক বলিষ্ঠতা ছিল। ইনি যাহা অনুভব করিতেন বা চিন্তা করিতেন, তাহাকেই যথাযথ বাণীরূপ দান করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। 'প্রেম ও ফুল,' 'কুঙ্কুম', 'অগুরু,' 'কস্তুরী,' 'চন্দন,' 'ফুলরেণু,' 'বৈজয়ন্তী' প্রভৃতি কবিতাপুস্তক রবীন্দ্রযুগেও ইঁহার আত্মস্বাতন্ত্র্য ও রচনারীতির স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।]

বঙ্গের বসন্তকবি ভারতভূষণ,
কত ফুলে সাজাইলে ভাষা-ফুলবন।

* * * *

তুমিই সাজালে ভাষা শ্যাম সুষমায়
বালিকা প্রফুল্ল আনি' গড়াইলে দেবীরাণী
বিদ্যুতে মাখিয়া ফুল দেব-প্রতিভায়।
কল্পনা-কালিন্দীতটে গড়িলে আনন্দমঠে
ভারত-ভবিষ্য-স্বর্গ সুমেরুছায়ায়।
শিখালে সন্তানধর্ম্ম জননীর প্রিয় কর্ম্ম
মহাবীর সত্যানন্দ মহাপ্রাণতায়।
তুমি সাজাইলে ভাষা অনন্ত শোভায়।

তুমি সাজাইলে ভাষা নানা আভরণে,
কত রঙ্গ কত রস কমলাকান্তের বশ,
লিখিলে রহস্য কত বিজ্ঞানে দর্শনে।
বুঝাইলে যোগভক্তি কৃষ্ণের অসীম শক্তি,
দেখালে আদর্শ নব দেবনারায়ণে।
ঝেড়ে পুঁছে ধূলামাটি হিন্দুর আসন খাঁটি
বুঝাইলে প্রেমধর্ম্ম দেশবাসিগণে।
তোমার স্বাধীন মত শরতের রৌদ্রবৎ
জ্বলিতেছে ভারতের গগনে গগনে।
প্রতিভার দীপ্ত রবি বাঙ্গালীর মহাকবি
কেন অস্তে যাও আজ অগস্ত্য-গমনে,
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষা-ফুলবনে?

যাবে তুমি? এ জগতে কেবা বল যায়?
কেহ গেলে হাসে লোকে কেহ গেলে কাঁদে শোকে,
বিদরে পরাণ কারে করিতে বিদায়।
বসন্ত বাঁচিয়ে থাক নিদাঘ শিশির যাক,
কুলোর বাতাসে আর তুষের ধুঁয়ায়।

বারো মাস নিতি নিতি থাকুক পূর্ণিমা তিথি
চ'লে যাক অমা-রাহু ক্ষতি নাই তায়।
তুমি থাক মোরা যাই আমরা যে ভস্মছাই
কি হবে এ কোটি কোটি রেণুকণিকায় ?
আমরা পথের ধূলি কর্দ্দম-কঙ্করগুলি
আমরা নীচের নীচ প'ড়ে থাকি পায়।
বিধির অপূর্ব্ব দান, দেশের গৌরব-মান
তুমি কবি কোহিনূর কিরীটচূড়ায়।
মোরা যাই তুমি থাক, সুখী কর মায়।

শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

[কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের পিতৃভূমি হুগলী জেলার জিরেট-বলাগড় গ্রামে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি যুক্তপ্রদেশের প্রবাসী ছিলেন। এম.এ., বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে ওকালতি করেন। ইনি কলিকাতার সে-কালের শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, এই কবি শেষজীবনে অন্ধ হইয়া যান। অশোকগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, অপূর্ব্ব নৈবেদ্য, শেফালিগুচ্ছ ইত্যাদি ইঁহার রচিত অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ আছে। ভাবভোলা ভক্তকবি বলিয়া ইঁহার প্রতিষ্ঠা আছে।

মুক্ত মেঘ-বাতায়নে বসি',
এলোকেশী কে ঐ রূপসী
জলযন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে ?
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ করি',
সারাদিন, সারারাত্রি, বারিরাশি পড়িছে ঝঝরি।

চমকিল বিদ্যুৎ সহসা।
এ আলোকে বুঝিয়াছি, এ নারীরে চিনিয়াছি;
এ যে সেই সতত-সরসা,
ভুবনমোহিনী ধনী রূপসী বরষা।
শ্যামাঙ্গী বরষা আজি, বিহ্বলা মোহিনী সাজি',
এলায়ে দিয়েছে তার মসীবর্ণ কালো কালো চুল;
শ্রীকণ্ঠে প'রেছে বালা, অপরাজিতার মালা,
দু'কর্ণে দোদুল দোলে নীলবর্ণ ঝুমকার ফুল।

নীলাম্বরী সাড়ীখানি পরি',
অপূর্ব্ব মল্লার রাগ ধ'রেছে সুন্দরী।
ন্যস্ত কেশরাশি হ'তে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে;
কালোরূপ ফাটিয়া পড়িছে।
যাই বলিহারি!
কে দেখেছে কবে ভবে হেন বরনারী?

ভারতের মানচিত্র

যোগীন্দ্রনাথ বসু

[১২৬৪ সালে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার নিতাড়া গ্রামে স্বদেশভক্ত কবি যোগীন্দ্রনাথ বসুর জন্ম হয়। কেবল কবি নহেন, ইনি বাঙ্গালা ভাষার একজন প্রতিষ্ঠাবান্ গদ্য লেখক। বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রন্থ মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত ইঁহারই রচিত। 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' নামে দুইখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবার জন্য ইনি কবিভূষণ উপাধি লাভ করেন। স্যার আশুতোষ ইঁহার কাব্যগ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। ১৩৩৪ সালে যোগীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।]

শিক্ষক—হের বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র, আমা সবাকার

পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা,
এদেশের ফলে জলে পালিত আমরা।
কর প্রণিপাত তুমি, কর প্রণিপাত!

ছাত্র—(প্রণাম) ঐ যে চিত্রের শিরে ঘন মসীরেখা
পূরব-পশ্চিম ব্যাপি' রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব! বলুন আমারে।

শিক্ষক—নহে তুচ্ছ মসী-রেখা; ওই হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী! জনক যেমন
স্নেহদানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল-দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহ-ধারাদানে,
পালিছেন সযতনে! ওই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র; কত সাধুজন,
বিরচি' আশ্রম সেথা, পূজি' ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর! সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে ওই গৌরীশৃঙ্গ। দেখ বাম দিকে
ওই বদরিকাশ্রম; মহামুনি ব্যাস,
বসি' যে আশ্রম-মাঝে রচিলা পুলকে
অমর ভারত-কথা। অবিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ। আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি' উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা! এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি' যুগ যুগ
হইয়াছে পুণ্যভূমি! কর নমস্কার।

ছাত্র—(প্রণাম) ওই যে চিত্রের বামে পঞ্চরেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার?

শিক্ষক—ওই পঞ্চনদ, বৎস। এই পুণ্যভূমি
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি' বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান! নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদী-কূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস! অমর ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জন;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি!

ছাত্র—ওই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধসম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার?

শিক্ষক—এই বিন্ধ্যাচল, বৎস! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত! উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারে পূর্ণ! মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, আর্য্যের বাস স্থাপিলা এদেশে;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে
শোভিছে এ দেশ-মাঝে। এই বনভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা-চীর ধরি',
কাটাইলা কাল যেথা। পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী, কল-কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনো বহেন সেথা! পবিত্র এ দেশ
সীতারাম-পদ-স্পর্শে! কর নমস্কার!

ছাত্র—(প্রণাম) গুরুদেব। কৌতুহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি' তবে
কোথা বঙ্গভূমি, আজ দেখান আমারে!
শিক্ষক—ওই বঙ্গভূমি, বৎস। হিমাদ্রি আপনি
মুকুট-আকারে, হের, শোভে শিরোদেশে;
ধৌত করি' পদতল বহেন জলধি;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
'সুজলা', 'সুফলা', 'শ্যামা'। ভুষারূপে তার
হের ওই নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যেথা
হইলেন অবতীর্ণ; সাঙ্গোপাঙ্গ ল'য়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা;
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুকতনু ওই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে। নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম ওই, পতিতপাবনী
তারিতে সগরবংশ অবতীর্ণ। যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ!
কর প্রণিপাত তুমি; বিধাতার কাছে
মাগ' এই বর, বৎস। মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি-মায়ে!
ছাত্র—বিশাল এ চিত্র, দেব! কৃপা করি' তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।
শিক্ষক—আছে শত শত, বৎস! কি বর্ণিব আমি?
বর্ণিলে জীবনকাল না ফুরাবে তবু!
রত্নপ্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল, পাদ-মূলে তাঁর
দেখ শীর্ণকায়া ওই বহিছে রোহিণী,

হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তটদেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া ওই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী, হরিশ্চন্দ্র যথা
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য! দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরব-স্মৃতি-শিলা ধরি' বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী,—বিক্রমের পুরী,
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস, দেশ-দেশান্তরে।
কি আর অধিক ক'ব? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের ;—
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি, কণ্ঠে মধুবাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ!
তেমতি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত।
সামান্য এ দেশ নয়! বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে! কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব! কি বলিব আর।

ধূলা

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই আগষ্ট ইঁহার জন্ম এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি কলিকাতা বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ অক্রূরদত্তের বংশীয় নরেশচন্দ্র দত্তের পত্নী ছিলেন। ইনি বহু কবিতা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার 'অশ্রুকণা,' 'ভারত-কুসুম,' 'শিখা' ও 'অর্ঘ্য' গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালার মহিলা-কবিদিগের মধ্যে ইনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।]

কোন্ ঐন্দ্রজালিকের অস্থি-অবশেষ
কহ তুমি, লো কণিকে, মোর কাণে-কাণে?
সমীর-বাহিনী তন্বী কে না তোমা জানে?
উড়ে' উড়ে' কর সদা কাহার উদ্দেশ?
হেন স্থান নাহি যথা নাহি তব গতি!
প্রকাশ্যে নিবস পথে, যাও পায় পায়—
ঘৃণাভরে ফেলে ঝেড়ে' কেবা না তোমায়?

নিরভিমানিনি অয়ি! তবু কর স্থিতি
লুকায়ে, গৃহের কোণে, অযত্ন-পালিতা
দরিদ্র বালার মত ধনীর ভবনে;
দীনেরো কুটীরে তুমি নহ সম্মানিতা।
লো মলিনে! অই তব মলিন বসনে
ঢাকা যে সৌন্দর্য্যরাশি, বিশ্বানুলেপনা!
মোরা বিজ্ঞ, মোরা অজ্ঞ! চিনেও চিনি না!

জগৎ-জননী-রূপা! তোমারে সে চিনে
স্বভাব-দীক্ষিত-শিশু, মহানন্দ মনে

মাথে গায় নিয়ে তুলে অঞ্জলি-অঞ্জলি ;
নগ্ন অঙ্গে কিবা শোভা ধর তুমি ধূলি।
সর্ব্বাঙ্গে বুলা'য়ে কর দাও সাজাইয়া,
নেহারি' সন্ন্যাসী নাগা মুগ্ধ হয় হিয়া।

বাল্যসখি, চিনি' তব মধুর মুরতি,—
করিয়াছি এক দিন সাদরে আরতি।
আদ্যন্ত-রূপিণি, তব মহিমা অশেষ,
অবসান তোরি মাঝে সর্ব্ব-গর্ব্ব-লেশ।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[জোড়াসাঁকোর ঠাকুরপরিবারের স্বনামধন্য মহাপুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইঁহার জন্ম হয় ১২৬৮ সন, ২৫শে বৈশাখ (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতায়। ইঁহার বাল্য-কৈশোরের শিক্ষা প্রধানতঃ পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের তত্ত্বাবধানে তাঁহার নিজ গৃহেই সম্পাদিত হয়। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত ইনি অক্লান্তভাবে সাহিত্যসেবা করিয়াছেন। সাহিত্যের সর্ব্ববিধ শাখায় ইঁহার দান অনন্যসাধারণ। প্রায় ৭০ বৎসর ধরিয়া ইনি গদ্যে ও পদ্যে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সে সকলের তালিকা দেওয়াও অসম্ভব।

ইনি বহুবার ইউরোপ ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির বাণী প্রচার করিয়াছেন। দেশী ও বিদেশী বিবিধ ভাষায় ইঁহার বহু গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। জীবদ্দশায় এত খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা জগতের কোন সাহিত্যিক বা মহাপুরুষ কখনও লাভ করেন নাই। জগতের সর্ব্বত্রই ইনি অভিনন্দিত হইয়াছেন। জগতের বহু বিদ্বৎসমাজ হইতে ইনি বহু উপাধি লাভ করিয়াছেন। এসিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ইনি নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনে ইনি 'বিশ্বভারতী' নামে একটি আদর্শ বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে যে যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন বঙ্গসাহিত্যে এখন সেই যুগই চলিতেছে ১৩৪৬ সন, ২২শে শ্রাবণ (১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে) রবীন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।]

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত-পাখীর গান।
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে,—উথলি' উঠেছে বারি,
ওরে,—প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি' কাঁপিছে ভূধর, শিলা রাশিরাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজি' উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।

মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি' যখন উঠেছে বাসনা, জগতে তখন কিসের ডর॥

আমি—ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি—ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি'।

শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল, তালে তালে দিব তালি।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হ'য়ে আছে ভোর॥

কি জানি কি হ'ল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে,—চারিদিকে মোর,
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্।
ওরে আজ—কি গান গেয়েছে পাখী, এসেছে রবির কর॥

গানভঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখী॥
শাণিত তরবারি গলাটি যেন নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা, বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে॥
আপনি গড়ি' তোলে বিপদ্‌জাল আপনি কাটি' দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক্ মানে, সঘনে বলে "বাহা বাহা"॥

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায় কাঠের মত বসি' আছে।
বরজলাল ছাড়া কাহারো গান ভালো না লাগে তা'র কাছে॥
বালকবেলা হ'তে তাহারি গীতে দিল সে এতকাল যাপি',
বাদল দিনে কত মেঘের গান, হোলির দিনে কত কাফি॥

গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে, গেয়েছে বিজয়ার গান,
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গেছে দু'নয়ান ॥
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে সভার গৃহ গেছে পূরে,
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা ভূপালী মূলতানী সুরে ॥
ঘরেতে বারবার এসেছে কত বিবাহ-উৎসব-রাতি,
পরেছে দাস-দাসী লোহিত বাস জ্বলেছে শত শত বাতি ;
বসেছে নব বর সলাজ মুখে পরিয়া মণি-আভরণ,
করেছে পরিহাস কানের কাছে সমবয়সী প্রিয়জন,
সামনে বসি' তার বরজলাল ধরেছে সাহানার সুর ;—
সে-সব দিন আর সে-সব গান হৃদয়ে আছে পরিপূর ॥
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই মর্ম্মে গিয়ে নাহি লাগে,
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে ॥
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু কাশীর বৃথা মাথানাড়া,
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়, হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া ॥

থামিল গান যবে, ক্ষণেক তরে বিরাম মাগে কাশীনাথ।
বরজলাল পানে প্রতাপ রায় হাসিয়া করে আঁখিপাত ॥
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ কহিল, "ওস্তাদ-জী,
গানের মত গান শুনায়ে দাও, এরে কি গান বলে, ছি ॥
এ যেন পাখী ল'য়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা।
সেকালে গান ছিল, একালে হায় গানের বড়ো অবহেলা ॥"

বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
বিনতি করি' সবে, সভার মাঝে আসন নিল ধীরে ধীরে ॥
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে তুলিয়া নিল তানপুর,
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি' ইমনকল্যাণ সুর ॥
কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায় বৃহৎ সভাগৃহকোণে,
ক্ষুদ্র পাখী যথা ঝড়ের মাঝে উড়িতে নারে প্রাণপণে ॥

বসিয়া বামপাশে প্রতাপরায় দিতেছে শত উৎসাহ—
"আহাহা, বাহা বাহা" কহিছে কানে, "গলা ছাড়িয়া গান গাহ॥"

সভার লোকে সবে অন্যমনা, কেহ বা কানাকানি করে।
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে, কেহ বা চ'লে যায় ঘরে॥
"ওরে রে আয় ল'য়ে তামুক পান," ভৃত্যে ডাকি' কেহ কয়।
সঘনে পাখা নাড়ি' কেহ বা বলে, "গরম আজি অতিশয়॥"
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক, ক্ষণেক নাহি রহে চুপ;
নীরব ছিল সভা, ক্রমশঃ সেথা শব্দ উঠে শতরূপ।
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়, তুফান মাঝে ক্ষীণ তরী;
কেবল দেখা যায় তানপুরায় আঙুল কাঁপে থরথরি'॥
হৃদয়ে যেথা হ'তে গানের সুর উছসি উঠে নিজ সুখে।
হেলার কলরব শিলার মত চাপে সে উৎসের মুখে॥
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ দু'দিকে ধায় দুইজনে,
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান বরজ গায় প্রাণপণে॥
গানের এক পদ মনের ভ্রমে হারায়ে গেল কী করিয়া,
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে লইতে চাহে শুধরিয়া॥
আবার ভুলে' যায়, পড়ে না মনে, সরমে মস্তক নাড়ি'
আবার সুরু হ'তে ধরিল গান, আবার ভুলি' দিল ছাড়ি'॥
দ্বিগুণ থরথরি কাঁপিছে হাত, স্মরণ করে গুরুদেবে।
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতর, যেন বাতাসে দীপ নেবে-নেবে॥

গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি'
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি' গাহিতে গিয়া হা-হা করি'॥
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি'
গানের সূতা ছিঁড়ি' পড়িল খ'সে অশ্রু-মুকুতার রাশি॥
কোলের সখী তানপুরার পরে রাখিল লজ্জিত মাথা;
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্য-ক্রন্দন-গাথা॥

নয়নছলছল প্রতাপ রায় কর বুলায় তার দেহে।
"আইস, হেথা হ'তে আমরা যাই," কহিল সকরুণ-স্নেহে ॥
শতেক দীপজ্বালা নয়ন-ভরা ছাড়ি' সে উৎসব-ঘর
বাহিরে গেল দু'টি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা কর ॥
বরজ করজোড়ে কহিল, "প্রভু, মোদের সভা হ'ল ভঙ্গ।
এখন আসিয়াছে নূতন লোক ধরায় নব নব রঙ্গ ॥
জগতে আমাদের বিজন সভা কেবল তুমি আর আমি।
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামী ॥
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে,
গাহিবে এক জন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে ॥
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বন-সভা শিহরি' কাঁপে তবে সে মর্ম্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত র'য়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে।
যেখানে প্রেম নাই বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে ॥"

——————

ভারততীর্থ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে' নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে ॥
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে ॥

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা,
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হ'তে—সমুদ্রে হ'ল হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য, হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হূণ-দল, পাঠান-মোগল, এক দেহে হ'ল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হ'তে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে॥

রণধারা বাহি' জয়গান গাহি', উন্মাদ কলরবে
ভেদি' মরুপথ গিরি-পর্ব্বত যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর ;
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর।
হে রুদ্র বীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি' দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে,—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে॥

হেথা একদিন বিরাম-বিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি'।
তপস্যা-বলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোল আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে,—
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে॥

সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা,
হবে তা সহিতে মর্ম্মে দহিতে আছে যা ভাগ্যে লিখা।

এ দুখ বহন কর মোর মন, শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ-ভয় কর কর জয়, অপমান দূরে যাক্।
দুঃসহ ব্যথা হ'য়ে অবসান
জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ!
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।।

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি' মন ধর হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক্ অপনীত সব অপমান-ভার।
মা'র অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।।

দুর্ভাগা দেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যা'দের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যা'রে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে,
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হ'তে যেথায় তাঁদের দিলে ঠেলে,
সেথায় শক্তিরে তব নির্ব্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হ'য়ে ধূলায় সে যায় ব'য়ে,
সেই নিম্নে নেমে এস, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হ'তে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যা'রে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে!
পশ্চাতে রেখেছ যা'রে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যা'রে,
তোমার মঙ্গল ঢাকি' গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান!
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতেক শতাব্দী ধ'রে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার!
তবু নত করি' আঁখি, দেখিবারে পাও না কি—
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান্?
অপমানে হ'তে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

দীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ-কুণ্ডল-কণ্ঠী অলঙ্কাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি'
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
কর মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে;
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে। দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি' নিলীন,
কর্ম্মক্ষেত্রে করি' দাও সক্ষম স্বাধীন।

ভারতের শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১)

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,

ভুলি' জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্বদুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

(২)

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি স্বল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মত। অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য্য যত। আজি সভ্যতার
অন্তহীন আড়ম্বরে, উচচ আস্ফালনে,
দরিদ্র-রুধির-পুষ্ট বিলাস-লালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জ্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্ব্বর
রুদ্ররক্ত অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্দ্ধায়
নিঃসঙ্কোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব-গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল, নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ।
কে রাখিবে ভরি' নিজ অন্তর-আগার
আত্মার সম্পদ্‌রাশি মঙ্গল উদার।

মুষ্টিভিক্ষা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

[ইনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পুরাতত্ত্ব ও গবেষণা-মূলক অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষায় লিখিয়া যশ অর্জন করিয়াছেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। সম্বলপুরে ওকালতী ব্যবসায় করিয়া ইনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অন্ধ হইয়া ইঁহাকে ওকালতী ছাড়িয়া দিতে হয়। অন্ধ অবস্থাতেও ইনি অবিশ্রান্তরূপে সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন এবং বঙ্গবাণী নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। 'জীবনবাণী,' 'কালিদাস,' 'থেরীগাথা,' 'হেঁয়ালি,' 'ছিটে-ফোঁটা,' 'যজ্ঞভস্ম', 'Elements of Social Anthropology,' 'Aborigines of Central India,' 'Orissa in the Making,' 'History of the Bengali Language' প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।]

মুষ্টিভিক্ষা চাই রাণীমা মুষ্টিভিক্ষা চাই।
হাজার রাজা উজির ধ'রে দয়া যেচে ভিক্ষা ক'রে
রচেছ যে গরিবখানা সেথায় নাহি যাই।
কোথা সেথা করুণ আঁখি? কা'রে বা মা ব'লে ডাকি?
মাইনে-করা দাতা সেথা বিষম বালাই।
মুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

ও মা তোমার পুণ্য-দৃষ্টি অন্নমুঠায় করে মিষ্টি;
রাঙ্গা হাতে অন্নপূর্ণা, দাও মা দানা খাই।
চা'লের সাথে ডাল স্বল্প আধপেটাতে মেটে ক্ষুধা;
দয়া-মাখা অন্ন পেয়ে ধন্য হ'য়ে যাই।
মুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

হাড়-জির্‌জির্‌, গায়ে ধূলা, ঐ যে আমার ছেলেগুলা,
তোমার যত সোণার চাঁদে ওদেরে দেখাই;
বড় খুসী হয় মা দেখে কত গল্প করে জেঁকে।
তোমার সুখে মাগো মোরা দুঃখ ভুলে যাই।
দৃষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

তোমার গৃহ-কাননখানি চক্ষু জুড়ায় দেখলে রাণী।
প্রাণের টানে নিত্য আমি দৌড়ে আসি তাই।
বাসি রঙিন ফুলে নানা পূর্ণ আছে কাঙ্গাল-খানা;
টাটকা-তোলা দয়া-তরুর কুসুম হেথা পাই।
তুষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

দুঃখের উপর দুঃখ নানা গ'ড়ো না তায় গরীব-খানা।
ঘুরে ঘুরে তোমার দ্বারে সুখ যে বড় পাই।
সোণার ঘরে লক্ষ্মী মা গো ধন-পুত্র নিয়ে জাগো,
ভিক্ষা নিতে এসে দুটি চক্ষে দেখে যাই।
ইষ্ট-ভিক্ষা চাই মা তোমার, মুষ্টি-ভিক্ষা চাই।

সীতা-নির্ব্বাসন

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৭০ সালে (১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) ৪ঠা শ্রাবণ ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিবিদ্যাশিক্ষার্থ ষ্টেট স্কলারশিপ লইয়া ইনি বিলাতযাত্রা করেন। সেখানে কৃষি-বিদ্যালয়ে অধ্যয়নান্তে দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হন। নাট্যরচনা ও হাসির গানরচনায় ইনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'কল্কি অবতার,' 'আর্য্য-গাথা,' 'মন্দ্র,' 'হাসির গান,' 'আষাঢ়ে,' 'ত্র্যহস্পর্শ,' 'বিরহ,' 'পাষাণী,' 'তারাবাই,' 'রাণা-প্রতাপ,' 'দুর্গাদাস,' 'নুরজাহান,' 'সাজাহান,' 'মেবার-পতন,' 'চন্দ্রগুপ্ত,' 'সীতা,' 'সিংহল-বিজয়,' 'পরপারে' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

[স্থান—রাজসভা, কাল—প্রভাত। সভাভঙ্গান্তে সিংহাসনারূঢ় একাকী রাম।]

(ভরতের প্রবেশ)

ভরত। এ কি শুনি মহারাজ।

রাম। কি এ কথা
ইতিমধ্যে রাষ্ট্র নগরে সর্ব্বথা ?
ভরত। না ভূপতি, শুদ্ধ প্রাসাদ-ভিতর ;—
তবে ইহা সত্য ?
রাম। সত্য প্রিয়বর।
ভরত। করিয়াছ স্থির ?
রাম। করিয়াছি স্থির।
ভরত। অসম্ভব ইহা।—তুমি রঘুবীর,
ধর্ম্মনিষ্ঠ, ন্যায়পর, বুদ্ধিমান্ ;
এ নিষ্ঠুরতা কি তোমার বিধান ?
—ইহা অসম্ভব।
রাম। নহে অসম্ভব।
কি বলিব বৎস! তুমি জানো সব ;
জানো—সীতা-ত্যাগ আজি চাহে সবে
অযোধ্যার প্রজা ?
ভরত। মহারাজ! তবে
তারা যাহা চাহে তাই দিতে হবে ?
অযোধ্যার প্রজা আজি যদি চাহে
করিতে নিরুদ্ধ সরযূ-প্রবাহে ;
ছিঁড়িয়া আনিতে কৈলাসশিখরে ;
ফেলে দিতে পঙ্কে টানি' মহেশ্বরে ;
কিংবা ইচ্ছা যদি অযোধ্যাবাসীর
বিচূর্ণ করিতে প্রাসাদ, মন্দির,
হর্ম্ম্য, দেবালয়, নগরে নগরে ;
জ্বালাইতে পল্লী, বিশ্ব-চরাচরে
খুলে দিতে অরাজক হাহাকার ;
বিশৃঙ্খল নীতি করিতে প্রচার
রাজ্যময় ; তারা চায় যদি শির

বন্ধু, মন্ত্রী, ভ্রাতা, জায়া, জননীর ;
তাও দিতে হবে?—আজি এই রীতি।
অযোধ্যার রাজ্যে এই রাজনীতি।
—কোথা সীতা দেবী, কোথায় কুক্কুর
অযোধ্যার প্রজা! কোথায় সুদূর
নীলাকাশে শুভ্র নক্ষত্রের ভাতি ;
কোথায় কর্দ্দমে ঘৃণ্য কীটজাতি!

রাম। কি বলিব প্রাণাধিক! অন্যপথ
বাছিবার নাহি। শুনিবে ভরত,
—ইহা কুলগুরু বশিষ্ঠ-আদেশ।

ভরত। বুঝিয়াছি তবে। সেই শুক্লকেশ,
দীর্ঘশ্মশ্রু, রুক্ষ, শীর্ণ, কৃশকায়,
শুষ্কপ্রেমস্নেহ দীর্ঘ তপস্যায়,
বশিষ্ঠের এই আদেশ কঠিন!
কি বুঝিবে সেই দয়ামায়াহীন,
নির্লিপ্ত সে বিপ্র চিন্তাকূপে অন্ধ
—সংসারে প্রেমের পবিত্র সম্বন্ধ?
রমণীর প্রেম কি সান্ত্বনাময়,
সতীর গভীর কোমল হৃদয়?
সে বিপ্র বশিষ্ঠ-আদেশে অযত্নে
ছুড়ে ফেলে দিবে এ অমূল্য রত্নে
দূরে পঙ্কে?—যদি ভূপতি তোমার
সতী সাধ্বী প্রতি এই ব্যবহার,
কে করিবে আর নারীর সম্মান?
দুর্ব্বল সহিষ্ণু রমণীর প্রাণ
হবে তাহা হ'লে পুরুষের ক্রীড়া
বিশ্বে ঘরে ঘরে। তার মনঃপীড়া
হইবে পতির উপহাসদ্রব্য ;

শিথিল হইবে পতির কর্ত্তব্য
অবলার প্রতি, প্রতি ঘরে ঘরে,
দেশ দেশ জুড়ি' ভারত-ভিতরে।

রাম। ভরত, এ সব বৃথা যুক্তি আর—
অটল স্থির এ সংকল্প আমার।

ভরত। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া)
যদি এই স্থির, তবে অযোধ্যার
অতীব দুর্দ্দিন।—কি কহিব আর
যদি এই স্থির, অযোধ্যাপতির
সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা, তবে এও স্থির,
আমি রহিব না এ অযোধ্যাধামে;
যাব কোন দূর পুণ্য বন-গ্রামে,
যেখানে নাহি এ নিষ্ঠুর বিধান;
সতীর সাধ্বীর এই অপমান,
ন্যায়ের নীতির এ বিপ্লব, আর
এ অরাজকতা, এই অবিচার।
ছেড়ে যাব এই রাজ্য—এই পুর—

রাম। ভরত—ভরত তুমিও নিষ্ঠুর?

(কৌশল্যার প্রবেশ)

কৌশল্যা। বাছা রাম।

রাম। মা, মা, তুমি যে এখানে?

কৌশল্যা। যে দারুণ কথা শুনিলাম কানে
কেমনে রহিব স্থির অন্তঃপুরে
প্রাণাধিক! তুই কি রাজবধূরে
রাজ্যের লক্ষ্মীরে দিবি বনবাস?
এ কি সত্য বাছা?

রাম। সত্য মা।

কৌশল্যা। বিশ্বাস
করিব এ কথা? তুই ন্যায়বান্,
সে যে তোরে জানি আপনার প্রাণ
হ'তে ভালবাসে। রাজার দুহিতা,
রাজার গৃহিণী, অভাগিনী সীতা,
মোর ঘরে এসে পায় নাই সুখ;
তার প্রতি শেষে তুইও বিমুখ?
শোন্ বাছা রাম।

রাম। জননি তুমিও—?

কৌশল্যা। রাম, কথা রাখ্। প্রাণাধিক প্রিয়,
সাধি কথা রাখ্। নহিস্ অবোধ,
ছাড়্ এ সংকল্প; রাখ্ অনুরোধ।

রাম। তুমিও ক'রো না অনুনয় মাতা,
পারিব না তাহা রাখিতে।

কৌশল্যা। বিধাতা
সাক্ষী, আমি ইহা করিতে দিব না
জীবিত থাকিতে।

রাম। হায় বিড়ম্বনা।

কৌশল্যা। তুই ন্যায়বান্, তুই ধর্ম্মনিষ্ঠ—

রাম। জানো না মা, ইহা মহর্ষি বশিষ্ঠ-
আদেশ—

কৌশল্যা। হউক বশিষ্ঠ-আদেশ,
ইহার পালনে নাহি ধর্ম্মলেশ।
এ নহে উত্তম, ন্যায়পর কাজ।
এ কার্য্য হইতে দিব নাক আজ।

রাম। সত্য করিয়াছি—

কৌশল্যা। আমিও কি সত্য
করি নাই? তোরে এ পাপ উন্মত্ত

আত্মঘাতী কাজ করিতে দিব না ?
রাম। মা, মা, স্থির হও, কর বিবেচনা।
কৌশল্যা। করিয়াছি। ইহা দিব না করিতে।
—মাতৃ-আজ্ঞা চেয়ে তোর কি নীতিতে
গুরু-আজ্ঞা বড় ?—কে তোরে জঠরে
ধরেছিল রাম ? কে তোর অধরে
দিয়াছিল কথা ? স্নেহে বক্ষে ধরি'
কে পালিয়াছিল দিবস-শর্ব্বরী ?
গুরু না জননী ?—একবার তবে
গুরুর আজ্ঞাটি উল্লঙ্ঘিতে হবে
মায়ের আজ্ঞায়। প্রথম ও শেষ
এ আমার ভিক্ষা—গুরুর আদেশ
এর চেয়ে বড় ?—দেখ্‌ সীতা লাগি'
মাতা তোর আমি আজ ভিক্ষা মাগি।
—দিবি নে ?
রাম। মা মা মা, কি করিলে আজ।
তুমি ভূমে, আর আমি মহারাজ
হ'য়ে ব'সে আছি নিজ সিংহাসনে।
হারায়েছি জ্ঞান ? সজল-নয়নে
তুমি ভিক্ষা মাগ, আমি দিব না তা ?
হউক তোমার ইচ্ছা পূর্ণ, মাতা।
তুমি পূজ্যা মাতা, তুমি পদতলে,
মলিন, ধূসর, নয়নের জলে,
ভিক্ষা মাগো, আমি উচ্চে বসি' আর
বলিব "দিব না" ? জননী আমার।
সত্যভঙ্গ হোক, ভস্ম হোক রাম ;
মা, তোমার হোক পূর্ণ মনস্কাম।
কৌশল্যা। দীর্ঘজীবী হও প্রাণাধিক। আর

কি বলিব বৎস। বৃদ্ধা কৌশল্যার
এই আশীর্ব্বাদ—এ অমূল্য রত্নে
রাখিস্ হৃদয়ে চিরদিন যত্নে। (প্রস্থান)

শান্তা। আমি যাই এই শুভ সমাচার
অন্তঃপুরে ল'য়ে। ঘুচিল সবার
সকল আশঙ্কা।

রাম। পূর্ণ মনস্কামে
চ'লে যাও সব, ছেড়ে যাও রামে। (সকলের প্রস্থান)

রাম। কি করেছি আমি দেখি, বুঝে দেখি।
ভাঙ্গিয়াছি সত্য।—দেখি দেখি একি।
করিয়াছি ভঙ্গ স্বীয় অঙ্গীকার।
অচিরে এ কথা জানিবে সংসার
'সত্য ভাঙ্গিয়াছে রাম নরপতি'।
দূর ভবিষ্যতে অজাত সন্ততি
সূর্য্যবংশে—দিবে সহস্র ধিক্কার—
'ভেঙ্গেছিল রাম সত্য আপনার';
—যে সত্যরক্ষায় রাজা দশরথ,
ত্যজিল জীবন—হাসিবে জগৎ।
স্বর্গে দেবগণ দেখি' এই পণ্ড
লজ্জায় রক্তিম ফিরায়েছে গণ্ড।
রক্ষা করো স্বর্গে দেবগণ সবে
সত্যভঙ্গকারী দুর্ভাগ্য রাঘবে।
(জানু পাতিয়া প্রার্থনা)

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। প্রাণেশ্বর।
রাম। প্রিয়তমে।

গীতা। একি? তুমি
পরিপাণ্ডু বিকম্পিতদেহ ভূমি-
বিলুণ্ঠিত প্রিয়তম। উঠ।

রাম। সতি!
স্পর্শ করিও না। তুমি পুণ্যবতী,
আমি পাপী। নাহি এ পাপের সীমা।
আমি আনিয়াছি কলঙ্ককালিমা
ইক্ষ্বাকুর বংশে।

গীতা। শুনিয়াছি সব।
উঠ প্রাণেশ্বর!—জীবনবল্লভ!
সর্ব্বস্ব আমার! সম্ভব কি তাও?
সীতার কারণে তুমি ব্যথা পাও,
প্রাণাধিক?—উঠ, তব যশ-পুণ্য
রহিবে অটুট, রহিবে অক্ষুণ্ণ;
পিতৃসত্য তুমি রেখেছিলে প্রভু,
আমিও রাখিব পতি-সত্য। কভু
মলিন না হবে তব পুণ্যরশ্মি
সীতার কারণে। উঠ হে যশস্বী।
এই বক্ষ পাতি' দিব হাসিমুখে,
তুমি দলি' তাহে চলে' যাও সুখে
যশের মন্দিরে। তোমারে উদ্বিগ্ন
দেখিবে বসিয়া সীতা? সীতা বিঘ্ন
তোমার সুখের?—চিন্তা কর দূর;
ছেড়ে যাব আমি এ অযোধ্যাপুর।

রাম। এখনো বাহির হয় নাই প্রাণ?
আমি কি পিশাচ? আমি কি পাষাণ?

গীতা। ওঠ নাথ তবে, তব হাসিমুখ
দেখে যাই—ইচ্ছা শুধু এইটুক।—

রাম। একি ঘোর বাত্যা?—নয়নের পাশে
এ কি অন্ধকার ঘনাইয়ে আসে।
কল্লোলে সমুদ্র বক্ষের ভিতর।
সীতা কোথা তুমি? সীতা।
সীতা। (রামকে বক্ষে ধরিয়া) প্রাণেশ্বর।

বর্ষাসুন্দরী

মানকুমারী বসু

[যে সকল মহিলা-কবি কবি-প্রতিভায় আপনাদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, মানকুমারী বসু তাঁহাদের অন্যতমা। ইনি মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী (জ্যেষ্ঠ-তাতের পৌত্রী)। ইঁহার বাড়ী যশোহর সাগরদাঁড়ি গ্রামে। ১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ ইঁহার জন্ম, এবং ১৩৫৩ সালে ৯ই পৌষ ইঁহার মৃত্যু হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক" এবং "ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণ-পদক" পুরস্কার দিয়া ইঁহার কবি-প্রতিভাকে সম্মানিত করেন।]

রাত-দিন ঝম্-ঝম্ রাত-দিন টুপ্-টুপ্,
কি সাজে সেজেছ, রাণী! এ কি আজ অপরূপ।
আননে বিজলী-হাসি, গলায় কদম-হার,
আঁচলে কেতকী-ছটা—এ আবার কি বাহার।

শিখী নাচে, ভেকে গায়, মেঘে গুরু গরজন,
বসুধা আনন্দভরে কত করে আয়োজন।
ডুবেছে রবির ছবি, ডুবেছে চাঁদিয়া তারা,
আকাশ গলিয়া পড়ে তরল রজত-ধারা।

উথলিছে গঙ্গা, পদ্মা, পরাণে ধরে না সুখ,
মরমে রয়েছে ছেয়ে তোমারি স্নেহের মুখ!
জলদ বিজলী তারা এ উহার কর ধ'রে
চ'লেছে পিছল পথে, পা যেন পড়ে না স'রে!

প্রকৃতি ঢেকেছে মুখ শ্যামল সুন্দর বাসে,
চাহিলে তাহার পানে কত-কি-যে মনে আসে!
প্রাণ গলে—মন গলে—দিগন্ত অনন্ত গলে,
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে যেন প্রেমের তুফান চলে!

সসীমে অসীমে আজ হ'য়ে গেল মিশামিশি,
বুঝিনে আপন-পর চিনিনে সে দিবানিশি!
শরৎ বসন্ত শীত জানে শুধু হাসাহাসি,
বরিষা! তোমারি বুকে অনন্ত প্রেমের রাশি!

সাধে কি বেসেছি ভাল, সাধে কি আপনা ভুলে
দিয়েছি হৃদয়খানি তোমারি চরণ-মূলে!
জোছনার ফুল যারা ফুটিবে বসন্ত-বা'য়,
ঢালিব আমারি প্রাণ বরিষার নীলিমায়!

সবি ত ডুবিছে, রাণী! আমিও ডুবিয়া যাব,
চির-সাধনার ফল তোমাতে ডুবিলে পাব॥

দেব-ভোগ্য

কামিনী রায়

[ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা এবং সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের পত্নী। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। 'আলো ও ছায়া' লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যে কামিনী রায় প্রভূত যশ অর্জন করিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রাথমিক যুগে ইনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক' পুরস্কার দিয়া ইঁহার কবি-প্রতিভাকে সম্মানিত করিয়াছেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক-গমন করেন।]

সে গেছে, এ ধরা হ'তে তাহারি পশ্চাতে
অতুল সৌন্দর্য্য লুপ্ত তার;
ভস্ম তার মুষ্টিমেয় মিশে' মৃত্তিকাতে,
চিহ্ন কিছু রহিল না আর।

অশ্রুসিক্ত স্নিগ্ধ নাম ক্ষুদ্র পরিবারে
দিন কত উচচারিত হবে,
সুন্দর জীবন তার বিস্মৃতি-আঁধারে
চিরদিন আবৃতই র'বে।

যে মাধুরী ধরণীর নয়ন জুড়ায়,
কেহ আহা দেখিল না তারে,
কে জানে, তেমন দেখা যায় কি না যায়,
মরণের অন্ধকারপারে।

সে গেছে, এ ধরা হ'তে চিরদিন তরে
ঘুচে গেছে সুরভি উচ্ছ্বাস।
যে শোভা ফুটিয়া ঝরে নেত্র-অগোচরে,
তার কি গো বিফল বিকাশ?

তা'তো নয়, এ সৌন্দর্য্য নিরজনে রয়,
বিকাশে না মানবের তরে,
গোপনে সুবাস, শোভা আজীবন বয়,
নর-নেত্র পাছে ম্লান করে।
বিভুর আঁখির তরে ফুটিয়া ধরায়,
সৌন্দর্য্যের অর্ঘ্য ঝরে সুন্দরের পায়।

স্বপ্রকাশ

রজনীকান্ত সেন

[পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত সেনের জন্ম হয়। ইঁহাকে উত্তরবঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে হাসির কবিতা এবং গান-রচনা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। ইনি রাজসাহীতে ওকালতী করিতেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কর্কটরোগে হাসপাতালে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত 'বাণী' ও 'কল্যাণী' এই দুইখানি গানের বই বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছে।]

পূর্ণ জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।

উদ্বেলিত সিন্ধু তরঙ্গ উত্তাল
প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল।
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে—তুমি নিরমল।

পুষ্প কহে তুমি চিরশোভাময়,
মেঘবারি কহে মঙ্গল-আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল।

নদী কহে তুমি তৃষ্ণা-নিবারণ,
বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন,
প্রভাত কহিছে সুন্দর উজ্জ্বল।

রসিক কহিছে তুমি সুচতুর,
মুক্তিদাতা, ঘোষে জ্ঞান-তৃষাতুর,
সতী প্রেমে জানে তুমি সুমধুর,
বিভীষিকা—কহে পাপী অনর্গল;

অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান্,
ভক্ত কহে তুমি আনন্দ-নিধান,
সুখে শিশু করি' মাতৃস্তন্য পান,
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল।

——

জীবন-সোপান

অক্ষয়কুমার বড়াল

[কলিকাতা চোরবাগানে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার বড়ালের জন্ম হয়। ইঁহার আদিনিবাস চন্দ্রাগড়াঙ্গা। ইনি কবি বিহারীলালের শিষ্যস্থানীয় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সামসময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যে ইঁহার স্থান সর্ব্বোচ্চে। 'প্রদীপ,' 'কনকাঞ্জলি,' 'এষা,'

'শঙ্খ' প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

গৃহচূড়ে নর যথা সোপান বাহিয়া
উঠে ধীরে ধীরে,
এ জগতে নিরন্তর বাহি' শোকদুঃখস্তর
উঠে কি মানব-আত্মা তোমার মন্দিরে?

পদে পদে পরাজয়, অতি অসহায়,
অদৃষ্ট নির্ম্মম!
এই অশ্রু, এই শ্বাস করে কি জড়তা নাশ?
দেয় কি নবীন আশ, নবীন উদ্যম?

এই দর্প, অহঙ্কার, কু-চক্র, কু-আশা—
এ কি আরাধনা?
এই কাম, এই ক্রোধ দিতেছে কি আত্মবোধ?
লোভে ক্ষোভে হ'তেছে কি তোমার ধারণা?

জগৎ-ভিতর দিয়া জগতের জীব
বুঝে কি তোমায়?
এই পড়ে, এই উঠে, এই হাহাকারে ছুটে,
পাপে অনুতাপে লভে দেব-মহিমায়?

প্রবীণ জনক যথা শিশু-ক্রীড়া হেরি'
হাসিয়া আকুল,—
অমনি কি দেহ-শেষে আমিও উঠিব হেসে,
স্মরি' নর-জনমের সুখ-দুঃখ-ভুল?

জগতের পাপতাপ জগতেই শেষ?
কহ দয়াময়!
উঠিয়া পর্ব্বতচূড়ে ধরণীরে হেরি' দূরে—
পথের ত দুঃখ-ক্লেশ ভ্রম মনে হয়!

শারদীয় বোধন

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

[ময়মনসিংহ জেলায় সন্তোষের বিখ্যাত জমিদারবংশে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর জন্ম হয়। ইঁহার 'পদ্মা,' 'গৌরাঙ্গ,' 'গৈরিক,' 'গীতিকা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত। ইঁহার রচিত কয়েকখানি নাটক এবং অনেকগুলি গানও বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। ১৯৪৯ সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।]

বর্ষারে বিদায় দিয়ে শূন্যচিত্ত উদাস আকাশ
ধরি' অভিনব মূর্ত্তি, নবনীল পরি' বেশবাস
আহ্বানিল কারে!
দিগ্বধূরা মুছি' আঁখি, নীলাম্বরে তনু ঢাকি'
নমিল তাহারে।
উদিলা শরৎ-লক্ষ্মী আরক্তিম প্রফুল্ল প্রত্যূষে
বিশ্বের দুয়ারে।

কূলগ্রাসী নদীধারা থেমে গেল পাদপদ্ম চুমি';
ফুলে ফুলে বিরচিয়া পাতি' দিল তাঁরে বনভূমি
হৃদয়-আসন;

পাখীরা আবেগভরে ছুটিল ঘোষণা ক'রে
শুভ আগমন ;
হরিৎ-শস্যের ক্ষেত্র জানাইল নত করি' শির
নীরব বোধন।

মহেন্দ্রের মায়াধনু ঝলসিল অম্বরা-প্রাঙ্গণে
লাঞ্ছিত সুধাংশু পুনঃ শোভিলেন রাজসিংহাসনে
কিরীট-কুণ্ডলে ;
জাগি' লক্ষ তারামালা পরাইল মণিমালা
প্রকৃতি-কুন্তলে ;
মধুর উৎসব এল শুভ শঙ্খ বাজায়ে মধুরে
গম্ভীর ভূতলে।

জীবন-ভিক্ষা

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

[কবি করুণানিধান ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথম জীবনে সরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন—পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের ছাত্রাবাস-পরিদর্শকের কার্য্য গ্রহণ করেন। 'ঝরাফুল,' 'শান্তিজল,' 'ধানদূর্ব্বা,' 'প্রসাদী,' 'রবীন্দ্র আরতি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ইঁহার রচিত। মিত্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইঁহার সমগ্র কবিতাসংগ্রহ-পুস্তক 'শতনরী' বি.এ. অনার্স পরীক্ষার পাঠ্য। জীবিত রবীন্দ্র-শিষ্যগণের মধ্যে ইনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃপ্রবীণ।]

(বুদ্ধদেবের প্রতি কিসা গোতমী)

দেউলে দেউলে কাঁদিয়া ফিরি গো দুলালে আগলি' বক্ষে,
উষ্ণ বিয়োগ-উৎস-সরিৎ দর-বিগলিত চক্ষে,
শত চুম্বনে মেলে না নয়ন, চুরি গেছে মোর আঁচলের ধন ;
অভাগী বিহগী আজিকে আহত মরণ-শ্যেনের পক্ষে।

"স্তন-ক্ষীরধার অধরে বাছার আজি কি লেগেছে তিক্ত ?
রসনা-প্রসূন কোন্ পরসাদ-মধুরসে পরিষিক্ত ?
মুখ-চম্পকে মরুর বর্ণ, শুক অধর-কমল-পর্ণ,—
কি পাপে আমার প্রাণের ইন্দু পীযূষ-বিন্দু-রিক্ত ?

কোথা সে মাধুরী আধ আধ বোলে ? কুন্দ বৃন্ত-ছিন্ন,
দন্ত-রুচিতে কই সে কান্তি পুণ্য-হাসির চিহ্ন ?
জানি প্রভু, তব পাণির পরশে ননীর পুতলি জাগিবে হরষে।
কোন্ পাষাণের বিষবাণে তার নয়নের মণি ভিন্ন ?

অবনীর এই পদ্ম-বেদীতে, হরিলে ত্রিতাপ-দুঃখ,
যাত্রা করেছ, দুরগম পথ ক্ষুরধার-সম সূক্ষ্ম।
দিয়ে তপোবন, মহানির্ব্বাণ, কুমারে আমার কর প্রাণদান।"
লুটায় যুবতী বুদ্ধ-চরণে আলুথালু কেশ রুক্ষ।

কহেন বুদ্ধ, "তনয় তোমার নীরব সমাধি-মগ্ন,
বরণ করেছে চির-সুন্দর মরণের মহালগ্ন।
থাকে যদি কোথা অশোকনিলয়, ভিখ্ মাগি আন সর্ষপ-চয়,
পরশে তাহার দুলিয়া উঠিবে পরাণ-মৃণাল ভগ্ন।"

বিশাল পুরীর দ্বারে দ্বারে ঘুরে, কেহ নাহি দেয় ভিক্ষা ;
নিবেদিল শেষে গুরুপদে এসে,—"শিখাইলে শেষ শিক্ষা,
জীয়াতে চাহি না তনয়ে আমার, ভবনে ভবনে ওঠে হাহাকার—
হর' জগতের বিরহ-আঁধার, দাও গো অমৃত-দীক্ষা।"

জন্মভূমি

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

[যতীন্দ্রমোহন নদীয়া জেলার যমসেরপুর গ্রামের জমিদারবংশে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কবিতারচনায় ইনি অনন্যসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। যৌবনে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' এবং 'যমুনা' পত্রিকার এবং শেষজীবনে তিনি 'পূর্ব্বাচল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ—'রেখা,' 'লেখা,' 'নাগকেশর,' 'পাঞ্চজন্য,' 'জাগরণী,' 'অপরাজিতা,' 'নীহারিকা,' 'মহাভারতী,' 'বন্ধুর দান' ও 'কাব্যমালঞ্চ'। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।]

ঐ যে গাঁটি যাচ্চে দেখা 'আইড়ি' ক্ষেতের আড়ে,
প্রান্তটি যার আঁধার-করা সবুজ কেয়া-ঝাড়ে,
পুবের দিকে আম-কাঁটালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জট্‌লা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা—
ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি!

বাঁশ-বাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজ্‌নে গাছের শাখা,
গোরুর গাড়ীর চাকার পথে শুকায়নাক কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে ঘুঁটেছাইয়ের গাদা।
তবু আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
বিশ্বশোভা ঐখানেতে গেছে চুরি!

যত দেশের যত পাখী ঐ গাঁয়ে কি আছে!
ঝোপে-ঝাড়ে বেড়ায় উড়ে' বাসার কাছে কাছে;

পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে,
চল্‌তে গেলেই শুক্‌নো পাতা গুঁড়োয় পায়ে-পায়ে ;—
বনে-ভরা এমনি আমার স্বর্গপুরী,
তবু আমার চিত্ত সেথায় গেছে চুরি।

পদ্মদীঘি কোথায় পাব—পদ্ম নাইক মোটে,
চৈৎ-বোশেখে শুকিয়ে উঠে, জলটুকু না জোটে।
পানায়-ঢাকা ডোবায় ভরা, সিদ্ধিগাছে ছাওয়া,
ভাঁট-পিঠিলির জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে বেড়ায় হাওয়া——
এমনি আমার মর্ত্ত্যভুমের স্বর্গপুরী,
স্বর্গশোভা তবু সেথায় গেছে চুরি।

পাঠশালাটিও নাইক গাঁয়ে—নাইক সে ডাকঘর,
কোথায় বদ্দি? যদিও কম্‌তি নয়ক বড় জর।
রাজার প্রাসাদ নাইক সেথা, ধনীর দেবালয়,
লজ্জাহীনের লজ্জা নাইক, দারিদ্র্যে নাই ভয় ;—
সৃষ্টিছাড়া এমনি আমার স্বর্গপুরী,
সকল অভাব তবু সেথায় গেছে চুরি।

তবু ওঠে কুমোর-পাড়ায় কদমতলার ধারে,
সঙ্কীর্ত্তনের মিলন-গীতি সান্ধ্য অন্ধকারে,
সবাই যেন স্বাধীন সুখী, বাধা-বাঁধন-হারা—
আবাদ করে বিবাদ করে সুবাদ করে তারা,
এম্‌নি আমার সাদাসিধে স্বর্গপুরী,
তাইত আমার মনটী সেথায় গেছে চুরি।

শোভা বল, স্বাস্থ্য বল—আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে উঠে এলে গায়ের কাছে।

ঐখানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ—
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, প্রিয়ার হাসিমুখ,
এইত আমার জন্মভূমি স্বর্গপুরী,
যেথায় আমার হৃদয়খানি গেছে চুরি।

সন্ন্যাসী

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো উদাসীন, মিনতি তোমার কাছে,—
বলো একবার, জীবনে তোমার—কি ধন চাওয়ার আছে।
গিরিগুহাতলে আসন পেতেছ বন অরণ্যমাঝে,
নরের দৃষ্টি—সমাজের আঁখি—সহিবারে পারো না যে।
বিষয়বাসনা বিষেরই মতন ত্যজিয়া গিয়াছ চলি'
ধূলিসম এই ধরণীর মায়া হেলায় দু'পায়ে দলি';
বনের পশুরে সঙ্গী করেছ, সাথী বনতরুলতা,
মুখের বাণীরে বন্ধ করেছ বন্দিয়া নীরবতা!
ঘন জটাজালে ঢাকি' চারু কেশ, ললাটে ভস্ম মাখি'
প্রকৃতির পানে রুধেছ সবলে প্রকৃতিরই দেওয়া আঁখি;
—সব ডাকাডাকি ছাড়িয়া গোপনে কারে ডাকি' দিবারাতি
কাটাইছ কাল—কিসের আশায়, পাষাণে আসন পাতি'?

কে তোমারে প্রভু জন্ম দিয়াছে, ছিল না কি মাতাপিতা?
সুখ-শৈশব কা'দের অঙ্কে কাটিয়াছে জান কি তা'?
ও কঠিন দেহ পুষ্টি লভিল কাদের অন্ন-জলে,
কার কাছে তব দেবতার নাম শিখেছ কৌতূহলে?

অসহায় দেহ, অশরণ মন—কোন্ সমাজের স্নেহে
বাড়িয়া উঠেছে কোন্ পল্লীর কোন্ সকরুণ গেহে?
ধরণীর স্নেহে তরণী করিয়া সরণি হয়েছ পার,
—কিসের নৌকা, কে-বা তার মাঝি? ধারো না কাহারো ধার।
বুড়া বিধাতার ভুল হয়েছিল—মানবের গৃহবাসে
মানুষ করিয়া পাঠা'লো তোমায়, না বুঝে এ পরিহাসে।
কে জানিত আগে, মুক্তির লোভে শুধিবারে দেবঋণ,
পিতৃঋণেরে এত বড় ফাঁকি দিতে পারে কোনো দীন?
মায়ের ভায়ের স্নেহ—সে তো মায়া, মিছে সমাজের দাবী—
দেশ—সে তো মাটি—অন্নে তাহার কোথা মুক্তির চাবি।
তোমার মোক্ষ তোমারি সে শুধু—স্বীয় সাধনার ধন,—
দশজনে টেনে রাখিবে তোমারে মায়ায় ভুলায়ে মন?
এত বড় 'ছোট' নহ তুমি দেব,—ধরণীর মোহে ভুলি'
তোমার স্বর্গ পরের কথায় শিকায় রাখিবে তুলি'।

ধিক্ সন্ন্যাসী, ধিক্ উদাসীন, ধিক্ হে মুক্তিকামী,
শ্রীপদে তোমার শতবার ধিক্—হে মোক্ষপথগামী।
মানুষের ঘরে মানুষ হ'বার যোগ্যতা নাহি যা'র,
স্বর্গের লোভ সাজে কি তাহার—দেবতার অধিকার।
পিতা কাঁদে ভুঁয়ে, মাতা পথে শুয়ে মুমূর্ষু গৃহহীন,
ক্ষুধা-অপরাধে ভাইবোন কাঁদে—নিজবাসে পরাধীন।
তুমি খুঁজিতেছ আপনার পথ, ভাবিয়া তাদের মায়া,
যাদের মায়ায় মানুষ হয়েছ, যাদেরি রক্তে কায়া।
হায় কাপুরুষ, হায় পলাতক, হায় ভীরু, হা রে দীন।
স্বার্থ-আশায় মনুষ্যত্বে এত বড় উদাসীন—
সহিতে পারেন শুধু তিনি—যাঁর আকণ্ঠ ভরা বিষে,
মানুষের 'পরে হেন পরিহাস মানুষ সহিবে কিসে?

সন্ন্যাসী শিব—বিশ্বের শিবে আছেন চক্ষু বুঁজি'—
গৃহিণীরে দিয়ে অন্নের ভার—অর্থ তাহার বুঝি ;
পূর্ব্বপুরুষে উদ্ধার লাগি' সন্ন্যাসী ভগীরথ,
সগরবংশে স্বর্গে বহিল তাহার পুণ্যরথ ;
বুদ্ধ নিমাই—মানুষেরই ভাই, জীবের মুক্তি লাগি'
দুঃখ-দূরের পন্থা খুঁজেছে গৃহহীন বৈরাগী ;
জানি শঙ্কর-ব্রহ্মচর্য্য, বুঝি তাঁর মায়াবাদ—
রামকৃষ্ণের সেবাধর্ম্মের জগৎ চিনেছে স্বাদ ;
—তব ভাণ্ডারে কোন্ সে বিত্ত সঞ্চিত কার তরে ?
স্বার্থ-সাধনা-ছদ্মের বেশে ভুলাইবে কোন্ নরে !
যাহারে ডাকিয়া ভস্ম মাখিয়া কাটাইছ নিশিদিন—
জেনো—ধরা তাঁর স্নেহেরই আগার—তিনি ন'ন উদাসীন।

আমরা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[সত্যেন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত সাহিত্যগুরু অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। ইনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে ইনি আমরণ বাস করিতেন। রবীন্দ্রশিষ্যগণের মধ্যে ইনি অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রযুগে ইনি সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, গুরুর প্রভাবে অভিভূত হন নাই। বঙ্গসাহিত্যে ইনি বিবিধ অভিনব ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। 'বেণু ও বীণা,' 'তীর্থসলিল,' 'কুহু ও কেকা,' 'অভ্র-আবীর,' 'হসন্তিকা,' 'ফুলের ফসল,' 'তুলির লিখন,' 'বেলাশেষের গান,' 'বিদায় আরতি' ইত্যাদি ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ইনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। সাহিত্যসেবা ছাড়া ইঁহার অন্য কোন ব্রত বা বৃত্তি ছিল না।]

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;—

বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ ক'রেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদিবিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙ্লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।
বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙ্লার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি,
শ্যাম-কাম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান্,—যাদের নাম অবিনশ্বর।

আমাদেরি কোন সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরি নি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি;
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া;
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালী দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙালীর কবি গাহিল জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।
অতীতে যাহার হ'য়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।

প্রতিভার তপে সে ঘটনা হবে, লাগিবে না তার বেশী,
লাগিবে না তাহে কভু বাহুবল জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষি ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

রাজপূজা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রাজার নিদেশে শিল্পী রচিছে দেউল কাঞ্চীপুরে,
পরশে তাহার শিলা পায় প্রাণ কাঞ্চন-প্রায় স্ফুরে।
মঞ্চের পরে বসি' তন্ময় মূর্ত্তি-মেখলা গড়ে,
তার প্রতিভায় পৃথিবীর গায় স্বর্গের ছায়া পড়ে।
ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ঈশান রূপ ধরে ধ্যানে তার—
প্রাণের নিভৃত ভরি' তারি যত দেবতার অবতার।
পুষ্পিয়া ওঠে কঠিন পাষাণ পরশ তাহার লভি'
শিল্পীর রাজা গুণী গুণরাজ স্ফটিক-শিলার কবি।
অমৃতকুণ্ডে ডুবায়ে সে বুঝি ছেদনী-হাতুড়ি ধরে,
অরূপেরে রূপ দেয় অনায়াসে অলখ-দেবের বরে।
তার নির্ম্মাণ সৃজন-সমান, বিস্ময় লাগে ভারি,
চমৎকারের মহলের চাবি জিম্মায় আছে তারি।
শিলার স্বর্গে বসি' মশ্‌গুল্ যশের মালা সে গাঁথে,
শিষ্য একাকী পিছনে দাঁড়ায়ে পান-বাটা লয়ে হাতে।
আর কারো নাই প্রবেশাধিকার, তার সে কর্ম্মশালে,
স্তম্ভারণ্যে তপোবন রচি' প্রাণের আরতি ঢালে।

ছেনী দিয়ে কাটে, সারাবেলা খাটে, স্বপ্নাবিষ্ট জাগি',
মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া পিছে তাম্বূল লয় মাগি'।
ফিরে তাকাবার অবসর নাই ; দীর্ঘ দিবস ধরি'
আদ্‌রার গায়ে আদর মাখায়ে রচে স্বর্গের পরী।
সহসা কি করি' হাতের হাতুড়ি ঠিকরি' পড়িল নীচে,
দোস্‌রা হাতুড়ি নিতে তাড়াতাড়ি শিল্পী চাহিল পিছে।
পিছে চেয়ে গুণী ওঠে চমকিয়া বিস্ময়ে আঁখি থির—
তারি ডিবা হাতে কাঞ্চী-নরেশ দাঁড়ায়ে মুকুট-শির।
"একি। মহারাজ।" কয় গুণরাজ, "অপরাধ হয় মোর,
দিন্ মোরে দিন্—প্রভুর কি সাজে ?" রাজা কয় "দিনভোর
এমনি দাঁড়ায়ে আছি ডিবা হাতে, যোগায়েছি তাম্বূল,
দেখিতে তোমার স্বজন-কর্ম্ম, পাথরে ফোটানো ফুল,
তন্ময় তুমি পাও নাই টের, কখন এসেছি আমি,
মোর ইঙ্গিতে কখন যে তব শিষ্য গিয়েছে নামি',
কাজের ব্যাঘাত পাছে ঘটে ভেবে ডিবাটি লইয়া চাহি'
শিষ্যকৃত্য করেছি গুণীর হ'য়ে করঙ্ক-বাহী।"
রাজার বচন শুনি' লজ্জায় গুণী কহে জানু পাতি'
"মার্জনা কর দাসেরে, হে প্রভু, কাজের নেশায় মাতি'
অজানিতে আজ ঘটায়েছে দাস রাজার অমর্য্যাদা,
সাজা দিন্ মোরে।" রাজা কন্, "গুণী, তব গুণে আমি বাঁধা,
ওঠ গুণরাজ। আমি পাই লাজ, তোমারে কি দিব সাজা,
বিধির স্বজন-বিভূতি-ভূষিত তুমি যে প্রকৃত রাজা।
মরণহরণ কীর্ত্তি তোমার, মোর সে ক্ষণস্থায়ী,
আমি প্রভু শুধু নিজের রাজ্যে, বাহিরে প্রভুতা নাহি।
রাজপূজা তব ভুবন জুড়িয়া, প্রভাব দুর্নিবার,
রাজাধিরাজেরও ভক্তি-অর্ঘ্যে, গুণী, তব অধিকার।"

অকারণ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শূন্য যখন গাঙিনীর তীর, পথে কেহ নাহি চলে,—
পড়েনাক দাঁড় খেয়া তরণীর তিমির-মগন জলে,—
নীলাম্বরীর অঞ্চল দিয়া   সন্ধ্যা সে দেয় দৃষ্টি রুধিয়া,
গন্ধতৃণের বিভোল গন্ধ বাতাসের কোলে ঢলে ;—
করুণে মুরলী বাজে পরপারে,   দীপ জ্বলে নিবে কিনারে কিনারে,
সুখনীড়ে পাখী ঘুম-ভরা আঁখি স্বপনে কি যেন বলে ;—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া নয়নে অশ্রু গলে।

যবে ঝরঝরে বারিধারা ঝরে আর সব রহে চুপ—
তরুপল্লবে সঞ্চিত জল জলে পড়ে—টুপ্ টুপ্,—
যবে ঘুমন্ত কেতকীর শাখে   জড়ায়ে নিভৃতে সুনিবিড় পাকে
গন্ধ-মগন কাল ভুজঙ্গ শ্বসিয়া শ্বসিয়া উঠে ;—
দাদুরীর ডাকে ভরি' উঠে বন,   দাপটিয়া ফিরে দস্যু পবন,
নব কদম্ব যূথীর গন্ধ আকাশে বাতাসে লুটে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছসিয়া নয়নে অশ্রু ফুটে।

প্রথম শরতে অম্বরে যবে মেঘ-ডম্বরু বাজে,—
যবে খরশাণ বিধাতার বাণ ঝলসে গগন মাঝে,—
কমল-কলিকা শঙ্কিত মনে   রহে নতমুখে মুদিত নয়নে,
তরুণ অরুণ কিরণ স্মরিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে,—
ব্যাকুল পরাণ খুঁজে আশ্রয়,—   খুঁজে সে শরণ চাহে সে অভয়,—
এ তিন ভুবনে আপনার জনে খুঁজি' মরে সকাতরে,—
উছসি' উঠিয়া বিরহী এ হিয়া, নয়ন-সলিলে ভরে।

পউষের রাতে কঙ্কালসম বিথারি' রিক্ত শাখা,
কাঁদে যবে তরু ভিজিয়া শিশিরে ভগ্নকুহেলি মাখা,—
কুক্কুর তুলে বুক্কন ধ্বনি, ঘূৎকার করে উলূক অমনি,
উত্তর বায়ু শীতের প্রতাপ প্রচারে ভুবনতলে,—
দীর্ঘ যামিনী পোহায় জাগিয়া— তপ্ত হিয়ার পরশ মাগিয়া,
পরাণ ক্ষুণ্ণ নয়ন শূন্য নিবিড় তিমিরতলে,—
তখনি এ হিয়া উঠে উছলিয়া, নয়নে মুকুতা ফলে।

এ কি বিধুরতা হায় রে বিরহী! কালে কালে নিতি নিতি!
এ কি রে দহন রহি' রহি' রহি' একি অপরূপ গীতি।
এ কি মিছামিছি দুঃখের খেলা, এ কি মিছামিছি আঁখিজল-ফেলা!
কোন্ বেদনার চির হাহাকার চিরদিন জাগে প্রাণে।
কোন্ খানে সুরু, কোথা উন্মেষ, কোন্ যুগে হায় হ'বে এর শেষ,
কোন্ রাগিণীর ব্যথা-ভরা রেশ ধ্বনিছে সকল গানে।
অকারণে হায় অশ্রু গড়ায় কোন্ সাগরের টানে।

অমর বিদায়

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

[কুমুদরঞ্জন বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে বিখ্যাত বৈদ্যবংশে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন এবং বহুদিন ধরিয়া মাথরুন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্ত্তমান যুগের প্রবীণ কবিদের মধ্যে ইঁহার প্রতিষ্ঠা বঙ্গবিশ্রুত। 'উজানী,' 'বীথি,' 'একতারা,' 'বনমল্লিকা,' 'অজয়,' 'নূপুর' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ইঁহার রচিত। ইঁহার রচনার প্রধান উপজীব্য বঙ্গের পল্লীজীবন।]

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়।
পোহাইলে সুখরাতি যে হবে অযোধ্যাপতি,
যোগীর বল্কলবাসে তারে কে সাজায়?

অভিষেকে নির্ব্বাসন বোধনেতে বিসর্জন,
পূর্ণিমায় অমানিশি দেখে কে কোথায়?
শ্রীরাম যায় গো বনে সীতা লক্ষ্মণের সনে,
জগৎ সজল-আঁখি থমকি' দাঁড়ায়,
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়!
ক্রূর অক্রূরের সাথে হরি গেল মথুরাতে,
শ্যামসোহাগিনী রাধা ধূলায় লুটায়।
গাহেনাক শুকসারী, অধীর যমুনা-বারি,
শ্যামলী ধবলী আজি তৃণ নাহি খায়,
কাঁদে গোপবালাগণে চাহি তমালের বনে,
ভাসানো কলসী কোথা ফিরিয়া না চায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়!
বুদ্ধদেব গৃহ ত্যজি' লভিতে চলেন আজি,
জন্মমৃত্যু-বার্দ্ধক্যের প্রশম-উপায়,
মায়ার বাঁধন টুটি' বিশ্বপানে যান ছুটি'
'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বুঝাতে সবায়।
কাঁদে রাজা শুদ্ধোদন, কাঁদে গোপা অনুক্ষণ,
কাঁদিয়া কপিলবস্তু ধূলায় লুটায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়।
আঁধিয়ারি' নদীয়ারে কাঁদাইয়া শচী-মারে,
নিমাই সন্ন্যাস ল'ন আজি কাটোয়ায়।
কেঁদে মরে ক্ষৌরকার হাত নাহি উঠে তার
কেমনে সাজাবে দণ্ডী নবীন যুবায়।
ভকতের আঁখিজলে কঠিন পাষাণ গলে
ডুবুডুবু শান্তিপুর নদে' ভেসে যায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়!
'কোরেশে'র অত্যাচারে ওই চলি' যা'ন দূরে
ইরম্মদ মহম্মদ ত্রিদিব-প্রভায়,
ওরে সে যে সর্ব্বত্যাগী ডরে না প্রাণের লাগি',
পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্ম জানাবে সবায়।
দিতে এসেছিল ধরা, তখন বুঝেনি ধরা,
এখন কাঁদিছে বসি' পূত মদিনায়।
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়।

অমর বিদায় ও যে অমর বিদায়।
ওই ক্রুশে আরোপিয়া মারিছে যন্ত্রণা দিয়া
চিরক্ষমাশীল যীশু নরদেবতায়।
কণ্টক-মুকুট শিরে দিয়া কি করিবি ওরে,
ত্রিদিব-কিরীট যাঁর শিরে শোভা পায়?

যীশু হায় ক্রুশে থেকে জগৎপিতারে ডেকে
বলেন, "ক্ষমিও পিতা অবোধ সবায়।"
যুগ যুগ ধরি' কবি আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল ললিত গাথায়॥

ছোটর দাবি

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছোট যে হায় অনেক সময় বড়র দাবী দাবিয়ে চলে,
রেখা টেনে ছোটর গতি বড় যে জল গাবিয়ে চলে।
অতি বড়র তুচ্ছ যা তাই ভালবাসি আমরা সবাই,
ভুলায় বড়র অট্টহাসি ছোটর কণা নয়নজলে।

তরুবরে হয় না স্মরণ, কুসুমটি তার ভুলতে নারি,
ভুলতে পারি হোলির দিবস, ফাগের দাগ যে তুলতে নারি।
ভুলি সাগর,—তার মুকুতায় গেঁথে রাখি গলার মালায়,
ছোটর অনুরাগের রাখা আয়াস ক'রেও খুলতে নারি।

রামায়ণের অনেক ভুলি রাবণ রাজার চিতার সাথে,
ভুলতে নারি রামের মিলন গুহকগৃহে মিতার সাথে।
ভুলি কোশল-পৌরভবন ভুলতে নারি অশোক-কানন,
সরমার সে সখীত্বটি বন্দিনী মা সীতার সাথে।

ভুলি দ্বারাবতীর ঘটা কংসবধের গৌরবও।
ভুলায় কুরুক্ষেত্র গোটা বিদুরক্ষুদের সৌরভ ও।
বাঁশরী আর শিখীর পাখা সুদর্শনকে দেয় যে ঢাকা
সুদামার প্রেম-সখ্যে যে ম্লান পাণ্ডব এবং কৌরবও॥

ভুল্‌তে পারি সারনাথ আর নালন্দা-মঠ-ধ্বংসটিকে,
মনে পড়ে বুদ্ধদেবের বুকে কাতর হংসটিকে।
হাজার হাজার মূর্ত্তি তাঁহার, উহার কাছে মান্‌ছে যে হার,
পূর্ণতা দেয় বিরাট্‌ ক'রে ক্ষুদ্র তাহার অংশটিকে।

মহামায়ায় যতই মানাক সিংহ এবং সিংহাসনে,
রামপ্রসাদের বেড়ার ধারে দেখেই যে হয় হিংসা মনে।
বাদ্যঘটা, লক্ষ বলি, অলক্ষ্যে সব যায় যে চলি',
বক্ষে জাগে দৃষ্টি মায়ের মিষ্ট হাসি চন্দ্রাননে।

আদর করি শিখীর চেয়ে চূড়ার শোভা শিখীর পাখা,
বিশাল রসাল বনের চেয়ে ঘটের ছোট আমের শাখা।
খনি রেখে মণিই তুলি, মধু পেয়ে ভ্রমর ভুলি।
মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরীশ পড়্‌ল ঢাকা।

ভিখিরী

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

[১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার চট্টোপাধ্যায়-বংশে কবি কিরণধন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজী সাহিত্যে ও দর্শনে এম.এ. উপাধি লাভ করেন এবং তৎপরে দীর্ঘদিন অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। আধুনিক বাংলার ইনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি ছিলেন। 'নূতন খাতা' নামক একটিমাত্র কবিতাপুস্তক লিখিয়াই ইনি কবিখ্যাতি লাভ করেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।]

একাকী সহায়-সঙ্গতি-হীন, দ্বারে দ্বারে দ্বারে ফিরি প্রতিদিন,
মাগিয়া ভিক্ষা ছিন্ন মলিন বসনে;
কেহ দেয় কিছু করুণা করিয়া কেহ যায় দূরে ঘৃণায় সরিয়া,
অপমানে যাই মরমে মরিয়া, নয়নে—

উথলিয়া ওঠে অশ্রুর ধার, প্রাণে ব্যথা বাজে লাগে ধিক্কার,
কেন গো মরণ—ভিখিরী যে তা'র হয় না ?
হয় না মরণ, কী কঠিন জান। এত লাঞ্ছনা, এত অপমান
স'য়ে বেঁচে আছি, আর ভগবান সয় না !

দেখে মোরে লোকে সন্দেহে চায়, থালা ঘটি বাটি ভয়ে সামলায়,
চ'লে গেলে তবু ফিরিয়া তাকায় পিছনে ;
ঘুরে ফিরে পাছে আসি যদি আমি, চুরি ক'রে নিই কোনো কিছু দামী,
ঘড়ি কি আংটি সোনার বোতামই বিজনে ;

উপবাসী থেকে শুধু খালি পেটে কত দিন-রাত যায় মোর কেটে,
ঝরঝর জল পড়ে আঁখি ফেটে, তবুও
হয় না মরণ, কী কঠিন জান। তুমিও কি ফেলে দিলে ভগবান ?
মুছিবে না জ্বালা—পাব না কি ত্রাণ কভুও ?

'হাত পা রয়েছে খেটেখুটে খাও, কেন দিক্ কর, মিথ্যে জ্বালাও !
হবে না এখানে পাই-পয়সাও'—বলিয়া
কত শত জন দেয় হাঁকাইয়া, কর্কশ স্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া,
আসি তাহাদের পানে তাকাইয়া চলিয়া !

হয়েছে অশোচ, ভিখ দিতে নাই— এইরূপ শুনি কত অছিলাই ;
ধনীর দুয়ারে যদি কভু যাই মাগিতে,
আধা বাংলায় আধা হিন্দিতে, দারোয়ান খাড়া থাকে গালি দিতে
লাঠি দেখাইয়া বলে ইঙ্গিতে ভাগিতে।

হয়েছি পথের কাঙাল এখন, চিরকাল কিছু ছিল না এমন,
ঘর-সংসার প্রিয়-পরিজন ছিল গো।
ছিল গো সকলি যমে নিল লুটে, জমি-জমা-জোত মহাজন জুটে
ক'রে ছারখার দিল ছিঁড়ে কুটে, দিল গো।

8—1731 B. T.

এই আমারেও বাবা বাবা ব'লে আসিত ছুটিয়া ঝাঁপ দিয়া কোলে
সোনার পুতলি ; উবে গেল গ'লে বাতাসে।
এই আমারও ছিল একজন, সঁপেছিল তা'র তনু-প্রাণ-মন,
হায় সে আমার কোথায় এখন ? কোথা সে!

ছিনু বাপ-মার আদরের ছেলে, কেটেছিল কাল শুধু হেসে খেলে,
প্রজাপতি সম খালি ডানা মেলে উড়েচি ;
ফুলে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায়, নেচেছি হাসির ঢেউএর মাথায়,
এবে নিয়তির চাকার তলায় পড়েচি!

ভাগ্যহীন ও লক্ষ্মীছাড়ার শুনিবে কাহিনী ? কী শুনিবে আর ?
জেনে রেখো এই দুনিয়ার সার—রূপিয়া।
ও চিজ্ তোমার থাকিলে প্রচুর, হবে না অভাব কভু বন্ধুর,
লইবে তোমারে হাসিয়া মধুর লুফিয়া।

নচেৎ তোমারে পায়ের তলায়, খেঁত্‌লাবে সবে দারুণ হেলায়,
এক ফোঁটা জল, ম'রে যাও ঠায়, পাবে না,
আর জেনো এই মানব-প্রণয় পুরোপুরি ঝুটো, খাঁটি অভিনয়।
কেউ তারে, যারে ভাগ্য নিদয়, চাবে না।

একেবারে আমি দাঁড়াইনি পথে, ক্রমশঃ ভেসেচি অবনতি-স্রোতে,
চেষ্টা করেচি যদি কোন মতে অকূলে
কূল পেতে পারি কারেও ধরিয়া, সবাই গিয়াছে ঘৃণায় সরিয়া,
ডেকেচি কঁাদিয়া কাতরে সাধিয়া—'নে তুলে।'

কতবার মনে ভাবিয়াছি তাই, ভিখিরীর ঠাঁই দুনিয়ায় নাই,
জঞ্জাল তা'রা আপদ্-বালাই সমাজে,
অতএব দাও তাদের পুলিশে, চর্ম্ম তাদের কালো মিশ্‌মিশে
যাবতীয় রোগ-বীজাণুর বিষে ভরা যে!

কত বার মনে ভাবিয়াছি, চুরি   করি কারো টাকা বুকে মেরে ছুরি,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নেইক কিছুরি ভিত্তি ;
নেই ঈশ্বর, নেই পরকাল,   প্রহেলিকা এই সৃষ্টির জাল,
অন্ধ জড়াণু-রচিত বিশাল পৃথ্বী।

ক্ষমিও না প্রভু, ক্ষমিও না মোর   তোমা'-পরে এই সন্দেহ ঘোর,
চুরি-না-করিয়া-মনে-মনে-চোর পাপীকে,
দাও গো শাস্তি যত তুমি পারো,   মেরেছো তো প্রভু, আরো মারো মারো,
আমিই হারি কি তুমি প্রভু হারো দেখি কে!

হাট

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[কবি যতীন্দ্রনাথ নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী হরিপুরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন ইঞ্জিনীয়ার—বহুদিন নদীয়া জেলাবোর্ডে কর্ম্ম করার পর এখন কাশিম-বাজার রাজ এষ্টেটে ইঞ্জিনীয়ারের কার্য্য করেন। রবীন্দ্রশিষ্যগণের মধ্যে ইঁহার রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। মরীচিকা, মরুশিখা, মরুমায়া, সায়ম্, অনুপূর্ব্বা ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ইঁহার রচিত।]

দূরে দূরে গ্রাম দশ বারো খানি মাঝে একখানি হাট ;
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ, প্রভাতে পড়ে না ঝাট।
বেচা-কেনা সেরে বিকালবেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায় ছাড়িয়া পূবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে' উঠে দীপ—আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণী-হারা একা ক্লান্ত কাকের পাখে :
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস পার্শ্বে পাকুড়শাখে।
হাটের দোচালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রূপ-বাঁশী জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল চেনা অচেনার ভিড়ে ;
কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে'।
মাল-চেনাচেনি, দর-জানাজানি,
কাণাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে, কেউ গেল খালি ফিরে।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত চেনা-অচেনার ভিড়ে।

কত কে আসিল, কত বা আসিছে, কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি' পরখের ছল—
বিকালবেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল কত ক্রেতা-বিক্রেতা!

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরাণো হাটের মেলা
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা,
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা।

কাল-বৈশাখী

মোহিতলাল মজুমদার

[বাংলা ১২৯৫ সালে শ্রীযুত মোহিতলাল মজুমদারের জন্ম হয়। ইঁহার পিতৃনিবাস হুগলী জেলার জিরেট-বলাগড় গ্রামে। বি.এ. পাশ করার পর ইনি কলিকাতার বিবিধ স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন, পরে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক হ'ন। ইদানীং ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া একনিষ্ঠভাবে সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছেন। বর্ত্তমানযুগে ইনি শুধু শ্রেষ্ঠ একজন কবি নহেন, ইনি একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সমালোচক। ইনি 'স্বপনপসারী,' 'বিস্মরণী,' 'স্মরগরল,' 'হেমন্ত-গোধূলি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ এবং 'সাহিত্য-বিতান,' 'আধুনিক সাহিত্য,' 'কবি শ্রীমধুসূদন,' 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' ইত্যাদি সমালোচনা-পুস্তক রচনা করিয়াছেন।]

মধ্যদিনের রক্ত নয়ন অন্ধ করিল কে।
ধরণীর 'পরে বিরাট ছায়ার ছত্র ধরিল কে।
কানন-আনন পাণ্ডুর করি'—
জল-স্থলের নিশ্বাস হরি'
আলয়ে-কুলায়ে তন্দ্রা ভুলায়ে গগন ভরিল কে।

আজিকে যতেক বনস্পতির ভাগ্য দেখি যে মন্দ,
নিমেষ গণিছে তাই কি তাহারা সারি সারি নিস্পন্দ ?
মরুৎ-পাথারে বারুদের ঘ্রাণ
এখনি ব্যাকুলি' তুলিয়াছে প্রাণ ?
পশিয়াছে কানে দূর গগনের বজ্র-ঘোষণ ছন্দ ?

হেরি যে হোথায় আকাশ-কটাহে ধূম্র মেঘের ঘটা,
সে যেন কাহার বিরাট মুণ্ডে ভীম-কুণ্ডল জটা।
অথবা ও কিরে সচল অচল—
ভেদিয়া কোন্ সে অসীম অতল
ধাইছে উধাও গ্রাসিতে মিহিরে, ছিঁড়িয়া রশ্মি-ছটা।

ওই শোন তার ঘোর নির্ঘোষ, দুলিয়া উঠিল জটাভার।
সুরু হ'য়ে গেছে গুরু-গুরু রব—নাগা-গর্জন ঝঙ্কার।
পিঙ্গল হ'ল গল-তলদেশ,
ধূলি-ধূসরিত উন্মাদবেশ—
দিবসের ভাগে টানিয়া খুলিছে বেণীবন্ধন সন্ধ্যার।

অঙ্কুশ কার ঝলসিয়া উঠে দিক্ হ'তে দিক্-অন্তে!
দিগ্‌বারণেরা বেদনা-অধীর বিদারিছে নভ দন্তে।
বাজে ঘন ঘন রণ-দুন্দুভি,
ঝড়ে সে আওয়াজ কভু যায় ডুবি',
যুঝিতেছে কোন্ দুই মহাবল দ্যুলোকের দূর পন্থে।

বঙ্কিম-নীল অসির ফলকে দেহ হ'ল কার ভিন্ন?
অনাবৃষ্টির অসুরের বাধা কে করিল নিশ্চিহ্ন?
নেমে আসে যেন বাঁধ-ভাঙ্গা জল,
ম্লান হ'য়ে আসে মেঘকজ্জল,
আলোকের মুখে কালো যবনিকা এতখনে হ'ল ছিন্ন।

হের, ফিরে চলে সে রণবাহিনী বাজায়ে বিজয়-শঙ্খ,
আকাশের নীল নির্ম্মল হ'ল,—ধৌত ধরার পঙ্ক।
বায়ু বহে পুন মৃদু উচ্ছ্বাসে
নদী উথলিছে কুলুকুলু ভাষে,
আলো-ঝলমল বিটপীর দল নিশ্বাসে নিঃশঙ্ক।

* * * *

নববর্ষের পুণ্য-বাসরে কাল-বৈশাখী আসে।
হোক্ সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—
দুয়ার জানালা উঠে ঝনঝনি',—
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে।

চৈত্রের চিতা-ভস্ম উড়ায়ে জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বীর,
তৃণ-অঙ্কুরে সঞ্চারি' রস, মধু ভরি' বুকে মৃত্তির,
সে আসিছে আজ কাল-বৈশাখে—
শুনি' টঙ্কার তাহার পিনাকে
চমকিয়া উঠি—তবু জয় জয় তার সেই শুভ কীর্ত্তির।

এত যে ভীষণ, তবু তারে হেরি' ধরার ধরে না হর্ষ,
ওরি মাঝে আছে কাল-পুরুষের সুগভীর পরামর্শ।
নীল অঞ্জন-গিরিনিভ কায়া,
নিশীথ-নীরব ঘন-ঘোর ছায়া—
ওরি মাঝে আছে নববিধানের আশ্বাস দুর্দ্ধর্ষ।

ছাত্রধারা

কালিদাস রায়

[কবিশেখর কালিদাস রায় বর্দ্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যবংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করেন। আজিও ইনি শিক্ষকতা করিতেছেন। ইনি কেবল একজন বিখ্যাত কবি নহেন, ইনি একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক ও প্রবন্ধকার। 'ব্রজবেণু,' 'ব্রজবাঁশরী,' 'বল্লরী,' 'পর্ণপুট,' 'ঋতুমঙ্গল,' 'হৈমন্তী,' 'রসকদম্ব,' 'আহরণী,' 'বৈকালী' ইত্যাদি ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ,' 'বঙ্গসাহিত্যপরিচয়' ও 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' ইঁহার রচিত সমালোচনাগ্রন্থ।]

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ-তলে
চ'লে যায় তা'রা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।

ভালবাসি, কাছে ডাকি, নামও সব জেনে রাখি,
দেখাশোনা হয় নিতি নিতি,
শাসন-তর্জন করি', শিখাই প্রহর ধরি',
থাকেনাক, হায়, কোন স্মৃতি।

ক'দিনের এই দেখা? সাগর-সৈকতে রেখা
নূতন তরঙ্গে মুছে যায়।
ছোট ছোট দাগ পা'র মুচে' হয় একাকার,
নব নব পদ-তাড়নায়।

জানে না কে কোথা যাবে, জোটে হেথা, নাহি ভাবে,
পাঠশালা,—যেন পান্থশালা,
দু'দিন একত্রে মাতে মেলে মেশে, ব'সে গাথে
নীতি-হার, আর কথা-মালা।

রাজপথে দেখা হ'লে কেহ যদি গুরু ব'লে
হাত তুলে করে নমস্কার,
বলি তবে হাসি-মুখে,— "বেঁচে বর্ত্তে থাক সুখে,"
স্পর্শ করি' কেশগুলি তার।

ভাবিতে ভাবিতে যাই— কি নাম? মনে ত নাই,
ছাত্র ছিল কতদিন আগে;
স্মৃতিসূত্র ধরি' টানি, কৈশোরের মুখখানি
দেখি মনে জাগে কি না জাগে।

ঘন ঘন আনাগোনা কতদিন দেখা-শোনা,
তবু কেন মনে নাহি থাকে?
'ব্যক্তি' ডুবে যায় 'দলে', মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে?

এ জীবনে ভেঙে গ'ড়ে শ্যামল সরস ক'রে
ছাত্রধারা ব'য়ে চ'লে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হ'য়ে যায় তুচ্ছ কথা,
উত্তালতা সকলি মিলায়।

স্বচ্ছতায় শুধু হেরি আমার জীবন ঘেরি'
ভাসে শুধু ম্লান মুখগুলি ;
ভুলে যাই হট্টগোল অট্টহাসি কলরোল,
ম্লান মুখ কখনো না ভুলি।

কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান, কেহ রোগে ম্রিয়মাণ,
শ্রমে কা'রো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হ'য়ে রয় ঘরে,
নেত্র কা'রো তন্দ্রায় অরুণ।

কেহ বাতায়ন-পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে
যেন বদ্ধ পিঞ্জরের পাখী,
আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি মন তার যায় উড়ি',
মুখে কালো ছায়াখানি রাখি'।

স্মরিয়া খেলার মাঠ কেউ ভুলে যায় পাঠ,
বুদ্ধিতে বা কা'রো না কুলায়,
কেহ স্মরে গেহ-কোণ, স্নেহ-ময় ভাইবোন,—
ঘড়ি পানে ঘন ঘন চায়।

ডাকিছে উদার বায়ু ল'য়ে স্বাস্থ্য ল'য়ে আয়ু,
ডাক শোনে ব'সে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী মুখে মসী, মেঘে ঢাকা শিশু-শশী—
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভরে।

আর সবি গেছি ভুলি', ভুলিনি এ মুখগুলি
একবার মুদিলে নয়ন,
আঁখিপাতা ভারি-ভারি, ম্লান মুখ সারি সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

লালাবাবুর দীক্ষা

কালিদাস রায়

সিত মর্ম্মরে খচি' বিরাট দেউল রচি'
আর্ত্ত আতুর তরে খুলি' দানসত্র,
গড়িয়া অনাথশালা, সার করি' ঝোলামালা,
ভক্তগণের নামে লিখি' দানপত্র,
লালাবাবু বৈরাগী,— গুরু-করণের লাগি',
সারা পথ ভরি' ভেট-উপহারপুঞ্জে,
বাবাজী কৃষ্ণদাস যেখানে করেন বাস,
একদা এলেন সেই নিভৃত নিকুঞ্জে।

সাধুমুখে নামগান শুনিয়া জুড়াল প্রাণ
বাজিয়া উঠিল তাঁর হৃদ্‌বীণা-যন্ত্র,
সাধুর চরণে ধরি' ক'ন লালা, "কৃপা করি'
এ অধমে দি'ন তরী,—তরণের মন্ত্র।"
সাধু ক'ন স্নেহভরে "এবে ফিরে যাও ঘরে
এখনো আসেনি তব দীক্ষার লগ্ন,
নিজে যাবো, এলে দিন রবোনাক উদাসীন।"
এত কহি' আঁখি মুদি' পুন জপে মগ্ন।

লালাবাবু যা'ন ফিরে বুক ভাসে আঁখিনীরে
ভেট-দক্ষিণা সাথে ধিক্কারে ক্ষুণ্ণ,
ভাবেন, "হায়রে তবে যশই কিনেছি ভবে,
পারের কড়ির থলি একেবারে শূন্য!
পুণ্যের আহরণে এখনো মনের কোণে,
ছায়ারূপে বিরাজিছে অভিমান-দম্ভ,
ছাড়িয়া বিষয়-মায়া সে বুঝি ধরেছে কায়া,
বাহিরে তাহার রূপ মঠ, বেদী, স্তম্ভ।

যার ধন সেই পায় লোকে মোর গুণ গায়,
তাই শুনি নিশিদিনই, ভাবি তাই সত্য।
ব্রজনাথ করে দান, জাগে মোর অভিমান,
ভবরোগীটির এ যে দারুণ কুপথ্য।"
এই ভাবি' সব ছাড়ি' মন্দির, মঠ-বাড়ী,
চলিলেন লালাবাবু ঝুলি লয়ে স্কন্ধে,
পথে পথে ব্রজধামে জয় শ্যামরাধানামে,
মাধুকরী করি' সদা ফিরেন আনন্দে।

ব্রজবাসিগণ তায় কেঁদে পিছু-পিছু ধায়,
লাখপতি ভিখ মাগে, অপরূপ দৃশ্য!
সারা ব্রজমণ্ডলে রসের ভিয়ান চলে,
সাথে সাথে ভিড় করে যত দীন নিঃস্ব।
ভাণ্ডার খালি ক'রে আনে থালী ডালি ভ'রে
দিতে রাজভিখারীরে,—গৃহিগণ ব্যস্ত,
ভিখারী লয় না কিছু দৃষ্টি করিয়া নীচু,—
মুষ্টি-ভিক্ষা তরে পাতে শুধু হস্ত।

মাস-ছয় গেল, শেষে গুরুর চরণে এসে
জানালেন লালাবাবু পুন সংকল্প,
হেসে তাঁরে গুরু ক'ন, "দেরী নাই, সুলগন
নিকটে এসেছে বাছা,—বাকী আছে অল্প।"
লালাবাবু ফিরে যা'ন, ভেবে খুঁজে নাহি পা'ন,
দীক্ষার বাধা কোন্ ঐহিক সূত্র ?
যায় কোন্ ফুটা দিয়া সবি তাঁর বাহিরিয়া,
কোন্ গ্লানি জীবনের দুগ্ধে গো-মূত্র ?

সারা পথ আঁখি-জলে তিতাইয়া লালা চলে,
নয়নে নাহিক নিদ—রুচেনাক অন্ন,
শেঠেদের বাড়ীটার পাশ দিয়ে যেতে তাঁর,
জাগিল সহসা চিতে নব-চৈতন্য।
সহসা ভাবেন থামি', "কি ধন পেলাম আমি,
কে করিল করাঘাত হৃদয়-মৃদঙ্গে ?
এই শেঠেদের বাড়ী। রেশারেশি আড়া-আড়ি,
চলিয়াছে কতদিন—ইহাদের সঙ্গে,

ব্রত-দান-খয়রাতে কতই এদের সাথে,
প্রতিযোগিতায় আমি ছিনু রজোদৃপ্ত,
পুণ্য-পণ্য তরে দর-ডাকাডাকি ক'রে,
যশ-পিপাসারে মোর করিয়াছি তৃপ্ত।
মনের কুহর মাঝে আজো অভিমান রাজে ?
হায়, আজো অধমের হ'লো নাক শিক্ষা,
এ ব্রজের দ্বার-দ্বার গেছি আমি বারবার,
পারি নাই এ দুয়ারে মাগিতে ত ভিক্ষা।"

এত ভাবি' একেবারে শেঠের তোরণ-দ্বারে,
হাঁকিলেন লালাবাবু, "রাধে গোবিন্দ।"
শেঠেদের ঘরে ঘরে সে ধ্বনির সাড়া পড়ে,
ছুটে আসে পরিচর-পরিজনবৃন্দ।
কাঁদিল প্রহরী দ্বারী— কেঁদে উঠে ভাণ্ডারী
দেওয়ান কাঁদিয়া চুমে পদধূলি-পঙ্কে,
শেঠ্‌জী ছুটিয়া আসে বাঁধে তাঁরে বাহুপাশে,
নারীরা ফুঁপায়ে কাঁদে ফুকারিয়া শঙ্খে।

ভেদি' রোদনের রোল, হরিবোল, হরিবোল,
টলমল সারা বাড়ী প্রেমের তরঙ্গে,
উদ্দাম কীর্ত্তনে তাণ্ডব নর্ত্তনে,
প্রেমের গুরুর নাম ঘোষিল মৃদঙ্গে।
শেঠ কয় জুড়ি' পাণি "আজি পরাজয় মানি,
ইহলোকে পরলোকে জিতে গেলে বৈরী,
ঝুলিখানি তব কাঁধে ভরা জয়-সংবাদে,
সোণা দিয়ে পরাজয় করিয়াছি তৈরী।"

শেঠ হাঁকে, "বার বার সারা শেঠ-ভাণ্ডার
সাথে দাও বন্ধুর, তবে পাবো তুষ্টি,"
লালাবাবু ক'ন "ভাই, এ জঠরে ঠাঁই নাই
এক কটোরারো, চাই শুধু এক মুষ্টি।"
এক মুঠি প্রেমকণা- ভিখারী হাজার জনা,
লালাবাবু ফিরে যান, সাথে চলে হর্ষে।
সবে হরি হরি বলি', করতাল-কুতুহলী,
শেঠকুল-মহিলারা যূথী-লাজ-বর্ষে।

ফিরে যেতে দ্বারদেশে হেরিলেন গুরু, এসে
কহিলেন, "আজি শেষ হয়েছে পরীক্ষা,
নেচে হরি-হরি বলো, যমুনার ঘাটে চলো,
লগ্ন এসেছে লালা, লও আজি দীক্ষা।"

আশুতোষ

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

[সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১২৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া নগরী। ইনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইনি ডাকবিভাগে চাকরি করিতেন। এখন ইনি দীপালি-নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। 'সপ্তস্বরা,' 'মন্দিরা,' 'পঞ্চপাত্র,' 'খঞ্জনী' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের ইনি রচয়িতা।]

বঙ্গমাতার বীরসন্তান কুলপ্রদীপ হে আশুতোষ,
উজল করিলে রত্নগর্ভা দেশজননীর রত্নকোষ।
ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ নিটোল-স্বাস্থ্য কুশাগ্রধী,
দৃষ্টি তোমার ছিল প্রসারিত আকাশ হইতে সাগরাবধি।

জ্ঞানে ব্রাহ্মণ, তেজে ক্ষত্রিয়, শৌর্য্যে যে ছিলে সব্যসাচী,
ভারত-মর্ম্মবাণীর মূর্ত্তি মিলিত ও দেহে প্রতীচী প্রাচী।
দেশসেবা আর পর উপকার ছিল ব্রত তব হে মহাপ্রাণ,
বিদ্যায় তুমি বৃহস্পতির তুল্য হ'য়েও নিরভিমান।

কুসুম হইতে ছিল সুকুমার কোমল মধুর চিত্তখানি,
বজ্রকঠোর শাসন তোমার অবিকম্পিত ভাষণ-বাণী।
উপেক্ষিতা এ মাতৃভাষারে তোমার মতন পূজিল কেবা!
বঙ্গ-বিশ্ববিদ্যামাতারে করে নাই কেহ এমন সেবা।

বাঙ্গালীজাতির হিমালয় তুমি জ্ঞানমনীষার তাজমহল,
বীর্য্যে সূর্য্য, করুণায় শশী, পবিত্রতায় তুলসীদল।
জ্ঞানযোগ আর কর্ম্মযোগে যে লভিলে বিপুল সিদ্ধি তুমি
তব আদর্শ ছড়ায়ে পড়ুক, ধন্য হউক ভারতভূমি।

রাখী-ভাই

গোলাম মোস্তফা

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে গোলাম মোস্তাফা জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আধুনিক যুগের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। ইঁহার 'রক্তরাগ,' 'খোশ্‌রোজ,' 'হাস্নাহেনা,' 'সাহারা,' 'কাব্য-কাহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। বর্ত্তমান কালে ইনি পাকিস্তানে শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন।]

বাহাদুর শা আস্‌ছে ধেয়ে ক'র্‌তে চিতোর জয়
সঙ্গে নিয়ে বিপুল সেনাদল,
চিতোর-রাণী কর্ণাবতীর তাই জেগেছে ভয়—
রাজপুতানা আতঙ্কে টল্‌মল্।

কে আছে বীর এই ভারতে এমন মহাপ্রাণ
চিতোরের এই দুর্দ্দিন-সন্ধ্যায়
পার্শ্বে এসে দাঁড়ায় তাহার, রাখ্‌তে তাহার মান—
ব্যাকুল রাণী সেই সে ভাবনায়।

হঠাৎ তাহার পড়্‌ল মনে—বাদ্‌শা হুমায়ুন
উদার-হৃদয় অদ্বিতীয় বীর,
বাহাদুরের চেয়ে তাহার শক্তি শতগুণ,
রাখ্‌তে জানে মান সে রমণীর।

অনেক ভেবে অবশেষে হুমায়ুনের ঠাঁই
লিখ্‌ল রাণী লিপি সে একখান—
"আজ হ'তে বীর হ'লে তুমি আমার 'রাখী-ভাই',
শীঘ্র এসে বাঁচাও বোনের প্রাণ।"

দূতের হাতে দিল লিপি, আর সে রাখী তার—
যাত্রাপথে বাহির হ'ল দূত,
উৎসাহ ও কৌতুহলের অন্ত নাহি আর—
অবাক সবাই, ব্যাপার যে অদ্ভুত।

বাদ্‌শা তখন বাংলাদেশে ছিলেন অনেক দূর,
শেরের সাথে চল্‌ছে লড়াই তাঁর,
পাঠান-বীরের দর্প এবার না যদি হয় চূর
রাজ্য রাখাই হবে তাঁহার ভার।

এম্নি কঠিন দুঃসময়ে কর্ণাবতীর দূত
হাজির হ'ল হুমায়ুনের পাশ,
লিপি দিল, আর দিল সেই রাঙা রাখীর সূত,
মুখে তাহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস।

লিপি পেয়ে আত্মহারা হুমায়ুনের প্রাণ,
কী করিবে, ভেবেই নাহি পায় ;—
শত্রুরে আজ ছেড়ে গেলেও চরম অকল্যাণ—
কিরূপে বা রাখীই ফিরান যায়।

একটী নারী দুর্দ্দিনে আজ মাগ্‌ছে শরণ তার—
'ভাই' ব'লে সে করেছে আহ্বান,
সে আহ্বানে খুল্‌বে নাকি তাহার হৃদয়-দ্বার ?
সাড়া কি আজ দিবে না তার প্রাণ ?

থাকুক শত বিঘ্ন-বাধা—বাদশাহী তার যাক,
তবু তাহার 'বোন' বাঁচানো চাই ;
হোক বাহাদুর সজাতি তা'র—হিন্দু 'বোনের' ডাক
শুন্‌বে আজি মুস্‌লিম তার 'ভাই'।

ক্ষান্ত করি' এক নিমেষেই যুদ্ধ-অভিযান
চিতোর পানে ছুট্‌ল হুমায়ুন ;—
কোন্ অসীমের ডাক শুনে আজ চঞ্চল তার প্রাণ?
একটী রাঙা রাখীর এত গুণ!

লোক-লস্কর সঙ্গে নিয়ে লড়্‌ল এসে বীর—
কামান-গোলা ছুট্‌ল সে প্রচুর,
পড়্‌ল লুটে হাজার হাজার মুসলমানের শির,
বাহাদুরের দর্প হ'ল চুর।

চিতোর-ভূমি মুক্ত হ'ল, অমনি হুমায়ুন
চল্‌ল ছুটে বোনের খোঁজে তার
রাজপুরীতে উঠ্‌ল বেজে সুর সে অকরুণ—
কর্ণাবতী নাইক' বেঁচে আর।

ব্যাকুল আশায় চেয়ে চেয়ে হুমায়ুনের পথ
কর্ণাবতী গণ্‌ছিল দিনরাত,
অবশেষে ভাব্‌ল যখন বিফল মনোরথ—
জহর-ব্রতে ক'র্‌ল জীবন-পাত।

গভীর ব্যথায় হুমায়ুনের স্বর সরে না আর—
বোনের তরে ভাই কেঁদে আজ খুন,
এই জীবনে হ'লনাক' দেখাই দু'জনার—
সেই বেদনায় ক্ষুব্ধ হুমায়ুন।

কাণ্ডারী হুশিয়ার

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

[১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশভক্ত বর্দ্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বিগত (১৯১৪-১৮) বিশ্বব্যাপী মহাসমরের সময়ে ইনি বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি 'অগ্নিবীণা,' 'দোলন-চাঁপা,' 'সঞ্চিতা,' 'ছায়ানট,' 'ভাঙ্গার গান,' 'বিষের বাঁশী,' 'চিত্ত-নামা,' 'সর্ব্বহারা,' 'নজরুল-গীতিকা,' 'দেওয়ান-ই-হাফিজ' প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়া অনন্যসাধারণ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। সঙ্গীত-রচনাতেও ইঁহার অসামান্য খ্যাতি আছে। ইনি বহুদিন পক্ষাঘাতরোগে শয্যাগত হইয়া আছেন।]

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা, হুশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ।।

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান!
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে দিতে হবে অধিকার ।।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
"হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ!
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি পথ মাঝ?
ক'রে হানাহানি, তবু চল টানি' নিয়াছ যে মহাভার।

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী, হুশিয়ার!

ছাত্রদলের গান

কাজী নজরুল ইস্‌লাম

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান ঊর্দ্ধে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের | আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটী রক্তে রাঙাই বিষম চলার ঘায়।
যুগে যুগে রক্তে মোদের সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উঠেন আমরা পশি নীল অতল।
আমরা ছাত্রদল ॥

আমরা ধরি মৃত্যু রাজার যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি সর্ব্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল ॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায় আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব। আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ-রাতে আমরা তরুণ রক্তে করি পথ পিছল।
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন নিত্য কালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল ॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ শতাব্দীর।
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে ভরেছি মা'র শ্যাম আঁচল।
আমরা ছাত্রদল ॥

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল ॥

সেবা-গৌরব

অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

[অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ২৪-পরগনার বৈপুর গ্রামে ১৩১১ সালে (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার রচিত বহু কবিতা বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং 'মধুচ্ছন্দা,' 'নীরাজন,' 'গায়ত্রী' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ সাহিত্য-সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে।]

ভবনে বন্দী গুরুগোবিন্দ বাহিরে অরাতিগণ,
গুরুজীরে ত্রাণ করিতে আজিকে শিখেরা ক'রেছে পণ।
নানা দেশ হ'তে দলে দলে শিখ আসিছে সঁপিতে প্রাণ,
গুরুর ভবন 'আনন্দপুর' ঘিরেছে মুসলমান।

অসির আঘাতে জ্বলেছে বহ্নি, ছুটেছে তীক্ষ্ণ তীর—
ভূতলে লুটায় হাজার হাজার বীরের ছিন্নশির।
বাজে তূরীভেরী, নাচে তরবারি, ক্ষিপ্ত নিরীহ শিখ,
গরজে কামান—'গুরুজীর জয়' ধ্বনিয়া তুলিছে দিক্।

রক্তধারায় ডুবু ডুবু আজ জাতীয় জীবন-ভেলা,
বিষাদের ছায়া স্তব্ধপুরীতে ছেয়েছে সারাটি বেলা।
একদা যাদের সাধনায় ছিল শান্তির উপচার,
রুদ্রপূজায় নিয়েছে তাহারা গুরুজীর গুরুভার।

তারি মাঝে এক বৃদ্ধ শিখের দেখা যায় আঁখি দুটি—
কুসুমের সম আর্ত্তসেবায় উঠেছে নীরবে ফুটি'।
সে নহে সেনানী,—তরবারি নিয়া যুদ্ধ করেনি কভু,
গুরুর চরণে সঁপিতে অর্ঘ্য যুদ্ধে এসেছে তবু।

শিখ-ইস্‌লাম বন্ধু-অরাতি ভেদাভেদ গেছে ভুলে,
সেবায় বিভোর রণঝঞ্ঝার মরণদোলায় দুলে।
মরণের পথে চলিতে চলিতে থেমেছে আহত যারা,
তাহাদের প্রাণে 'ভাই-কানায়ে'র ঝরিছে করুণাধারা।

শত্রুসেবার এই সমাচার গেল গুরুজীর কাণে
চাহে প্রতিশোধ কহিল শিখেরা গুরুর সন্নিধানে—
'গুরুজি! তোমার শিষ্যপ্রধান সেবা করে অরাতির,
বিচার করগো, নতুবা তাহার ছিন্ন করিব শির।'

বৃদ্ধেরে ডাকি' কহিলেন গুরু—'একি তব আচরণ!'
বৃদ্ধ কহিল—'মানব-সেবা যে চিত্তের আভরণ—
কহিয়াছ গুরু, তাই যদি হয় হোক্ না অরাতি ভাই,
আর্ত্ত আহত সবারে সেবিব, দিয়েছ শিক্ষা তাই—'

রহিল চাহিয়া গুরুজীর পানে বৃদ্ধ নয়ন-লোরে
ক্ষণেক থামিয়া কহিল আবার—'দাও গো দণ্ড মোরে।'
স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন গুরু—তাহার ভাষণ শুনে,
'সবার ঊর্দ্ধে তোমারি আসন সেবাধর্ম্মের গুণে।'

কোন কথা আর কহিল না কেহ, কামান গরজে দূরে
মোগল-শিখের উষ্ণ শোণিত বহে 'আনন্দপুরে'।
শোণিতপঙ্ক-রৌরব মাঝে, শত্রুরে ভালবেসে
সেবা-গৌরবে শিখের শৌর্য্য স্বর্গ রচিল শেষে॥

———

যৌবন-মথুরা

জসীম উদ্দীন

[পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য জীবনের কথা কবিতায় লিখিয়া ইনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত তাম্বুলখানা গ্রামে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। ইঁহার রচিত 'নক্‌শী কাঁথার মাঠ,' 'রাখালী,' 'বালুচর,' 'সোজন বাদীয়ার ঘাট,' 'ধানক্ষেত,' 'রঙীলা নায়ের মাঝি' প্রভৃতি পুস্তক পাঠক-সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে।]

তরুণ কিশোর, তোমার জীবনে সবে এ ভোরের বেলা,
ভোরের বাতাস ভোরের কুসুমে জুড়েছে রঙের খেলা।
রাতের কুহেলি-তলে,
তোমার জীবন উষার আকাশে শিশু-রবি-সম জ্বলে।
এখনো বসিয়া সেঁউতির মালা গাঁথিছে ভোরের তারা,
ভোরের রঙীন শাড়ীখানি তার বোনা হয়নিক সারা।
হায়রে তরুণ হায়,
এখনি যে সবে জাগিয়া উঠিবে প্রভাতের আঙ্গিনায়।
বিহগ ছাড়িয়া ভোরের ভজন, আহারের সন্ধানে
আকাশে বাতাসে ক্লান্ত পাখায় ছুটিবে সুদূর পানে।
তরুণ কিশোর ছেলে,
আমরা আজিকে ভাবিয়া না পাই তুমি হেথা কেন এলে।
তুমি ভাই সেই ব্রজের রাখাল, পাতার মুকুট পরি'
তোমাদের রাজা আজো নাকি খেলে গেঁয়ো মাঠখানি ভরি'।

তরুণ কিশোর ছেলে,
আমরা আজিকে ভাবিয়া না পাই তুমি হেথা কেন এলে।
তুমি যে কিশোর, তোমার দেশে ত হিসাব-নিকাশ নাই,
যে আসে নিকটে তাহারেই নও আপন বলিয়া তাই।

হেথা যৌবন যত কিছু এর খাতায় লিখিয়া লয়,
পান হ'তে এর চুন খসেনাকো, সবেরি হিসাব রয়।
তোমার গোকুল আজো শেখে নাই নিজ-পর বলে কারে,
ভালবেসে তাই বুকে বেঁধে লয় আদরিয়া যারে তারে।
সেই ব্রজধূলি আজো ত মুছেনি তোমার সোণার গায়,
কেন তবে ভাই চরণ বাড়ালে যৌবন-মথুরায়।

হায়রে প্রলাপী কবি।
কেউ কভু পারে মুছিয়া লইতে ললাটের লেখা সবি?
মথুরার রাজা টানিছে যে ভাই কালের রজ্জু ধ'রে,
তরুণ কিশোর, কেউ পারিবে না ধরিয়া রাখিতে তোরে।
ওপারে গোকুল, এপারে মথুরা, মাঝে যমুনার জল,
নীল নয়নেতে তোর ব্যথা বুঝি ব'য়ে যায় অবিরল।
তবু যে তোমারে যেতে হবে ভাই সে পাষাণ-মথুরায়,
ফুলের বসতি ভাঙ্গিয়া এখন যাইবি ফলের গাঁয়।
এমনি করিয়া ভোরের শিশির শুকায় ভোরের থাসে,
মাধবী হারায় বুকের সুরভি নিদাঘের নিশ্বাসে।

তোরে যেতে হবে চ'লে
এই গোকুলের ফুলের বাঁধন দুপায়েতে দ'লে দ'লে।
বিহগ ছাড়িয়া ভোরের ভজন আহারের সন্ধানে
বেলা বেড়ে গেলে, কুঞ্জ তেয়াগি' ছুটিবে সুদূর পানে।

ঝর্নার গান

রাধারাণী দেবী

[বর্ত্তমান যুগের মহিলা কবিগণের মধ্যে রাধারাণী দেবীর আসন অতি উচ্চে। ইনি ১৩১১ সালে কুচবিহারে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেবের সহধর্মিণী। ইঁহার রচিত 'লীলাকমল,' 'বনবিহগী,' 'সিঁথিমৌর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে সমাদৃত হইয়াছে।]

পাহাড়! ওগো পাহাড়! তোমার বুকের নীড়ে,
বৃথাই তুমি চাইছো মোরে রাখতে ঘিরে।
বাইরে যে-জন বেরিয়েছে সে ফিরবে নাক'—
অচল তুমি, পথ-চলা সুখ পাওনিক' তাই দাঁড়িয়ে থাক';
সৃষ্টি-করার আনন্দ কী বিপুলতরা,—
—উষর-মাটী শস্পে ভরা।

অরণ্য গো, অরণ্য! হায়, ডাকছো মোরে,
লক্ষ-শাখার ব্যাকুল-বাহু প্রসার ক'রে!
বিধুর তোমার ছায়া আমার পড়ছে বুকে,—
মর্ম্মরিয়া দীন-মিনতি গুঞ্জরিছ আবোল-মুখে।
থামার সময় নেইক' আমার ;—তোমার দেহে
রাঙিয়ে গেলাম সবুজ স্নেহে।

উপল! ওগো উপল! কঠিন শিকল-ডোরে
মিছাই তোমার প্রয়াস সখা বাঁধতে মোরে।
অচল হ'তে জন্মি' চলি অগাধ পানে—,
সুনীল-আকাশ নীল সাগরের স্বপন দিল জাগিয়ে প্রাণে।
রঙ ছুটায়ে ফুল ফুটায়ে চলছি ছুটে,—
মত্ত-গানের নৃত্যে লুটে।

তটভূমি লো, তটভূমি! তোর প্রয়াসরাশি,—
চিত্তে আমার দ্বিগুণ জাগায় উছল হাসি।
বাঁধতে ব্যাকুল উভয় বাহুর সীমার বেড়ে,—
তোর বাঁধনে পড়তে ধরা এলাম গিরি-ঘর কি ছেড়ে?
মাঝে মাঝে বিপুল-ভাঙন তাইতো আনি,—
বুঝিয়ে দিতে একটুখানি।

কুসুম, লতা, ক্ষেত, তরু, বন, পাথর, মাটি—
ডাক্‌ছে,—'নদি! থাম্‌গো, দিব পুলক বাঁটি'।'
চলার নেশায় মাতলো যে জন, হায়গো তারে
এই ধরণীর অচল যারা—তারা কি কেউ বাঁধতে পারে?
বন্ধুরা সব! করতে হবে আমার ক্ষমা,—
ধন্যবাদই রইলো জমা!

আকাশ আমায় আভাস দেছে সমুদ্র-রূপ,—
বাতাস দেছে পৌঁছে অতল-বার্ত্তা অনুপ।
গান গেয়ে ঐ ডাক্‌ছে বিহগ,—'আয়লো ত্বরা,
রত্নাকরে আপ্‌না সঁপে ঊর্মিলা হও স্বয়ংবরা—'
ঢেউগুলি মোর ভাব্‌ছে—সাগর কখন্ পাবো;
যাবোই, ওগো! যাবোই যাবো।

———

আকবর

হুমায়ুন কবীর

[১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপক ছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ইঁহার কবিতা ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয় এবং ইনি নিজে 'চতুরঙ্গ' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক। ইঁহার রচিত 'পদ্মা,' 'সাথী' ও 'স্বপ্ন-সাধ' নামক তিনখানি পদ্য-গ্রন্থ সাহিত্যসমাজে আদৃত হইয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে ইঁহার কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।]

হে সম্রাট্, ব'সে আছি আজি তব সমাধির পাশে
একান্ত বিজন,
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার হ'তে ভেসে আসে
বিহগ-কূজন
নীরব মধ্যাহ্নবেলা, শব্দহীন নিঃসাড় ভুবন,
কেহ কোথা নাই ;
অকস্মাৎ মর্ম্মরিলে তরুশাখে মন্থর পবন,
চমকিয়া চাই।

তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল যে মহাস্বপন,—
এ ভারত-ভূমি
এক ধর্ম্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন
বেঁধে দিবে তুমি।
সমাজ-আচার-ভেদ ধর্ম্ম-ভেদ ভুলে যাবে সবে,
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন একসাথে হবে
জীবনমরণ।

বিজিত-বিজেতৃ-ভেদ ভুলেছিলে, ওহে মহা-প্রাণ,
হিংসা ভুলেছিলে,
তোমার মহান্ প্রেমে দূর করি' সর্ব্ব অসম্মান
কোলে টেনে নিলে।

হিন্দু-মোস্লেমের দ্বেষ, রাজপুত-পাঠান-মোগল-
সংঘাত জিনিয়া,
মহা-ভারতের স্বপ্ন মেলি' স্থির আঁখি অচপল
দেখেছিল হিয়া।

হে সম্রাট্, জানে নাই ভয় কভু তোমার হৃদয়,
নিয়ত সম্মুখে
সন্দেহ-সংশয়-চিন্তা জয় করি' চলেছে নির্ভয়
সব সুখে দুখে।
বিপদের দিনে বন্ধু দাঁড়াইল সরি' পার্শ্ব হ'তে—
একান্ত একাকী
আপন জীবনব্রত সাধিবারে চলিয়াছ পথে
লক্ষ্য স্থির রাখি'।

কে এল তোমার সাথে, কে তোমারে ছেড়ে গেল চ'লে
চাহ নাই ফিরে,
আপন প্রাণের স্বপ্নে সকল জীবন তব জলে
বিদারি' তিমিরে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়া পলে পলে আঁকিয়াছ ছবি
যে মহা-ভারত,
আজিও সম্ভ্রমভরে দেখে শুধু, হে সম্রাট্-কবি,
বিস্মিত জগৎ।

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্ব্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে,
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্ব্বনাশ আমাদেরে রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে।

কল্যাণের পথ মোরা হারাইয়া আঁধারের মাঝে
ঘুরি দিশাহারা,
আমাদের দেশ তাই হতাদরে অপমানে নাজে
আমাদের কারা।

হে মহান্, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি
জাগুক আবার,
উঠুক মিলনমন্ত্র সাম্যবাদে কম্বুকণ্ঠে বাজি'
টুটিয়া আঁধার।
হিংসা-দ্বেষ মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত শঙ্কাভরে
হোক শান্ত হোক,
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব

কাদের নওয়াজ

[কাদের নওয়াজ বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোট গ্রামের অধিবাসী। পূর্ব পাকিস্থানে ইনি সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কর্ম্ম করেন। পল্লীকবি বলিয়া ইঁহার খ্যাতি আছে। ইনি প্রধান প্রধান মাসিক পত্রিকার লেখক।]

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, নিদ্রিত খোশ্‌বাগে,
শিয়রে তাহার নিবুনিবু ওই নিশার প্রদীপ জাগে।
আলিবর্দ্দীর স্নেহের দুলাল, চির আদরের ধন,
বাংলা মায়ের আঁচলের নিধি আজি ঘুমে অচেতন।

দাও দাও সবে প্রাণের পুষ্প তাহার কবর 'পরে,
দাও বিধি মোরে অযুত নয়ন শুধু কাঁদিবার তরে।
হেথাকার তরু হেথাকার লতা জড়াজড়ি করি' কাঁদে,
ঝিল্লীরা সাঁজে বীণা তাহাদের বেহাগের সুরে সাধে।

আলিবর্দ্দীর কবরের ছায়া সূর্য্যাস্তের সনে
ধীরে ধীরে পড়ে সিরাজের গোরে। দেখি আর ভাবি মনে
আজো বুঝি দাদু ভোলে নাই তারি স্নেহের দুলালটিরে,
আজো বুঝি তারে দুটী বাহু দিয়ে রেখেছে সোহাগে ঘিরে।

পাছে ঘুম ভাঙে তাই বুঝি হেথা কবুতর নাহি ডাকে,
উর্ণনাভেরা পাহারা দিতেছে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে।
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব হেথায় ঘুমায়ে আছে,
প্রকৃতি-জননী শঙ্কিত সদা ঘুম ভাঙে তার পাছে।

আজিকে প্রভাতে সিরাজের গোর করিয়া প্রদক্ষিণ—
মনে পড়ে হেথা লুৎফুন্নেসা ফুল দিয়ে প্রতিদিন
সাজায়ে রেখেছে পতির কবর, জ্বেলেছে প্রদীপ রাতে,
লুটায়ে কেঁদেছে প্রভাতে হেথায় সূর্য্যোদয়ের সাথে।

কত শত কথা মনে পড়ে হায়, আজিকার মরসুমে,
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ঘুমায় অঘোর ঘুমে।

———

গদ্যাংশ

নৌকাভ্রমণ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ 'ঠাকুর'-পরিবারে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে গিয়া রাজসম্মান লাভ করিয়াছিলেন। প্রভূত ধনসম্পদের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও অল্পবয়সে দেবেন্দ্রনাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। অল্প বয়স হইতেই দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর হন। ইঁহার ত্যাগ ও ধর্ম্মবিশ্বাস অসাধারণ ছিল, তজ্জন্য ইঁহার অনুরাগী ব্রাহ্মগণ ইঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যা প্রদান করেন। ইঁহার রচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান,' 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস,' 'উপদেশাবলী,' 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি,' 'পরলোক ও মুক্তি,' 'আত্মজীবনী,' 'বিবিধ ব্রহ্ম-সঙ্গীত' প্রভৃতি পুস্তক সুপরিচিত। ইঁহার পুত্রগণ সকলেই কৃতী ছিলেন, তন্মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম জগতের সর্ব্বত্র বিদিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জানুয়ারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গারোহণ করেন।]

আমার বিশেষরূপে বেদ জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বেদের চর্চ্চা কাশীতে, অতএব সেখানে বেদ শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম। এক জন ছাত্রকে ১৭৬৬ শকে কাশীধামে প্রেরণ করিলাম ; তিনি তথায় মূল বেদসমুদায় সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বৎসরে আর তিন জন ছাত্র তথায় প্রেরিত হইলেন। আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর এবং রমানাথ—এই চারি জন ছাত্র।

যখন ইঁহাদিগকে কাশীতে পাঠাই, তখন আমার পিতা ইংলণ্ডে। তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্য্যের ভার সকলই আমার উপরে পড়িল। কিন্তু আমি কোন কাজকর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারিতাম না। কর্ম্মচারীরাই সকল কাজ

চালাইত; আমি কেবল বেদবেদান্ত, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর ও চরম-গতিরই অনুসন্ধানে থাকিতাম। বাড়ীতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কর্ম্ম-কাজের প্রতিঘাতে আমার উদাস ভাব আরো গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না; জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশ-ভেদে তাঁহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে, বিপদে, সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার পালনী-শক্তি অনুভব করিব,—এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।

১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমার ধর্ম্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও।" আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন। আমি রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি সুপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর।

রাজনারায়ণ বসুর পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে, তাঁহার ধর্ম্মভাব ও নম্র ভাব দেখিয়া, আমি বড় সুখী হইয়াছিলাম। তিনি ১৭৬৬ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন,—"যদি রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হয়, তবে বড় ভাল হয়"। জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁহার সে ইচ্ছার সফলতা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজনারায়ণ বাবু সেই অশৌচ অবস্থায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সময়েই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য। তাঁহার বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্ম্মভাব

দেখিয়া ,দিন দিন তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের খুব মিল হইয়া গেল। তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী পাইলাম। তখন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে ইংরাজী লেখাপড়ার প্রয়োজন, তাহার বিশেষ ভার তাঁহার উপরে দিলাম। কঠাদি উপনিষদের অর্থ আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতাম, তিনি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেন, এবং সে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত।

যদিও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না, তথাপি তিনি সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিতেন, তাঁহার হাস্যমুখ সর্ব্বদাই দেখিতাম। তখন তিনি আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি তাঁহাকে পরিবারের মধ্যেই গণ্য করিতাম। যখন আমি পরিবার লইয়া বেড়াইতে চলিলাম, তখন রাজনারায়ণ বাবুকে সঙ্গে লইলাম। তিনি সেই বোটে আমার সঙ্গে রহিলেন ; পিনিসে আমার স্ত্রীপুত্র-সকল।

উৎসাহ সহকারে আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখনকার সেই শ্রাবণ মাসের প্রবল স্রোত আমাদের বিপক্ষে ; তাহার প্রতিকূলে, অতি কষ্টে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। হুগলী আসিতেই তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আর দুই দিন পরে কালনাতে আসিয়া মনে হইল, যেন কত দূরেই আসিয়াছি।

এইরূপে চলিতে চলিতে পাটুলি পশ্চাৎ করিয়া এক দিন বেলা চারিটার সময় আমি রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, "আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেল। আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে ; চল, আমরা বোটের ছাদের উপর গিয়া বসি।" তিনি বলিলেন যে, "এখনও বেলার অনেক বাকী ; ইহার মধ্যে আমার দৈনন্দিনের জন্য কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কে জানে ?"

এইরূপে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশঙ্কা হইল। রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, "চল আমরা পিনিসে যাই ; ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়।"

মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। আমি সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বোটের ছাদের উপর বসিয়া আছি, এবং দুই জন দাঁড়ী পিনিসের সঙ্গে মিলাইয়া বোট ধরিয়া আছে। অন্য একটা নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নৌকার গুণ আমাদের বোটের মাস্তলের আগায় লাগিয়া গেল। সেই গুণ আমাদের এক জন দাঁড়ী লগি দিয়া ছাড়াইতেছিল। আমি সেই গুণ ছাড়ানো দেখিতেছি। যে দাঁড়ী গুণ ছাড়াইতেছিল, সে সেই বাঁশের লগির ভার সামলাইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে লগি আমার মস্তকের উপর পড়-পড় হইল। সামাল-সামাল রব পড়িয়া গেল, মহাগোল উঠিল। আমি তখনও সেই মাস্তলের দিকে তাকাইয়া আছি। দাঁড়ী সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমার মস্তক বাঁচাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিল না। লগির কোণ আসিয়া আমার চক্ষুর কোণে চশমার তারের উপর পড়িল। চক্ষুটা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু চশ্‌মার তার আমার নাসিকা কাটিয়া বসিয়া গেল। আমি টানিয়া চশ্‌মা তুলিয়া ফেলিলাম, আর দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছাদ হইতে নামিয়া তখন আমি নীচে বোটের কিনারায় বসিয়া রক্ত ধুইতে লাগিলাম।

ঝড়ের কথা মনে নাই, সকলেই একটু অসাবধান। দাঁড়ীরা পিনিস ধরিয়া আছে, এবং সেই অবস্থায় বোট লইয়া পিনিস চলিতেছে। এমন সময় একটা দমকা ঝড় আসিয়া পিনিসের মাস্তলের একটি শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই ভগ্ন মাস্তলটি তাহার পা'ল ও দড়াদড়ি লইয়া বোটের মাস্তলকে জড়াইয়া তাহার ছাদের উপর পড়িল; সেই স্থানে আমি পূর্ব্বে বসিয়া ছিলাম। এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতে লাগিল। পিনিস অবশিষ্ট পা'ল-ভরে ঝড়ে ছুটিতে লাগিল, এবং বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। যে দুই জন দাঁড়ী পিনিস ধরিয়া আছে, তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এক-কেতে হইয়া চলিল; সে দিকটা জলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়াই পড়িল, কেবল এক আঙ্গুল মাত্র জল হইতে ছাড়া। মাস্তলে জড়ানো দড়ি কাটিয়া দিবার জন্য একটা গোল পড়িয়া গেল, "আন্ দা, আন্ দা;" কিন্তু দা কেহ খুঁজিয়া পায় না। একখানা ভোঁতা দা লইয়া একজন মাস্তলের উপর উঠিল। আঘাতের পর আঘাত, তার পরে আঘাত, কিন্তু এ ভোঁতা দা-য়ে দড়ি কাটে না। অনেক কষ্টে একটা দড়ি কাটিল, দুইটা কাটিল। তৃতীয়টা

কাটিতেছে, আমি আর রাজনারায়ণ বাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এই নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। রাজনারায়ণ বাবুর চক্ষু স্থির, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁড়ীরা দড়িই কাটিতেছে। আবার একটা ভারি দমকা আইল। দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, "আবার তাই রে, তাই!"। বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে ওপারে চলিয়া গেল এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল। আমি অমনি বোট হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম; রাজনারায়ণ বাবুকেও ধরাধরি করিয়া তুলিলাম।

এখন ডাঙ্গা পাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু পিনিস তখনও দৌড়িতেছে। দাঁড়ীরা চেঁচাইতে লাগিল, "থামা, থামা"। তখন সূর্য্য অস্ত গেল; মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল; পিনিস থামিল কি না, অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। ওদিকে দেখি, একটা ছোট নৌকা বেগে আমাদের বোটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা আমাদের বোটকে ধরিল। আমি বলিলাম, "এ আবার কি? ডাকাতের নৌকা নাকি?" আমার ভয় হইল। সেই নৌকা হইতে লাফাইয়া একজন পাড়ের উপর উঠিল। দেখি যে, আমার বাড়ীর সেই স্বরূপ খানসামা। তাহার মুখ শুষ্ক। সে আমাকে একখানা চিঠি দিল। সেই অন্ধকারে অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা পড়িলাম, তাহাতে বোধ হইল, ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু-সংবাদ আছে। সে বলিল, "কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। আপনার খোঁজে নৌকা করিয়া কত লোক বাহির হইয়াছে, কেহ আপনাকে ধরিতে পারে নাই। আমার এত কষ্ট সার্থক যে, আমি আপনাকে ধরিলাম।"

এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল। আমি স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া বোট লইয়া পিনিস ধরিতে গেলাম, এবং সেই পিনিস ধরিয়া তাহাতে উঠিলাম। সেখানে আলোতে পত্রখানা স্পষ্ট করিয়া পড়িলাম। এখন আর কি হইবে? তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ এখন আর কাহাকেও শুনাইলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতা অভিমুখে ফিরিলাম। আমি যে বোটে ছিলাম, তাহা ১৪টা দাঁড়ের বোট। ইহার ভিতরকার দুই পার্শ্বে বেঞ্চের উপরে আঁটা তক্তা, তাহাতে দীর্ঘ ফরাস পাতা। আমি স্ত্রীপুত্রদিগকে তাহাতে

লইলাম। রাজনারায়ণ বাবুকে সমস্ত পিনিসের অধিকার দিয়া পশ্চাতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। ভাদ্রমাসের গঙ্গার স্রোতে, দাঁড়ে পা'লে নক্ষত্র বেগে বোট ছুটিল; কিন্তু মন তাহার আগে ছুটিতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টির ও বাতাসের কোলাহল। মধ্যপথে, কালনাতে পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে, এক মাঠের ধারে এমন তুফান উঠিল যে, নৌকা ডুব-ডুব' হইয়া পড়িল। নৌকা কিনারা দিয়াই যাইতেছিল; মাঝিরা তৎক্ষণাৎ ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের একটা মুড়া গাছে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল; বোট রক্ষিত হইল। তখন সেই মুড়া গাছটিকে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং পরম বন্ধু বলিয়া আমার মনে হইল। পাঁচ মিনিট পরেই আবার আমরা মনের আবেগে বোট খুলিয়া দিলাম। যখন বেলা অবসানপ্রায়, তখন আমি মেঘের মধ্য দিয়া ক্ষীণপ্রভ সূর্য্যকে একবার দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সুখসাগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। সূর্য্য যখন অস্ত হইল, তখন আমি ফরাস-ডাঙ্গায়। সেখানে দাঁড়ীদের হাত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আর তাহারা খাটিতে পারে না। আবার, জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল, এ-ও বিষম ব্যাঘাত। এখান হইতে পল্‌তায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল; এখানে আসিয়া বোট কাত হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। এক একবার দমকা বাতাসে দুই এক জায়গায় ভয়ে বোট থামাইতেও হইয়াছিল। দাঁড়ীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া শীতে কাঁপি-তেছে। পল্‌তায় পঁহুছিতেই কিনারা হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী প্রস্তুত আছে। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল।

আমি সেই যে বোটে বসিয়াছিলাম, একবারও তাহা হইতে উঠি নাই। এখন গাড়ীর কথা শুনিয়া সেখান হইতে উঠিয়া বোটের দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি যে, সেখানে একহাঁটু জল; সমস্ত নৌকার খোল জলে পূরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে। সকলই বৃষ্টির জল; আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতেও পারি নাই। যদি পল্‌তায় গাড়ী না থাকিত, যদি আমরা নৌকায় বরাবর কলিকাতার দিকে চলিতাম, তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; এ কথা আর কাহাকে বলিতেও পারিতাম না।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। বহু বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু উপরিতন কর্ম্মচারীর সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় চাকরি ত্যাগ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-সেবায় ব্রতী হন। তিনি একজন স্বাধীন-চেতা, দয়ালু-হৃদয় বিরাট পুরুষ ছিলেন। বাঙ্গালার গদ্য-সাহিত্য তাঁহার নিকট অশেষরূপে ঋণী। তিনি 'সীতার বনবাস,' 'শকুন্তলা,' 'ভ্রান্তিবিলাস,' 'বেতালপঞ্চবিংশতি,' 'আখ্যান-মঞ্জরী' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করেন। ইহা ছাড়া সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী কয়েকখানি প্রাথমিক শিক্ষা-পুস্তক এবং ব্যাকরণও তিনি রচনা করেন। তিনি একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন এবং বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর পরলোক-গমন করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'সি. আই. ই.' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।]

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে ; নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে ; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্শক্তিরহিত হইতেছি ; জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য। আমি বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে ; না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু।

অনন্তর তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে। বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর ; আর অনর্থক কালহরণ করিতেছ কেন ? এই বলিয়া তপোবন-তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ। যিনি তোমাদের জলসেচন না করিয়া কদাচ জলপান করিতেন না ; যিনি

ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, স্নেহবশতঃ কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না,—অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীবমাত্রই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ আহার-বিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে,—মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে; মধুকর-মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু-দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল। এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না, বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে, এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ-দ্বারা ক্ষত হইলে, তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে,—সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও, আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগ সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল; উচ্চ-নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে বারবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনে বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয় বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে,—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায় শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমারেও কিছু উপদেশ দিব—আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে

গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখী-ব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্য-প্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন। গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যেগুলি বলিলেন সকল মনে রাখিও।

এইরূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এই খান হইতে ফিরিয়া যাইবেক? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে। ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব, সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, তাত! তোমায় না দেখিয়া, সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব? এই বলিতে বলিতে, তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, তাত! আবার কত দিনে এই তপোবনে আসিব? কণ্ব কহিলেন, বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি-সমভিব্যাহারে পুনরায় এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায়; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও; আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন

করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল। তোমাদের কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি! ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গৌতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দুষ্যন্তরাজধানী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, একদৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন; এক্ষণে, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখেই প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে, মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্রূপ অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম।

স্বপ্নদর্শন—বিদ্যাবিষয়ক

অক্ষয়কুমার দত্ত

[বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চুপী গ্রামে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত ছিলেন এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার ইংরেজী দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রকে বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণের উপভোগ্য করিয়া লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে

'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার,' 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়,' 'চারুপাঠ' প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রসিদ্ধ। ইনি পরম পণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। ইনি ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন।]

পরমেশ্বরের বিচিত্র রচনা-দর্শনার্থে পরম কৌতূহলী হইয়া, আমি কিয়ৎকালাবধি দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং নানা স্থান পর্য্যটন-পূর্ব্বক এখন মথুরা-সন্নিধানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। এখানে এক দিবস দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, সায়ংকালে যমুনাতীরে উপবেশনপূর্ব্বক সুললিত লহরী-লীলা অবলোকন করিতেছিলাম। তথাকার সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে শরীর শীতল হইতেছিল। কত শত দীপ্যমান হীরকখণ্ড গগন-মণ্ডলে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল, এবং তন্মধ্যে দিব্য-লাবণ্য-পরি-শোভিত পূর্ণ চন্দ্র বিরাজমান হইয়া, কখনও আপনার পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় সুধাময় কিরণ বিকিরণপূর্ব্বক জগৎ সুধাপূর্ণ করিতেছিলেন, কখনও বা অল্প অল্প মেঘাবৃত হইয়া স্বকীয় মন্দীভূত কিরণ-বিস্তার-দ্বারা পৌর্ণমাসী রজনীকে উষানুরূপ ম্লান করিতেছিলেন। কখনও তাঁহার সুপ্রকাশিত রশ্মিজাল সলিল-তরঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া কম্পমান হইতেছিল; কখনও গগনাবলম্বিত মেঘবিম্ব-দ্বারা যমুনার নির্ম্মল জল ঘনতর শ্যামবর্ণ হইয়া, অন্তঃকরণ হরণ করিতেছিল। পূর্ব্বে দূর হইতে লোকালয়ের কলরব শ্রুত হইতেছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া স্ব স্ব স্থানে লীন হইল, এবং সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা জীবগণের নেত্রো-পরি আবির্ভূতা হইয়া, সকল ক্লেশ শান্তি করিতে লাগিল।

এইরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে আমি তথায় এক পাষাণখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া, আকাশ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জগতের আদি-অন্ত, কার্য্য-কারণ, সুখ-দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমুদয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে জল-কল্লোলের কলকল-ধ্বনি, বৃক্ষ-পত্রের শরশর-শব্দ ও সুশীতল সমীরণের সুন্দর হিল্লোল-দ্বারা আমার পরম সুখানুভব হওয়ায় মনোবৃত্তি-সমুদয় ক্রমে ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল, এবং এই অবসরে নিদ্রা আমার অজ্ঞাতসারে নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া আমাকে অভিভূত করিল। আমার বোধ হইল, যেন এক বিস্তীর্ণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। তন্মধ্যে কোন কোন স্থানে কেবল নবীন-দূর্ব্বাদল-পরিপূর্ণ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র, কুত্রাপি প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষসমূহ, কোথাও নদী বা নির্ঝরতীরস্থ মনোহর কুসুমোদ্যান দর্শন করিয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলাম। কৌতূহল-রূপ দীপ্ত হুতাশন ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; এবং তদনুসারে দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা না করিয়া যতদূর দৃষ্ট হইল ততদূরই মহোৎসাহে ও পরম সুখে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম।

অবশেষে এক সরোবর-তীরস্থ অতি নিবিড় নির্জন নিস্তব্ধ বনখণ্ডে, এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার অত্যুজ্জ্বল প্রসন্ন বদন ও অলৌকিক শান্ত স্বভাব দর্শনে, তাঁহাকে বনদেবতা জ্ঞান করিয়া, বিহিত-বিধানে নমস্কার করিলাম ও তাঁহার পুনঃপুনঃ দর্শনলাভ-দ্বারা নয়নযুগল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলাম। দেখিলাম, তিনি আপনার কপোলপ্রদেশে হস্তার্পণ করিয়া, গগন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসার মানস করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার বাক্য-স্ফুরণ না হইতে, তিনি গাত্রোত্থান করিয়া, সাতিশয় আগ্রহ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"আমি তোমার মানস জানিয়াছি; আমার নাম বিদ্যা; তুমি যে স্থানে যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহার এই পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। যাঁহারা এই রম্য কাননে ভ্রমণ করিতে আইসেন, আমিই তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করি; চল, তোমাকেও সঙ্গে লইয়া যাই।"

আমি তাঁহার এই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, হৃষ্টমনে তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যদেশ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে, অরণ্যের শৈত্য, শোভা ও পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করিয়া, অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দেবি, এ স্থানের নাম কি, এবং এখানে কি কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই বা সম্পন্ন হইয়া থাকে?"

তাহাতে তিনি সত্বর হইয়া উত্তর করিলেন,—"এ বিদ্যারণ্য, এ অরণ্যে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে, অতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এখানে আগমন করেন; কিন্তু ইহার ফল ভোগ করা অতিশয় আয়াস-সাধ্য, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কেহ কেহ দূর হইতে কোন বৃক্ষের উচ্চতা দর্শনমাত্র পরাঙ্মুখ হইয়া প্রতিগমন করেন, কেহ কেহ বা ফল-আহরণের প্রত্যাশায় কতক দূর বৃক্ষারূঢ় হইয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি একবার

এই রমণীয় কাননের ফল ভোগ করিয়াছেন, তিনি আর কদাপি তাহার আস্বাদন বিস্মৃত হইতে পারেন না। আমি তোমাকে ক্রমে ক্রমে সমুদয় দর্শাইতেছি চল। ঐ যে সুদৃশ্য মনোহর বৃক্ষ সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছ, যাহার সতেজ শাখা সমুদয় সুমধুর-রসস্ফীত-ফল-ভরে অবনত হইয়াছে, যাহার স্কন্ধ হইতে সুধাময় মধুধারা-সকল অনবরতই ক্ষরিতেছে ও সুকুমারমতি তরুণ যুবকেরা যাহাতে সুখে আরোহণ করিতেছে, উহার নাম কাব্য-তরু। দেখিয়াছ, অলঙ্কৃতি-রূপা কি অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রমণীয় লতা তাহাকে পরিবেষ্টন-পূর্ব্বক সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষ হইতে কিছুদূরে, যে প্রকাণ্ড তেজস্বী বৃক্ষ দেখিতেছ, সুধীর প্রবীণ ব্যক্তিরা যাহার সেবা করিতেছেন, তাহার নাম জ্যোতিষ।" ইহা কহিয়া বিদ্যাদেবী ঐ বৃক্ষের অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার বাক্যাবসান হইলে, আমি জ্যোতিষ-তরুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত-সমুদয় এক একবার প্রগাঢ়রূপ মনোনিবেশ-পূর্ব্বক ধ্যান-পরায়ণ হইতেছেন, আর বার প্রসন্নবদনে হাস্য করিয়া অতুল আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু আর এক অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ বৃক্ষের মূল মৃত্তিকা-সংযুক্ত নহে; আর এক প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষের স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটিও দৃষ্টি করি নাই। তাহার কোন স্থানের কণামাত্রও ক্ষয় হয় নাই ও কুত্রাপি একটিমাত্রও ছিদ্র কিংবা চিহ্ন নাই। আমি এই অদ্ভুত তরুর বিষয়ে সবিশেষ জানিবার জন্য পরম কৌতূহলী হইয়া, বিদ্যাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন,—"এই সারবান্ অক্ষয় বৃক্ষের নাম গণিত। তুমি কেবল সম্মুখবর্ত্তী জ্যোতিষ-তরুর মূল ইহাতে সংবদ্ধ দেখিতেছ; প্রদক্ষিণ করিয়া দেখ, অন্যান্য কত আশ্চর্য্য বৃক্ষ ও লতা ইহার স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া, তদুপরি প্রতিষ্ঠিত আছে।" বস্তুতঃ আমি বেষ্টন করিয়া দেখিলাম, তাঁহার কথা প্রামাণিক বটে; শাখা, প্রশাখা ও বৃক্ষরুহ-সংবলিত এক গণিত-বৃক্ষ অর্দ্ধকানন ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথপ্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ-বচনে বলিলেন,—"সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষলতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটা কলম তোমাদিগের

দেশ হইতেও আহরণ করা গিয়াছে। দেখ, ভিন্ন-জাতীয় লোকে এই কাননে অবস্থিতি করিয়া, উৎসাহ ও যত্নসহকারে তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি সাধন করিয়াছে। আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়; কারণ, যতগুলি বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাহাদিগের উপর সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদয়ই ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক-জাতীয়, তাহার নাম স্মৃতি; আর বাম দিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন।"

আমি ঐ উভয়-জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। ঐ সমস্ত সহজেই অসার, রন্ধ্রপরিপূর্ণ, কোনটা বা নিতান্ত শূন্যগর্ভ, তাহাতে আবার সমুচিত যত্নসহকারে পরিপালিত না হওয়াতে, অতিশয় দুরবস্থ হইয়া রহিয়াছে। দেখিলাম, দক্ষিণ দিকে সমুদয় বৃক্ষ যদিও সম্যগ্রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্ন-শাখ হইয়াছে, কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই; বোধ হইল, যেন প্রবল ঝঞ্ঝাবাত-দ্বারা সমুদয় বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। বাম দিকের কোন বৃক্ষের কেবল স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটির বা সমুদয় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম,—কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা সহকারে মহাকোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপ শারীরস্থান, রসায়ন, চিকিৎসা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় পরম রমণীয় তরু-সমূহ দর্শন করিয়া, সাতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম, এবং অতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া, পথিমধ্যে পরমারাধ্যা বিদ্যাদেবীকে কহিলাম—"দেবি! আমি তোমার প্রসাদে অদ্য অনুপম সুখ অনুভব করিলাম। ভূমণ্ডলে এত নির্ম্মল সুখ-ধাম আর কোথাও নাই। আমার বোধ হয়, এ স্থানে বিশুদ্ধ-চিত্ত সচ্চরিত্র ব্যক্তিরাই আগমন করে, অপর লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।"

এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি বিষণ্ণবদনে কহিলেন,—"তুমি যথার্থ বিবেচনা করিয়াছ; এ স্থান ধর্ম্মশীল সাধু ব্যক্তিদিগেরই যোগ্য বটে, এবং পূর্ব্বে ইহা তাদৃশই ছিল। তখন কেবল পরোপকারী, তত্ত্ব-পরায়ণ, পুণ্যাত্মা আচার্য্য-সকলই

এই পরম পবিত্র কাননে উপবেশন করিয়া, অতুল আনন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু এক্ষণে এ বনে নানা বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছে; পাপ রূপ পিশাচের উপদ্রবে ইহা অতি সঙ্কট-স্থান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, বিজাতীয়-বেশধারী অভিমান স্ব-মস্তক উন্নত ও গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া, অত্যন্ত উগ্রভাবে সকলের উপর খরতর দৃষ্টিপাত করিতেছে, ও স্বকীয় পুত্র দম্ভকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহাশ্লাঘা প্রকাশ-পূর্ব্বক সগর্ব্ব-পদবিক্ষেপ করিতেছে। উহাদের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখিয়া কি তোমার বোধ হইতেছে না যে, উহারা মনে মনে বিশ্ব-সংসার তুচ্ছ ভাবিতেছে? তৎপার্শ্বে দৃষ্টিপাত কর, ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে সঙ্গে লইয়া, ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উহা অভিমানের অত্যন্ত অনুগত। যদি কেহ অভিমানকে স্পর্শ মাত্র করে, ক্রোধ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া, তাহার বৈর-নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হয়। এ দিকে অবলোকন কর, একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস দেখিতে দেখিতে আপনার শরীর বৃদ্ধি করিয়া ফেলিল। এক্ষণে ও যেরূপ স্থূলকায় হইয়া উঠিল, আমার বোধ হইতেছে, বিশ্ব-সংসার ভোজন করিলেও উহার উদর পূর্ণ হয় না। উহার নাম কি জান? লোভ। বিশেষতঃ কাব্য-তরুতলে যে দুই প্রচণ্ড পিশাচ দণ্ডায়মান দেখিতেছ, উহাদের অত্যাচারে এ স্থানের অতিশয় অপযশ ঘোষণা হইয়াছে; উহাদের নাম কাম ও পান-দোষ। এককালে এই অপূর্ব্ব আনন্দ-কাননে নিষ্কলঙ্ক দাম্পত্য-প্রেমেরই প্রাদুর্ভাব ছিল; তৎকালে অনেকানেক প্রধান ধর্ম্ম তাঁহার সহচর ছিল, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ঐ ঘনপল্লবাবৃত নিবিড় বৃক্ষের অন্তরালে যে এক পরম-সুন্দরী রমণীকে দৃষ্টি করিতেছ, উহার ন্যায় কুৎসিত স্ত্রী আর দ্বিতীয় নাই। উহার গাত্রে যে কত ব্রণ, কত ক্ষত ও কলঙ্ক আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেবল কতকগুলি বেশভূষা-কল্পনা-দ্বারা তৎসমুদয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আপনাকে সজ্জীভূত করিয়া দেখাইতেছে; উহার নাম কপটতা।"

সমুদয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া আমি বিষাদ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম,—এ অসার সংসার স্বভাবতঃ শোক-দুঃখেই পরিপূর্ণ; যদিও দুই-একটি সুখময় পুণ্যধাম ছিল, তাহাতে এত বিঘ্ন ঘটিয়াছে। যাহা হউক, আপনার কর্ত্তব্য-সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বদুঃখ-নিবারিণী সন্তাপ-নাশিনী বিদ্যাদেবীর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া

গমন করিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একবার পশ্চাৎ অবলোকন করিয়া দেখি, যে সকল রাক্ষস-পিশাচের অহিত আচরণ দৃষ্টি করিয়া আসিলাম, তাহারাই আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহাদিগের অতি কুৎসিত বীভৎস আকার দর্শন করিয়াছিলাম, এখন দেখি, তাহারা পরম মনোহর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছে। কি জানি, তাহারা কি কুমন্ত্রণা দেয়, এই আশঙ্কায় পরম হিতৈষিণী বিদ্যাদেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে অভয় দিয়া, ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা নামে দুই মহাবল-পরাক্রান্ত প্রহরীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"তোমরা দুইজনে ইহার দুই পার্শ্বে থাক, কোন শত্রু যেন ইহার নিকটস্থ না হইতে পারে।"

এইরূপে আমরা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখিতে পাইলাম। তখন বিদ্যা অতি প্রসন্নবদনে সুমধুর হাস্য করিয়া কহিলেন,—"এই ক্ষুদ্র প্রান্তরের শেষে যে মনোহর গিরি দর্শন করিতেছ, ঐ তোমার লক্ষিত স্থান; ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলেই তুমি চরিতার্থ হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি পরম-পুলকিতচিত্তে অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চিরাকাঙ্ক্ষিত ফল-প্রত্যাশায় মহোৎসাহ-সহকারে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম, এবং অবিলম্বে পর্ব্বত-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তথায় আরোহণ করিবার এক পথ প্রাপ্ত হইলাম। ঐ পথের এক পার্শ্বে এক দৃঢ়ব্রতা সুশীলা স্ত্রী এবং অন্য পার্শ্বে এক বহুপরিশ্রমী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহারা যাত্রী-দিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম,—স্ত্রীর নাম শ্রদ্ধা, আর পুরুষের নাম যত্ন।

ঐ পর্ব্বত আরোহণ করা অতিশয় ক্লেশকর বোধ হইল। অতি কষ্টে কিছু দূরে গমন করিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিলাম,—সম্প্রতি এই স্থানে অবস্থিতি করি। বিদ্যাদেবী স্বকীয়া মহীয়সী শক্তির দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া কহিলেন,—"হে প্রিয়তম! এ পর্ব্বতের পার্শ্ব-দেশে কোন স্থানে স্থির থাকিবার সম্ভাবনা নাই; যদি আর উপরে না উঠ, তবে অবশ্যই অধোগমন করিতে হইবে, অতএব সাবধান,—সাবধান।" আমি তাঁহার এই সদুপদেশ শুনিয়া, চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। পরন্তু সুখের বিষয় এই যে, যতই আরোহণ করিতে লাগিলাম, ততই ক্লেশের লাঘব হইয়া সুখের বৃদ্ধি হইয়া আসিল।

অবশেষে যখন পর্ব্বতোপরি উত্তীর্ণ হইলাম, তখন কি অনির্ব্বচনীয় অনুপম সুখানুভবই হইল। তথাকার, সুশীতল-মারুত-হিল্লোলে শরীর পুলকিত হইতে লাগিল। তথায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ-বিসংবাদ, চৌর্য্য, অত্যাচার—এ সকলের কিছুই নাই, কেবল আরোগ্য ও আনন্দ অবিরত বিরাজ করিতেছে। ইহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণ অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইল। বোধ হইল, বিশ্বসংসারে এমন রম্য স্থান আর দ্বিতীয় নাই।

কিছুকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণানন্তর দূর হইতে এক অপূর্ব্ব সরোবর দেখিতে পাইলাম, এবং তদ্দর্শনার্থে আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখি, কতকগুলি পরম-পবিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা সরোবর-তটে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের অসামান্য রূপ-লাবণ্য, প্রফুল্ল পবিত্র মুখশ্রী এবং সারল্য ও বাৎসল্য-স্বভাব অবলোকন করিয়া, অপরিমেয় প্রীতি লাভ করিলাম। আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহাদিগের শরীরে কোন অলঙ্কার নাই, অথচ অনলঙ্কারই তাঁহাদের অলঙ্কার হইয়াছে। বোধ হইল যেন, আনন্দ-প্রতিমাগুলি ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম,—ইঁহারা দেবকন্যা হইবেন, তাহার সংশয় নাই। তখন বিদ্যাদেবী সাতিশয় অনুকম্পা-পুরঃসর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ; ইঁহারা দেবকন্যাই বটেন, এবং এই ধর্ম্মাচল ইঁহাদের বাসভূমি। ইঁহাদের কাহারও নাম দয়া, কাহারও নাম ভক্তি, কাহারও নাম ক্ষমা, কাহারও নাম অহিংসা, কাহারও নাম মৈত্রী ইত্যাদি। সকলের নিজ নিজ গুণানুসারে নামকরণ হইয়াছে। ইঁহাদের রূপ ভুবনবিখ্যাত। ইঁহারা যে কি পর্য্যন্ত সুশীল, তাহা কি বলিব। বিদ্যারণ্য-যাত্রীদিগের মধ্যে যাঁহারা এই ধর্ম্মাচল আরোহণ করেন, তাঁহাদিগের শ্রম সার্থক ও জন্ম সফল। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও জীবন পবিত্র কর।"

বিদ্যাদেবীর উপদেশানুসারে আমি উল্লিখিত শান্তি-সরোবরে অবগাহন করিয়া, অভূতপূর্ব্ব অতি নির্ম্মল আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি,—সেই সুন্দর মারুতসেবিত যমুনা-কূলেই শায়িত রহিয়াছি।

যশাংসি পুষ্পাণি

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

[১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ইনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের ও পরে হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। শিক্ষা-সমাপনের পর ইনি শিক্ষাবিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অস্থায়ী ভাবে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। রাজসরকার ইঁহাকে সি. আই. ই. উপাধি দান করেন। বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক বলিয়াই ইঁহার খ্যাতি বঙ্গবিশ্রুত। ইনি পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচারপ্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি অনেকগুলি প্রবন্ধের পুস্তক এবং অনেকগুলি বিবিধবিষয়ের ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। লোকশিক্ষা, বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন, ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যান ও প্রচার, সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তার, ঐতিহাসিক গবেষণা ও স্বাধীন চিন্তার প্রবর্ত্তনে ইঁহার প্রতিভার দান অপরিসীম। ইনি এডুকেশন গেজেট পত্রিকার প্রবর্ত্তক। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।]

সদাচার-বৃক্ষের পুষ্প যশ। অর্থাৎ সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তি লোকের নিকট যশোভাগী হইয়া থাকেন। এই কথাটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের ন্যায় সহজেই বোধ-গম্য। সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তি অবশ্যই জনসাধারণের নিকট প্রশংসা-ভাজন হইবেন; কারণ, যে আচার-ব্যবহার পালন করিয়া চলিবার নিমিত্ত সকলেই আদিষ্ট, যিনি তাহা পালন করেন, তিনি সুখ্যাতি না পাইবেন কেন? বিদ্যালয়ের যে বালকটি ভাল করিয়া পড়াশুনা করে, সে পারিতোষিক পায়। সদাচার-পরায়ণ হইলে লোকের নিকটে যে যশোলাভ হয়, তাহা ঐ পারিতোষিকেরই সদৃশ। ইউরোপীয়েরাও বলেন যে, যাহা সাধারণের অভিমত তাহার অনুযায়ী হইয়া চলিলেই সুখ্যাতি এবং না চলিলেই নিন্দা হয়। এই জন্য ইউরোপীয়-দিগের মধ্যে যদিও শাস্ত্রাচার নাই, তথাপি যে সময়ে যে আচার প্রবর্ত্তিত থাকে, তাঁহারা ঘুণাক্ষরেও তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না।

কিন্তু সদাচারের পুষ্প যশ বলিয়া যে কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য আরও কিছু বিশেষ বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। দেখা যায় যে, যশের কারণ মুখ্যতঃ তিনটী—(১) অনন্যসাধারণ গুণশালিতা; (২) পরোপকার-

পরায়ণতা; (৩) নম্রতা। ইহার মধ্যে প্রথমটী অর্থাৎ অসাধারণ গুণ-শালিতাটি অধিক পরিমাণেই প্রকৃতি-প্রদত্ত বস্তু। উহা কোনপ্রকার সাধারণ শিক্ষার আয়ত্ত হয় না। প্রত্যুত, যদি শিক্ষার তেমন দোষ থাকে, তবে উহার ব্যাঘাত হইয়া যায়। (২) পরোপকার-প্রবণ ব্যক্তির হৃদয়ে পর-দুঃখ-কাতরতা থাকে। তাহাতে সমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি উপলব্ধ হয়। পরোপকারী ব্যক্তিকে কেহ স্বার্থপর বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তিনি সামাজিক বন্ধনের মৌলিক সূত্রেই একান্ত সম্বদ্ধ। পরোপকারী ব্যক্তি সমাজের ভক্ত, অতএব তিনি সমাজেরও প্রীতিপাত্র। সদাচার লোককে পর-দুঃখ-কাতর এবং পরোপকারপ্রবণ করে। ইহা অতিথিসৎকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার দানকার্য্যে উন্মুখতা জন্মায়। এই জন্য সদাচার হইতে যশের উদয় হয়। (৩) পরোপকার অপেক্ষাও নম্রতা গুণটী যশোলাভের প্রশস্ততর পথ। যিনি পরোপকার করিয়া অবিনীতভাব ধারণ করেন, আত্মশ্লাঘায় বিচেতন হয়েন, উপকৃতের আত্মগৌরব বিনষ্ট করেন, তাহার প্রতি স্বামিভাব ধারণ করেন, অথবা তাহার পীড়ন করেন, তাঁহার যশ মলিন হইয়া যায়। কিন্তু যিনি লোকের প্রতি নম্র এবং বিনয়ী হইয়া চলেন এবং আপনার দীনতা এবং অকিঞ্চনতা প্রদর্শন করেন, তিনি পরের উপকার করুন বা না করুন প্রায় লোকের প্রীতি এবং প্রশংসার ভাজন হইয়া থাকেন।

দীনভাবের প্রতি লোকের এইপ্রকার অনুগ্রহ-প্রবণতা দেখিয়া শঠেরা অনেক সময়েই এক প্রকার ভাক্ত দীনভাব খ্যাপন করিয়া চলে। কেহ বা দারিদ্র্য, কেহ বা অস্বাস্থ্য, কেহ বা অদৃষ্টচক্রের প্রতি ভীতিখ্যাপনপর্ব্বক আপনাদিগের আভ্যন্তরিক গর্ব্ব এবং স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং প্রায়ই কিয়ৎ পরিমাণে লোকের অনুরাগ এবং অনুগ্রহ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। আমি একটি লোককে জানিতাম, তিনি আপনার অসুস্থাবস্থার কোন সংবাদ না দিয়া কখনও কাহাকেও একখানি পত্র লিখিতে পারিতেন না। অপর একজনকেও জানিতাম তাঁহার ধন-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হইয়াছিল। তিনি স্বভাবতঃ অতীব অসূয়াবান্ এবং মৎসরী ছিলেন। কিন্তু কোনরূপে না কোনরূপে আপনার একটা কষ্টের কথা না বলিয়া কখন কাহারও সহিত বাক্যালাপ সমাপন করিতেন না। তিনি লোকানুগ্রহের একান্ত

ভিখারী হইয়াছিলেন, এবং অনেকের স্থানেই অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ঐপ্রকার ভাবটাই দোষ। কিন্তু অকিঞ্চনতার ভাবটি মানবের অবস্থা-সঙ্গত বলিয়াই তাহার ভাবও লোকের চক্ষে ভাল লাগে। সমাজের প্রতি নম্রতাই আমাদিগের মনের স্থায়িভাব হওয়া বিধেয়। আমরা অপরের নিকট জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অপরিশোধ্যরূপে ঋণী হইয়া থাকি। সমাজ আমাদিগকে যাহা কিছু দিয়াছে, আমরা তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া করি এবং তাহাই পরস্পরকে দিয়া পরস্পরের উপকার সাধন করি। উহাতে নিজের গৌরবের, শ্লাঘার বা স্বামিভাব-ধারণের কোন কারণই থাকে না—প্রত্যুত, অন্যের উপকার করার সুখ এবং সামর্থ্য প্রাপ্ত হওয়াতে সমাজের নিকট পূর্ব্ব ঋণ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। এই ঋণভারে নম্র হইয়া থাকাই মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী। পিতার সমীপে পুত্রের যে নম্রতা, সকল লোকেরই সমাজের নিকট সেই নম্রতা ন্যায়সঙ্গত। নম্রভাবেই সমাজের নিকট অপরিশোধ্য ঋণের স্বীকার করা হয়, এবং সেই স্বীকার-নিবন্ধন ঋণদায় হইতে নিষ্কৃতি এবং যশই সেই নিষ্কৃতির প্রমাণপত্র।

আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত সদাচার উল্লিখিতরূপ নম্রভাবের পোষক এবং তাহার অভ্যাস-জনক। শাস্ত্র গৃহি-ব্যক্তির অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে ঋণের পরি-শোধের জন্য অথবা কৃত পাপের ক্ষালনের জন্য অনুষ্ঠেয়, ইহাই বলিয়াছেন। ঋণের পরিশোধ করায় অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করায় শ্লাঘার উদ্রেক হইতে পারে না, কেবল মনের উদ্বেগ-শান্তি হইতে পারে। আর বিধির প্রতি-পালন করাই ধর্ম্মাচরণ, শাস্ত্র এই কথাও ভূয়োভূয়ঃ বলাতে বশ্যভাবের শিক্ষা এবং অভ্যাস হয়। এই সকল কারণে শাস্ত্রাচার বা সদাচার নম্রতার সাধক। যাহা নম্রতার সাধক তাহা অবশ্যই যশেরও প্রাপক হয়।

পরন্তু আচারবান্ অনেকানেক ব্যক্তিকে সমধিক অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক হইতে দেখা যায়। ইঁহারা পুণ্যকর্ম্মের বোঝা মাথায় লইয়া যেন মট্ মট্ করিয়া চলেন। বস্তুতঃ ইঁহাদিগের শাস্ত্রাচার ভাবদুষ্ট বলিয়াই ওরূপ হয়। ঐ সকল লোকে শাস্ত্রোক্ত অর্থবাদাদির প্রতি সমধিক লক্ষ্য করিয়া আপনাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মগুলি যে কেবল ঋণের পরিশোধক অথবা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র তাহা

ভাবেন না। ফলের লোভ অধিক বলিয়াই ইঁহাদের আচার রজোদোষে দুষ্ট হইয়া পড়ে।

ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে শাস্ত্রাচার অপরিজ্ঞাত এবং অনভ্যস্ত ; এইজন্য তাঁহাদিগের মনোমধ্যে বশ্যভাবের ন্যূনতা এবং তাঁহাদের ব্যবহারে নম্রতার ত্রুটি জন্মিয়া যাইতেছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে গুণগুলি আছে, সেগুলিও লোকের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে সমুদিত হয় না এবং তাঁহারা সুখ্যাতি-ভাজন হইতে পারেন না। আমার বোধ হয় যে, ইংরাজী হইতে উঁহারা যে 'নৈতিক সাহসে'র নামটি শুনিয়াছেন, তাহাতে অনেকটা অনিষ্টের উৎপত্তি হইয়াছে। উঁহারা বীরপ্রকৃতিক ইংরাজের শিষ্য। সুতরাং বীরস্বভাবসুলভ সাহস-ধর্ম্মটির বড়ই পক্ষপাতী। এইজন্য সাহসের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত দেশপ্রচলিত আচার-ব্যবহারের অপালনপূর্ব্বক দেশাচারকে তাচ্ছিল্য এবং আত্মসমাজকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।

কিন্তু একটু নিবিষ্টমনে দেখিলেই বুঝা যায় যে, এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারে না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরাজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়, উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরাজের অনুকরণে সাহস নাই—উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে, দেশের যে সকল হিন্দুসন্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরস্ক-সুলতানের অধীনে চাকরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় লোকে খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং চীন-সাম্রাজ্যের সৈনিককার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মার্কিন এবং ইউরোপীয় পুরুষেরা আপনাদের নাম এবং পরিচ্ছদ চীনীয় লোকের অনুরূপ করিয়া লয়, তাহাদেরও যেমন 'নৈতিক সাহস' প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরাজ-রাজের অধিকারকালে যে ভারতবাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরাজী আচার গ্রহণ করে, তাহারও

নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না। নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

নিজের ধর্ম্ম যদি বিগুণও হয় তথাপি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বহু মঙ্গলজনক ; স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়ের হেতুভূত। এস্থলে ধর্ম্ম-শব্দের অর্থ যে আচার, তাহা প্রকরণদ্বারা সিদ্ধ, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা নাই। কিন্তু ইহার একটি কথা বড়ই গুরুতর। মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ের বস্তু কি? জীবের সকল ভয়ের একমাত্র মূল মৃত্যুভয়। কিন্তু এস্থলে সেই মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষাও একটা বেশী ভয়ের বস্তু আছে বলা হইয়াছে। সেটি পাপের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র মৃত্যু অপেক্ষাও পাপকে অধিক ভয় করিতে বলিলেন। এমন নৈতিক সাহস কি আর কোথাও শিক্ষিত হইয়াছে? নবীন ইংরাজী-শিক্ষিতেরা দেখুন যে, তাঁহাদিগের দেশের পূর্ব্বশিক্ষাদাতৃগণের অপেক্ষা কেহই অধিকতর নির্ভীক হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অনুকরণেচ্ছা নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ নয়, অজ্ঞতা এবং 'নৈতিক ভীরুতা'রই পরিচায়ক মাত্র।

যে শাস্ত্রাচার মনুষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যগুলিকে ঋণের পরিশোধ বা কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যে শাস্ত্রাচার ঐকান্তিক বশ্যতার অভ্যাস করাইয়া নম্রতা এবং অকিঞ্চনতাকে চিত্তের স্থায়িভাবরূপে পরিণত করে, যে শাস্ত্রাচার মৃত্যু অপেক্ষা পাপের ভয় বর্দ্ধিত করিয়া দেয়, তাহা অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই। কীর্ত্তি এবং যশ সেই শাস্ত্রাচার বা সদাচারের ক্ষণ-স্থায়ী শোভা এবং আনন্দদায়ক প্রসূনমাত্র।

পালামৌ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ এবং যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ-পরগণার কাঁটালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, পরে স্পেশাল সাব-রেজিষ্ট্রারের পদ লাভ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনাভঙ্গী ছিল স্বচ্ছ, সরস ও প্রাঞ্জল। ইঁহার রচিত 'পালামৌ,' 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ আদরলাভ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে কয়েক বৎসর ইনি 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

অনেক দিনের কথা লিখিতে বসিয়াছি, সকল কথা স্মরণ হয় না। পূর্ব্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম, এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি, এমন নহে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্জ্জন পর্ব্বত, কুসুমিত কানন প্রভৃতি যে চক্ষুতে দেখিয়াছিলাম, সে চক্ষু আর নাই। এখন পর্ব্বত কেবল প্রস্তরময়, বন কেবল কণ্টকাকীর্ণ, অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়া স্মরণ হয়। অতএব যাঁহারা বয়োগুণে কেবল শোভা-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ভালবাসেন, বৃদ্ধের লেখায় তাঁহাদের কোন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইবে না।

যখন আমার পালামৌ যাওয়া একান্ত স্থির হইল, তখন জানি না যে, সে স্থান কোন্ দিকে, কত দূরে; অতএব ম্যাপ দেখিয়া পথ স্থির করিলাম। হাজারিবাগ হইয়া যাইতে হইবে, এই বিবেচনায় ডাক-গাড়ী ভাড়া করিয়া রাত্রি দেড় প্রহরের সময়ে রাণীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব্বপারে গাড়ী থামিল। নদী অতি ক্ষুদ্র, তৎকালে অল্পমাত্র জল ছিল, সকলেই হাঁটিয়া পার হইতেছে, আমার গাড়ী ঠেলিয়া পার করিতে হইবে, অতএব গাড়োয়ান কুলি ডাকিতে গেল।

পূর্ব্বপার হইতে দেখিলাম যে, অপর পারে ঘাটের উপরেই একজন সাহেব বাঙ্গলোয় বসিয়া পাইপ টানিতেছেন, সম্মুখে একজন চাপরাসী একরূপ গৈরিক মৃত্তিকাহস্তে দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি পারার্থ সেই ঘাটে আসিতেছে,

চাপরাসী তাহার বাহুতে সেই মৃত্তিকা-দ্বারা কি অঙ্কপাত করিতেছে। পারার্থীর মধ্যে বন্য লোকই অধিক, তাহারা মৃত্তিকারঞ্জিত আপন আপন বাহুর প্রতি আড়নয়নে চাহিতেছে আর হাসিতেছে, আবার অন্যের অঙ্গে সেই অঙ্কপাত কিরূপ দেখাইতেছে তাহাও এক এক বার দেখিতেছে, শেষে হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া নদীতে নামিতেছে। তাহাদের ছুটাছুটিতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া কূলের উপরে উঠিতেছে।

আমি অন্যমনস্কভাবে এই রঙ্গ দেখিতেছি, এমন সময়ে কুলিদের কতকগুলি বালক-বালিকা আসিয়া আমার গাড়ী ঘেরিল, এবং 'সাহেব, একটি পয়সা,' 'সাহেব, একটি পয়সা,' এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ধুতি-চাদর পরিয়া আমি নিরীহ বাঙ্গালী বসিয়া আছি, আমায় কেন সাহেব বলিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বলিলাম, "আমি সাহেব নহি।" একটি বালিকা আপন ক্ষুদ্র নাসিকাস্থ অঙ্গুরীবৎ অলঙ্কারের মধ্যে নখ নিমজ্জন করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি সাহেব।" আর একজন জিজ্ঞাসা করিল, "তবে তুমি কি?" আমি বলিলাম, "আমি বাঙ্গালী।" সে বিশ্বাস করিল না, বলিল, "না, তুমি সাহেব।" তাহারা মনে করিয়া থাকিবে যে, যে গাড়ী চড়ে সে অবশ্য সাহেব।

বরাকর হইতে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায়। বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস, মৃত্তিকার সামান্য স্তূপ দেখিলেই তাহাদের আনন্দ হয়, অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া যে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? বাল্যকালে পাহাড়-পর্ব্বতের পরিচয় অনেক শুনা ছিল, বিশেষতঃ একবার এক বৈরাগীর আখড়ায় চূণকাম-করা এক গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া পাহাড়ের আকার অনুভব করিয়া লইয়াছিলাম। বরাকরের নিকটস্থ পাহাড়গুলি দেখিয়া আমার সে বাল্যসংস্কারের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল।

অপরাহ্নে দেখিলাম, একটি সুন্দর পর্ব্বতের নিকট দিয়া গাড়ী যাইতেছে। এত নিকট দিয়া যাইতেছে যে, পর্ব্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের ছায়া পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাইবেন?" আমি বলিলাম, "একবার এই পর্ব্বতে যাইব।" সে হাসিয়া বলিল, "পাহাড় এখান হইতে অনেক

দূর, আপনি সন্ধ্যার মধ্যে তথায় পৌঁছিতে পারিবেন না।" আমি এ কথা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না; আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, পাহাড় অতি নিকট, তথায় যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগিবে না, অতএব গাড়োয়ানের নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। পাঁচ মিনিটের স্থানে পনেরো মিনিট কাল দ্রুতপাদবিক্ষেপে গেলাম, তথাপি পর্ব্বত পূর্ব্বমত সেই পাঁচ মিনিটের পথ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পর্ব্বত-সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় কঠিন। ইহার প্রমাণ পালামৌ গিয়া আমি পুনঃপুনঃ পাইয়াছিলাম।

পর দিবস প্রায় দুই প্রহরের সময়ে হাজারিবাগে পৌঁছিলাম; তথায় গিয়া শুনিলাম, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে। প্রায় দুই দিবস আহার হয় নাই, অতএব আহার-সম্বন্ধীয় কথা শুনিবামাত্র ক্ষুধা অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। যিনি আমার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন, তিনি আমার আগমনবার্ত্তা কিরূপে জানিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিবার আর অবকাশ হইল না, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাটীতে গাড়ী লইয়া যাইতে অনুমতি করিলাম। যাঁহার বাটীতে যাইতেছি, তাঁহার সহিত আমার কখনও চাক্ষুষ পরিচয় হয় নাই; তাঁহার নাম শুনিয়াছি, সুখ্যাতিও যথেষ্ট শুনিয়াছি, সজ্জন বলিয়া তাঁহার প্রশংসা সকলেই করে। কিন্তু সে প্রশংসায় কর্ণপাত বড় করি নাই, কেন না, বঙ্গবাসিমাত্রই সজ্জন; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা; যাহা নিন্দা শুনা যায়, তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ ও বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়,—কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদের পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়,—কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখ ভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ প্রতিবাসীরা। যাঁহাদের প্রতিবাসী নাই, তাঁহাদের ক্রোধ নাই। তাঁহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রমপার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে। প্রথম দিনে প্রতিবাসীর ছাগলে পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করিবে, দ্বিতীয় দিনে প্রতিবাসীর গোরু আসিয়া কমণ্ডলু ভাঙ্গিবে, তৃতীয় দিনে প্রতিবাসীর গৃহিণী আসিয়া ঋষিপত্নীকে আপনার অলঙ্কার দেখাইবে। তাহার

পরই ঋষিকে ওকালতী পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর দরখাস্ত করিতে হইবে।

এক্ষণে সে সকল কথা যাক। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাঁহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে, তাহা কোন ধনবান্ ইংরাজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম হইল। পরক্ষণেই সে ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকত বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে, আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন; না চিনিয়া যাঁহার অভিবাদন সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাড়ীর কর্ত্তা। তিনি শতলোক-সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের উপর পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অতি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধ হয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্ম্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই অধিকাংশ বৃদ্ধকেই সুন্দর দেখি। কোন মহানুভব ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

* * *

রাঁচি হইতে পালামৌ যাইতে যাইতে যখন বাহকগণের নির্দ্দেশমত দূর হইতে পালামৌ দেখিতে পাইলাম, তখন আমার বোধ হইল যেন, মর্ত্ত্যে মেঘ করিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। ঐ অন্ধকার মেঘমধ্যে এখনই যাইব, এই মনে করিয়া আমার কতই আহ্লাদ হইতে লাগিল। কতক্ষণে পৌঁছিব মনে করিয়া আবার কতই ব্যস্ত হইলাম। পরে চারি-পাঁচ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আবার পালামৌ দেখিবার নিমিত্ত পাল্কী হইতে অবতরণ করিলাম। তখন আর মেঘভ্রম হইল না, পাহাড়গুলি স্পষ্ট

চেনা যাইতে লাগিল ; কিন্তু জঙ্গল ভাল চেনা গেল না। তারপর আরও দুই-এক ক্রোশ অগ্রসর হইলে তাম্রাভ অরণ্য চারিদিকে দেখা যাইতে লাগিল, কি পাহাড়, কি তলস্থ স্থান, সমুদয় যেন মেষদেহের ন্যায় কুঞ্চিত লোমরাজি-দ্বারা সর্ব্বত্র সমাচ্ছাদিত বোধ হইতে লাগিল। শেষে আরও কতকদূর গেলে বন স্পষ্ট দেখা গেল। পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে, সর্ব্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন—ঘন নিবিড় বন।

পরে পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগনায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীর অন্তরগ্নি একদিনেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম সকল তরঙ্গই পূর্ব্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল। এইরূপ পাহাড় লাতেহার-গ্রামপার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায় ; এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কালো পাথর ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল।

একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে আমার একটা 'নেমোকহারাম' ফরাসিস্ কুকুর আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি ক্রোধে চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিধ্বনিত হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্ব্বমত হ্রস্ব-দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল ; আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ পূর্ব্ববৎ পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া উচ্চ-নীচ হইতে লাগিল। এইবার বুঝিলাম, শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়, সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেইখানে উঠিতে-নামিতে থাকে। কিন্তু শব্দ

দীর্ঘকাল কেন স্থায়ী হয়, যতদূর পর্য্যন্ত সেই স্তরটি আছে, ততদূর পর্য্যন্ত কেন যায়, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

আর একটি পাহাড় দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম, সেটি একশিলা, সমুদয়ে একখানি প্রস্তর। তাহাতে একেবারে কোথাও কণামাত্র মৃত্তিকা নাই। তাহার এক স্থান অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটার উপর এক অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে। তখন মনে হইতেছিল, অশ্বত্থ বৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর একদিন এই অশ্বত্থ গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল; তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।

এক্ষণে সে সকল কথা যাউক, প্রথম দিনের কথা দুই একটি বলি। অপরাহ্নে পালামৌয়ে প্রবেশ করিয়া উভয়পার্শ্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে দেখিতে বনমধ্য দিয়া যাইতে লাগিলাম। বাঁধা পথ নাই, কেবল এক সংকীর্ণ গোপথ দিয়া আমার পাল্কী চলিতে লাগিল, অনেকস্থলে উভয়পার্শ্বস্থ লতা-পল্লব পাল্কী স্পর্শ করিতে লাগিল, বর্ণনায় যেরূপ "শাল-তাল-তমাল-হিন্তাল" শুনিয়াছিলাম, সেরূপ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাল, হিন্তাল একেবারেই নাই, কেবল শালবন। অন্য বন্যগাছও আছে। শালের মধ্যে প্রকাণ্ড গাছ একটিও নাই, সকলগুলিই আমাদের দেশীয় কদম্ব বৃক্ষের মত, না হয় কিছু বড়, কিন্তু তাহা হইলেও জঙ্গল অতি দুর্গম, কোথাও তাহার ছেদ নাই, এইজন্য ভয়ানক। মধ্যে মধ্যে যে ছেদ আছে, তাহা অতি সামান্য। এইরূপ বন দিয়া যাইতে যাইতে একস্থানে হঠাৎ কাষ্ঠঘণ্টার বিস্ময়কর শব্দ কর্ণগোচর হইল, কাষ্ঠঘণ্টা পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে দেখিয়াছিলাম। গৃহপালিত পশু বনে পথ হারাইলে, শব্দানুসরণ করিয়া তাহাদের অনুসন্ধান করিতে হয়, এইজন্য গলঘণ্টার উৎপত্তি। কাষ্ঠঘণ্টার শব্দ শুনিলে প্রাণের ভিতর কেমন করে। পাহাড়জঙ্গলের মধ্যে সে শব্দ আরও যেন অবসন্ন করে; কিন্তু সকলকে করে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

পরে দেখিলাম, একটি মহিষ সভয়ে মুখ তুলিয়া আমার পাল্কীর প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহার গলায় কাষ্ঠঘণ্টা ঝুলিতেছে। আমি ভাবিলাম, পালিত মহিষ যখন নিকটে তখন গ্রাম আর দূরে নহে। অল্প বিলম্বেই অর্দ্ধশুষ্ক-

তৃণাবৃত একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দেখা গেল, এখানে সেখানে দুই একটি মধুক বা মৌয়াবৃক্ষ ভিন্ন সে প্রান্তরে গুল্ম কি লতা কিছুই নাই, সর্ব্বত্র অতি পরিষ্কার। পর্ব্বতচ্ছায়ায় সে প্রান্তর আরও রম্য হইয়াছে; তথায় কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনও দেখি নাই, সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকীর পরিবর্ত্তে এক একখানি গোল আরসী, পরিধানে ধড়া; কর্ণে বনফুল, কেহ মহিষ-পৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে; কেহ বা মহিষ-পৃষ্ঠে বসিয়া আছে; কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। তাহাদিগকে যেন ব্রজ-গোপাল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে ছেলে-গুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল। চারিদিকে কালো পাথর, পশুও পাথুরে, তাহাদের রাখালও সেইরূপ।

এই অঞ্চলে প্রধানতঃ কোলের বাস। কোলেরা বন্য জাতি; খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ,—দেখিতে কুৎসিত কি রূপবান্, তাহা আমি মীমাংসা করিতে পারি না। যে সকল কোল কলিকাতায় আইসে বা চা-বাগানে যায়, তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান্ দেখি নাই, বরং অতি কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রই রূপবান্, অন্ততঃ আমার চোখে। বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

* * *

নিত্য অপরাহ্ণে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম; তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলেই আমি অস্থির হইতাম; কেন, তাহা কখনও ভাবিতাম না; পাহাড়ের কিছুই নূতন নাই; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমার সেখানে যাইতে হইত, জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে; যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময়ে কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে। জলে যে যাইতে পারিল না, সে অভাগিনী; সে গৃহে বসিয়া দেখে, উঠানে ছায়া পড়িতেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রঙ ফিরিতেছে; বাহির হইয়া সে দেখিতে পাইল না,—তাহার কত দুঃখ। বোধ

হয়, আমিও পৃথিবীর রঙ-ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

যেরূপ নিত্য লাতেহার পাহাড়ে যাইতাম, সেইরূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি, একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম, যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চিত ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং ইহা ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এক কালে এইরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

আমি যখন নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গোরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জলগ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "চল, তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট-পেণ্টালুন, বাস তাঁবুতে; সুতরাং এ কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে, অতএব সাহেবী ধরণে নিঃসঙ্কোচচিত্তে চলিলাম।

যুবার সঙ্গে কতক দূরে গেলে সে আমায় বলিল, "আমি বাঘটি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল, তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। 'স্বহস্তে মারিব' এই কথায় বুঝাইয়াছিল, পরহস্তে বাঘ মারা সম্ভব; আমি সাহেব-বেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চিত ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতক দূরে গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গি, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর কতক দূরে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটি গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্য-স্থানে প্রস্তরনির্ম্মিত একটি

কুটীর, চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকটে, একস্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভালমানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর-নখর-সংযুক্ত একটি থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয়, নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল। আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে।" তদনুসারে আমি নতশিরে চলিলাম। শেষে সে একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এইখানি ঠেলিয়া তুলি।" উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর উহা ঘোররবে প্রাঙ্গণে পড়িল। শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানি না, ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর পড়িয়া গেল—আর উঠিল না।

বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে এবং হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে, ইনি পর বৎসরই উক্ত কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গেই ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন।

'প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাকর পত্রিকায় ইঁহার বাঙ্গালা লেখার হাতে-খড়ি। ইনি কৈশোরে 'ললিতা ও মানস' নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক রচনা করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম এই :—'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ,' 'চন্দ্রশেখর,' 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' 'দেবী চৌধুরাণী,' 'সীতারাম,' 'আনন্দমঠ', 'রজনী,' 'রাজসিংহ,' 'ইন্দিরা,' 'মৃণালিনী,' 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'লোকরহস্য,' 'বিবিধ প্রবন্ধ,'

'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব'। ইনি 'বঙ্গদর্শন' নামক নূতন ধরণের একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকার প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৫৬ বৎসর বয়সে ইনি স্বর্গারোহণ করেন। ইংরাজ সরকার ইঁহাকে রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি দান করেন। বঙ্কিমচন্দ্র যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যগুরু, স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধক, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি।

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথ্য ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজি সাহিত্যেই পারদর্শী, তাঁহারা একজন লণ্ডনী কক্‌নী বা একজন ইংরাজ কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেক দিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যে ইংরাজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়া বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃত ও প্রাকৃতে আদৌ বোধ হয়, এরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালায় লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে কিছুকাল পূর্ব্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল :—একটির নাম সাধুভাষা, অপরটির নাম কথিত ভাষা। প্রথমটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। * * *

গদ্যগ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছুর ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তক-প্রণয়ন সংস্কৃতব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ-প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতেই পারে না। যাঁহারা ইংরাজিতে পণ্ডিত তাঁহারা বাঙ্গালাতে লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটাকাটা অনুস্বারবাদীদের একচেটিয়া মহল ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন —সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব। যেমন গ্রাম্য স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক বা না বাড়ুক ওজনে ভারী সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল। এই গ্রন্থকর্ত্তারা মনে করিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত-বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু, বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্ব্বল এবং বাঙ্গালী সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ

ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত, ইংরাজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করিলেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালাভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুমূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।

সেইদিন হইতে সাধুভাষা ও অপরভাষা দুইপ্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণয়ন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সংস্কৃত-ব্যবসায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন। অপর ভাষা তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য।

এক্ষণে বাঙ্গালাভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী। যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দের ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে; উহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্যকার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে তাহাই বাঙ্গালা ভাষা—তাহাই গ্রন্থাদিতে ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত "বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে" আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ব্ববিধ গ্রন্থ-রচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কি না, আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোম পেঁচা বল, মৃণালিনী বল,—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত বসিয়া পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি,—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ও-সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা, উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজন-সমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের মনোরঞ্জিকা হইলেও উহা সর্ব্ববিধ পাঠকের পক্ষে

উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কি না?"

আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই-মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়—মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কমড়ার খাটা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা-শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্ত্তন-করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা-শ্রবণ পাঠকদিগের আবশ্যক।

প্রচলিত ভাষা-ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতাপুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্ত্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্ত্তা হইতে পারে না। তিনি সকলের সম্মুখে সরলভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না। কিন্তু আমাদের এরূপ বোধ আছে যে, সরলভাষাই শিক্ষাপ্রদ। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরলভাষার প্রতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বীতরাগতার কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় "বাঙ্গালা ভাষাবিষয়ক প্রস্তাব" লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেক্‌চাঁদের ভাষার সঙ্গে তাঁহার ভাষার প্রভেদ কেবল এই যে, টেক্‌চাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই।

তিনি যে বলিয়াছেন, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেক্‌চাঁদি ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ, টেক্‌চাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশের পিতাপুত্র একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইঁহাদের মধ্যে একদল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর বাঙ্গালাভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন,—প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে

সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী দূর গিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। শ্যামাচরণবাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা—গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই, যথা—জল, মেঘ, সূর্য্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্ত্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূলসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন ফল নাই এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, গৃহ, তাম্র ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালাভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবে না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশূন্যা হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। * * *

যদিও আমরা এমন বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, তবুও বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় সে যেন যাত্রার অভিনয় করিতেছে; "ভাই রে" বলিয়া যে ডাকে তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে, 'ভাই' ছাড়িয়া অকারণে ভ্রাতৃ শব্দের ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না পাইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের

অভ্যাস যে, এই শ্রেণীর শব্দসকল তাঁহাদের রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় সে-সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। * * *

তাহার পর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালাভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা। তাহার অভাব-পূরণের জন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ করিতে হইবে। কর্জ করিতে হইলে, চিরকালের মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী, ইহার রত্নময় শব্দ-ভাণ্ডার হইতে যাহা চাও তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিলে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে অনেকে বুঝিতে পারিবে; ইংরাজী বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? * * * অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্থূল কথা সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয় তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য অথবা যদি সকলের বোধগম্য ভাষা না থাকে তবে, যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দপণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষার গ্রন্থ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরোপকার-কাতর খলস্বভাব লোক বলিব। তিনি জ্ঞান-বিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে দূরে রাখেন।

যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়নের অন্য উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত—ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সর্ব্বজনের প্রাপ্য ধনকে, এমত দুরূহ ভাষায় নিবদ্ধ রাখা যায় যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিবে—তুমি সেখানে বঞ্চকমাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখনপঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখনও হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা স্বতন্ত্র থাকিবেই। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য বক্তব্য-জ্ঞাপন। লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষা-দান, চিত্ত-সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দ-ধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যিনি "হুতোম পেঁচা" লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচির বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপরে। হাস্য ও করুণ রসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বার্ণস্ হাস্য ও করুণ-রসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নতবিষয়ে ইংরাজি ব্যবহার করিতেন। গভীর, উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেননা, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষায় সৌন্দর্য্য। সরলতা স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য

মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সেস্থলে সৌন্দর্য্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও কোন্ ভাষায় তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেব-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে, যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরাজি, ফার্সি, আরবী, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।

তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট করিবে—কেননা যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেজন্য চেষ্টা করিতে হইবে। লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সেই চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃত-বহুল ভাষা অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃত-বহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষাও শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

মাণিকলাল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অশ্বারোহী পর্ব্বতের উপর হইতে দেখিলেন, চারিজনে একজনকে বাঁধিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আগে কি হইয়াছে তাহা তিনি দেখেন নাই, তখন তিনি পৌঁছেন নাই। অশ্বারোহী নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, উহারা কোন্ পথে যায়। তাহারা যখন নদীর বাঁক ঘুরিয়া পর্ব্বতান্তরালে অদৃশ্য হইল, তখন অশ্বারোহী অশ্ব হইতে নামিলেন। পরে অশ্বের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বিজয়! এখানে থাকিও—আমি আসিতেছি—কোন শব্দ করিও না।" অশ্ব স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার আরোহী পদচারে অতি দ্রুতবেগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন। পর্ব্বত যে বড় নয় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অশ্বারোহী পদব্রজে মিশ্রঠাকুরের কাছে আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, অল্প কথায় বলুন।" মিশ্র বলিলেন, "চারিজনের সঙ্গে আমি একত্র আসিতেছিলাম। তাহাদের চিনি না—পথের আলাপ; তাহারা বলে 'আমরা বণিক্'। এইখানে আসিয়া তাহারা মারিয়া ধরিয়া আমার যাহা কিছু ছিল কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।"

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি লইয়া গিয়াছে?"

ব্রাহ্মণ বলিল, "একগাছি মুক্তার বালা। কয়টি আশরফি, দুইখানি পত্র।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, "আপনি এইখানে থাকুন। উহারা কোন্ দিকে গেল, দেখিয়া আসি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আপনি যাইবেন কি প্রকারে? তাহারা চারিজন, আপনি একা।"

আগন্তুক বলিল, "দেখিতেছেন না, আমি রাজপুত সৈনিক।"

অনন্ত মিশ্র দেখিলেন, এই ব্যক্তি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বটে। তাহার কোমরে তরবারি ও পিস্তল এবং হস্তে বর্শা। তিনি আর ভয়ে কথা কহিলেন না।

রাজপুত যে পথে দস্যুগণকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই পথে অতি সাবধানে তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বনমধ্যে আসিয়া আর পথ পাইলেন না, দস্যুদিগের কোন নিদর্শনও পাইলেন না।

তখন রাজপুত আবার পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিলেন যে, দূরে বনের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া চারিজনে যাইতেছে। সেইখানে কিছুক্ষণ অবস্থিতি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ইহারা কোথায় যায়। দেখিলেন কিছু পরে উহারা একটা পাহাড়ের তলদেশে গেল, তাহার পর উহাদের আর দেখা গেল না। তারপর রাজপুত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উহারা হয় ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে—বৃক্ষাদির জন্য দেখা যাইতেছে না, নয়, ঐ পর্ব্বততলে গুহা আছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

রাজপুত বৃক্ষাদি চিহ্ন দ্বারা সেইস্থানে যাইবার পথ নিরূপণ করিলেন। পরে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সেই সকল চিহ্ন-লক্ষিত পথে চলিলেন, এইরূপে বিবিধ কৌশলে তিনি পুর্বলক্ষিত স্থানে আসিয়া দেখিলেন, পর্ব্বততলে একটি গুহা আছে। গুহামধ্যে মনুষ্যের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

এই পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপুত কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। উহারা চারিজন, তিনি একা ; এক্ষণে গুহামধ্যে প্রবেশ করা উচিত কিনা। যদি গৃহদ্বার রোধ করিয়া উহারা চারিজনে তাঁহার সহিত সংগ্রাম করে, তবে তাঁহার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একথা রাজপুতের মনে বড় অধিকক্ষণ স্থান পাইল না—মৃত্যুভয় আবার ভয় কি? মৃত্যুভয়ে রাজপুত কোন কাজ হইতে বিরত হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেই তাঁহার হস্তে দুই একজন অবশ্যই মরিবে, যদি উহারা সেই দস্যুদল না হয়, তবে নিরপরাধের হত্যা হইবে।

এই ভাবিয়া রাজপুত সন্দেহভঞ্জনার্থ অতি ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তা কর্ণপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দস্যুরা তখন অপহৃত সম্পত্তির বিভাগের কথা কহিতেছিল। শুনিয়া রাজপুতের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে উহারা দস্যু বটে। রাজপুত তখন গুহামধ্যে প্রবেশ করাই স্থির করিলেন।

ধীরে ধীরে বর্শা বনমধ্যে লুকাইলেন, পরে অসি নিকোষিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। বামহস্তে পিস্তল লইলেন। দস্যুরা যখন অন্যমনস্ক ছিল, সেই সময় রাজপুত অতি সাবধানে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলপতি গুহাদ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া ছিল। গুহায় প্রবেশ করিয়া রাজপুত দৃঢ়মুষ্টিধৃত তরবারি দলপতির মস্তকে আঘাত করিলেন। তাঁহার হস্তে এত বল যে, এক আঘাতেই মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

সেই মুহূর্ত্তেই দ্বিতীয় একজন দস্যু, যে দলপতির কাছে বসিয়া ছিল, তাহার দিকে ফিরিয়া রাজপুত তাহার মস্তকে এরূপ কঠিন পদাঘাত করিলেন যে, সে মূচ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল। রাজপুত অন্য দুইজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে একজন গুহাপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর তুলিতেছে। রাজপুত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উঠাইলেন; সে আহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মাণিক-লাল বেগতিক দেখিয়া গুহাদ্বারপথে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। রাজপুতও বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে রাজপুত যে বর্শা বনমধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা মাণিকলালের পায়ে ঠেকিল। মাণিকলাল তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাজপুতের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মহারাজ। আমি আপনাকে চিনি, ক্ষান্ত হউন, নহিলে এই বর্শায় বিদ্ধ করিব।"

রাজপুত হাসিয়া বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে বর্শা মারিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি উহা বামহস্তে ধরিতাম, কিন্তু তুমি উহা মারিতে পারিবে না—এই দেখ।" এই বলিতে না বলিতে রাজপুত তাঁহার হাতের খালি পিস্তল দস্যুর দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন; দারুণ প্রহারে তাহার হাতের বর্শা খসিয়া পড়িল। রাজপুত তাহা তুলিয়া লইয়া মাণিকলালের চুল ধরিলেন এবং অসি উত্তোলন করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলেন।

মাণিকলাল তখন কাতরস্বরে বলিল, "মহারাজাধিরাজ, আমার জীবন দান করুন, রক্ষা করুন—আমি শরণাগত।"

রাজপুত তাহার কেশ ত্যাগ করিলেন, তরবারি নামাইলেন। বলিলেন, "তুই মরিতে এত ভীত কেন?"

মাণিকলাল বলিল, "আমি মরিতে ভীত নহি। কিন্তু আমার একটি সাত বৎসরের কন্যা আছে; সে মাতৃহীন, তাহার আর কেহ নাই—কেবল আমি। আমি প্রাতে তাহাকে আহার করাইয়া বাহির হইয়াছি, আবার সন্ধ্যাকালে গিয়া আহার দিব, তবে সে খাইবে; আমি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিতেছি না। আমি মরিলে সে মরিবে। আমাকে মারিতে হয়, আগে তাহাকে মারুন।"

দস্যু কাঁদিতে লাগিল, পরে চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজাধিরাজ! আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর কখনও দস্যুতা করিব না। চিরকাল আপনার দাসত্ব করিব। আর যদি জীবন থাকে, একদিন না একদিন এ ক্ষুদ্র ভৃত্য হইতে উপকার হইবে।"

রাজপুত বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন?"

দস্যু বলিল, "মহারাণা রাজসিংহকে কে না চিনে?"

তখন রাজসিংহ বলিলেন, "আমি তোমার জীবন দান করিলাম। কিন্তু তুমি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছ, আমি যদি তোমাকে কোনপ্রকার দণ্ড না দিই, তবে আমি রাজধর্ম্মে পতিত হইব।"

মাণিকলাল বিনীতভাবে বলিল, "মহারাজাধিরাজ! এ পাপে আমি নূতন ব্রতী। অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি লঘুদণ্ডের বিধান করুন। আমি আপনার সম্মুখে শাস্তি লইতেছি।"

এই বলিয়া দস্যু কটিদেশ হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা নির্গত করিয়া অবলীলাক্রমে আপনার তর্জনী অঙ্গুলি ছেদন করিতে উদ্যত হইল। ছুরিতে মাংস কাটিয়া, অস্থি কাটিল না, তখন মাণিকলাল এক শিলাখণ্ডের উপর হস্ত রাখিয়া, ঐ অঙ্গুলির উপর ছুরিকা বসাইয়া আর একখণ্ড প্রস্তরের দ্বারা তাহাতে ঘা মারিল। আঙ্গুল কাটিয়া মাটিতে পড়িল। দস্যু বলিল, "মহারাজ! এই দণ্ড মঞ্জুর করুন।"

রাজসিংহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দস্যু ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। বলিলেন, "ইহাই যথেষ্ট। তোমার নাম কি?"

দস্যু বলিল, "এ অধমের নাম মাণিকলাল সিংহ। আমি রাজপুতকুলের কলঙ্ক।"

রাজসিংহ বলিলেন, "মাণিকলাল, আজি হইতে তুমি আমার কার্য্যে নিযুক্ত হইলে। এক্ষণে তুমি অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত হইলে—তোমার কন্যা লইয়া উদয়পুরে যাও; তোমাকে ভূমি দিব, বাস করিও।"

মাণিকলাল তখন রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল এবং রাণাকে ক্ষণকাল অবস্থিতি করাইয়া গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে অপহৃত মুক্তাবলয়, পত্র দুইখানি এবং আশরফি চারিখানা আনিয়া দিল। বলিল, "ব্রাহ্মণের যাহা আমরা কাড়িয়া লইয়াছিলাম, তাহা শ্রীচরণে অর্পণ করিতেছি। পত্র দুইখানি আপনার জন্য। দাস যে উহা পাঠ করিয়াছে, সে অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

রাণা পত্র হস্তে লইয়া দেখিলেন, তাঁহারই নামাঙ্কিত শিরোনামা। বলিলেন, "মাণিকলাল, পত্র পড়িবার এ স্থান নহে। আমার সঙ্গে আইস। তোমরা পথ জান, পথ দেখাও।"

মাণিকলাল পথ দেখাইয়া চলিল। রাণা দেখিলেন যে দস্যু একবারও তাহার ক্ষত ও আহত হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না, বা তৎসম্বন্ধে একটি কথাও বলিতেছে না—বা একবার মুখ বিকৃত করিতেছে না। রাণা শীঘ্রই বন হইতে বেগবতী ক্ষীণা তটিনীর তীরে এক সুরম্য নিভৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

জীবন হইতে বড়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক-জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশূন্য, ছিদ্রশূন্য, আলোক-প্রবেশের পথমাত্রশূন্য,—এইরূপ পল্লবের অনন্ত সমুদ্র, ক্রোশের পর ক্রোশ, ক্রোশের

পর ক্রোশ, পবনের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার, মধ্যাহ্নেও আলোক অস্ফুট, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কখন মনুষ্য যায় না। পাতার অনন্ত মর্ম্মর এবং বন্য পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্য শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণ্য, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার; কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের ন্যায়।

পশুপক্ষী একেবারে নিস্তব্ধ। কত লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধকার অনুভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধ ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না। সেই অনন্ত জনশূন্য অরণ্যমধ্যে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতামধ্যে শব্দ হইল,—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

শব্দ হইয়া আবার সে অরণ্যানী নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া গেল; তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যমধ্যে মনুষ্যশব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল; আবার সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া মনুষ্যকণ্ঠ ধ্বনিত হইল,—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমুদ্র আলোড়িত হইল। তখন উত্তর হইল, "তোমার পণ কি?"

প্রত্যুত্তরে বলিল, "পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

প্রতিশব্দ হইল, "জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"

"আর কি আছে? আর কি দিব?"

তখন উত্তর হইল, "ভক্তি।"

দেশের শ্রীবৃদ্ধি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আজিকালি বড় গোল শুনা যায় যে, আমাদের দেশের বড় শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এতকাল আমাদিগের দেশ উৎসন্ন যাইতেছিল, এক্ষণে ইংরেজের শাসন-কৌশলে আমরা সভ্য হইতেছি। আমাদের দেশের মঙ্গল হইতেছে।

কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না? ঐ দেখ, লৌহবর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ একদিনে যাইতেছে। ঐ দেখ ভাগীরথীর যে উত্তাল তরঙ্গমালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ী তরণী ক্রীড়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলে; যে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসা-শাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাস ছিল।

ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যু-হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে; এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটি চন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহনের জন্য গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ,—যেখানে আগে কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, মারবেল, আমবোষ্টার—কত বলিব? যে বাবু দূরবীণ কষিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিলে উনি এত দিন চাল-কলা-ধূপ-দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি হতভাগ্য চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ-কাগজে বঙ্গদর্শনের জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, একশত বৎসর পূর্ব্বে

হইলে আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কিনা, সেই কচ্‌কচিতে মাথা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল—তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়-ধ্বনি কর।

এই মঙ্গল-ছড়াছড়ির মধ্যে আমার একটা কথা জিজ্ঞাসার আছে, কাহার এত মঙ্গল? হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে খালিপায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চষিতেছে, উহাদের মঙ্গল হইয়াছে? উহাদের এই ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, তাহার নিবারণ জন্য অঞ্জলি করিয়া মাঠের কর্দ্দমজল পান করিতেছে, ক্ষুধায় প্রাণ যাইতেছে, কিন্তু এখন বাড়ী গিয়া আহার করা হইবে না, এই চাষের সময়; সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাথরে রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত লুণ-লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে; তাহার পর ছেঁড়া মাদুরে, না হয় গোহালের ভূমে একপাশে শয়ন করিবে—উহাদের মশা লাগে না। তাহার পরদিন প্রাতে আবার সেই একহাঁটু কাদায় কাজ করিতে যাইবে—যাইবার সময়, কোন জমিদার, নয় মহাজন, পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়া দেনার জন্য বসাইয়া রাখিবে, কাজ হইবে না। নয় চষিবার সময় জমিদার জমিখানি কাড়িয়া লইবেন, তাহা হইলে সে বৎসর কি করিবে? উপবাস—সপরিবারে উপবাস। বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখা-পড়া শিখিয়াছ, ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ? আর তুমি ইংরেজ বাহাদুর, তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডুয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ, আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?

আমি বলি, অণুমাত্র না, কণামাত্রও না। তাহা যদি না হইল, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে মঙ্গলের ঘটায় হুলুধ্বনি দিব না। দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের

অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। তোমা হইতে আমা হইতে কোন্ কার্য্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।

দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, স্বীকার করি। আমরা এই প্রবন্ধে একটি উদাহরণের দ্বারা প্রথমে দেখাইব যে, দেশের কি প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরে দেখাইব যে, কৃষকেরা সে শ্রীবৃদ্ধির ভাগী নহে। পরে দেখাইব যে, তাহা কাহার দোষ।

ব্রিটিশ অধিকারে রাজ্য সুরক্ষিত। পরজাতীয়েরা জনপদপীড়া উপস্থিত করিয়া দেশের অর্থাপহরণ করিবে, সে আশঙ্কা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে। আবার স্বদেশীয়, স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পরে যে সঞ্চিতার্থ অপহরণ করিবে, সে ভয়েরও অনেকটা নিবারণ হইয়াছে। দস্যুভীতি, চৌরভীতি, বলবৎ-কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের সম্পত্তিহরণের ভয়, এ সকলের অনেক লাঘব হইয়াছে। আবার রাজা বা রাজপুরুষেরা প্রজার সঞ্চিতার্থ-সংগ্রহ-লালসায় যে বলে ছলে কৌশলে লোকের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবেন, সেই দিনও নাই। অতএব যদি কেহ অর্থ-সঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে তাহার ভরসা হয় যে, সে তাহা ভোগ করিতে পারিবে, এবং তাহার উত্তরাধিকারীরাও তাহা ভোগ করিতে পারিবে। যেখানে লোকের এরূপ ভরসা থাকে, সেখানে লোকে সচরাচর সংসারী হয়। যেখানে পরিবার-প্রতিপালন-শক্তি সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, সেখানে লোকে সংসার-ধর্ম্মে বিরাগী। পরিণয়াদিতে সাধারণ লোকের অনুরাগের ফল প্রজাবৃদ্ধি। অতএব ব্রিটিশ-শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হইয়াছে। প্রজাবৃদ্ধির ফল কৃষিকার্য্যের বিস্তার। যে দেশে লক্ষ লোকের মাত্র আহারোপযোগী শস্যের আবশ্যক, সে দেশে বাণিজ্যের প্রয়োজনাভাবে কেবল তদুপযুক্ত ভূমিই কর্ষিত হইবে,—কেন না, অনাবশ্যক শস্য—যাহা কেহ খাইবে না, ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহা কে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উৎপাদন করিতে যাইবে? দেশের অবশিষ্ট ভূমি পতিত বা জঙ্গল বা তদ্রূপ অবস্থাবিশেষে থাকিবে। কিন্তু প্রজাবৃদ্ধি হইয়া যখন সেই এক লক্ষ লোকের স্থানে দেড় লক্ষ লোক হয়, তখন আরও বেশী আবাদ না করিলে চলে না। কেন না, যে ভূমির উৎপন্নে লক্ষ লোকমাত্র প্রতিপালিত হইত, তাহার শস্যে দেড় লক্ষ কখনও চিরকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না।

সুতরাং প্রজাবৃদ্ধি হইলেই চাষ বাড়িবে। যাহা পূর্ব্বে পতিত বা জঙ্গল ছিল, তাহা ক্রমে আবাদ হইবে। ব্রিটিশ-শাসনে প্রজাবৃদ্ধি হওয়াতে সেইরূপ হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বের অপেক্ষা এক্ষণে অনেক ভূমি কর্ষিত হইতেছে।

আর এক কারণে চাষের বৃদ্ধি হইতেছে। সেই দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যবৃদ্ধি। বাণিজ্য বিনিময়মাত্র। আমরা যদি ইংলণ্ডের বস্ত্রাদি লই, তবে তাহার বিনিময়ে আমাদের কিছু সামগ্রী ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে, নহিলে আমরা বস্ত্র পাইব না। আমরা কি পাঠাইব? অনেকে বলিবেন 'টাকা'। তাহা নহে, সেটি আমাদের দেশীয় লোকের একটি গুরুতর ভ্রম। সত্য বটে, ভারতবর্ষের কিছু টাকা ইংলণ্ডে যায়,—সেই টাকাটি ভারত-ব্যাপারে ইংলণ্ডের মুনাফা। সে টাকা, ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সামগ্রীর কোন অংশের মূল্য নহে, যদি বিবেচনা কর, তাহাতেও হানি নাই। অধিকাংশের বিনিময়ে আমরা কৃষিজাত দ্রব্যসকল পাঠাই, যথা,—চাউল, রেশম, কার্পাস, পাট, নীল ইত্যাদি। ইহা বলা বাহুল্য যে, যে পরিমাণে বাণিজ্যবৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণে এই সকল কৃষিজাত সামগ্রীর আধিক্য আবশ্যক হইবে; সুতরাং দেশে চাষও বাড়িবে। ব্রিটিশরাজ্য হইয়া পর্য্যন্ত এদেশের বাণিজ্য বাড়িয়াছে—সুতরাং বিদেশে পাঠাইবার জন্য বৎসর বৎসর অধিক কৃষিজাত সামগ্রীর আবশ্যক হইতেছে, অতএব এ দেশে প্রতিবৎসর চাষ বাড়িতেছে।

চাষবৃদ্ধির ফল কি? দেশের ধনবৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি। * * * বঙ্গদেশে দিন দিন চাষের বৃদ্ধিতে দেশের কৃষিজাত ধন বৃদ্ধি পাইতেছে।

আর একটি কথা আছে। সকলে মহাদুঃখিত হইয়া বলিয়া থাকেন, এক্ষণে দিনপাত করা ভার—দ্রব্য-সামগ্রী বড় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে, এই কথা নির্দ্দেশ করিয়া অনেকেই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বর্ত্তমান সময় দেশের পক্ষে বড় দুঃসময়, ইংরেজের রাজ্য প্রজাপীড়ক রাজ্য এবং কলিযুগ অত্যন্ত অধর্ম্মাক্রান্ত যুগ—দেশ উৎসন্ন গেল। ইহা যে গুরুতর ভ্রম, তাহা সুশিক্ষিত সকলেই অবগত আছেন। বাস্তবিক দ্রব্যের বর্ত্তমান সাধারণ দৌর্ম্মূল্য দেশের অমঙ্গলের চিহ্ন নহে, বরং একটা মঙ্গলের চিহ্ন। সত্য বটে, যেখানে আগে আট আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত, সেখানে এখন আড়াই টাকা লাগে;

যেখানে টাকায় তিন সের ঘৃত ছিল, সেখানে টাকায় তিন পোয়া পাওয়া ভার। কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় না যে বস্তুতঃ চাউল ঘৃত দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। টাকা সস্তা হইয়াছে, ইহাই বুঝায়। সে যাহাই হউক, এক টাকার ধান এখন যে দুই তিন টাকার ধান হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার ফল এই যে, যে ভূমিতে কৃষক এক টাকা উৎপন্ন করিত, সে ভূমিতে দুই তিন টাকা উৎপন্ন হয়। যে ভূমিতে দশ টাকা হইত, তাহাতে ২০ কি ৩০ টাকা হয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বা অধিকাংশ স্থানে এইরূপ হইয়াছে, সুতরাং এই এক কারণে বঙ্গদেশের কৃষিজাত বার্ষিক আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে।

আবার পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে, কর্ষিত ভূমিরও আধিক্য হইয়াছে। তবে দুই প্রকারে কৃষিজাত আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথম কর্ষিত ভূমির আধিক্যে, দ্বিতীয় ফসলের মূল্য-বৃদ্ধিতে। যেখানে এক বিঘা ভূমিতে তিন টাকার ফসল হইত, সেখানে সেই এক বিঘায় ছয় টাকা জন্মে, আবার আর এক বিঘা জঙ্গল পতিত আবাদ হইয়া আর ছয় টাকা, মোটে তিন টাকার স্থানে বারো টাকা জন্মিতেছে।

এইরূপে বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এ ধন কৃষিজাত,—কৃষকেরই প্রাপ্য। পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায়। বাস্তবিক তাহারা পায় না। কে পায় আমরা দেখাইতেছি। কিছু রাজভাণ্ডারে যায়। কৃষকের সংখ্যা বাড়িয়াছে; সুতরাং মহাজনের লাভও বাড়িয়াছে এবং যে বণিকেরা মাঠ হইতে ফসল আনিয়া বিক্রয়ের স্থানে বিক্রয় করে কৃষিজাত ধনের কিয়দংশ যে তাহাদের লাভস্বরূপে পরিণত হয় তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। অধিকাংশ টাকাটা ভূস্বামীরই হস্তে যায়। ভূমিতে অধিকাংশ কৃষকেরই অধিকার অস্থায়ী; জমিদার ইচ্ছা করিলেই তাহাদের উঠাইতে পারেন। দখলের অধিকার অনেক স্থানেই অদ্যাপি আকাশ-কুসুমমাত্র। যেখানে আইন অনুসারে প্রজার অধিকার আছে, সেখানে কার্য্যে নাই। অধিকার থাক বা না থাক, জমিদার উঠিতে বলিলেই উঠিতে হয়।

কয় জন প্রজা জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিয়া ভিটায় থাকিতে পারে? সুতরাং যে বেশী খাজনা দিতে স্বীকৃত হইবে, তাহাকেই জমিদার বসাইবেন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রজাবৃদ্ধি হইলেই জমির খাজনা বাড়িবে। যে ভূমির আগে একজন প্রার্থী ছিল, প্রজাবৃদ্ধি হইলে তাহার জন্য দুইজন প্রার্থী দাঁড়াইবে। যে বেশী খাজনা দিবে জমিদার তাহাকেই জমি দিবেন। রামা কৈবর্ত্তের জমিটুকু ভাল, সে এক টাকা হারে খাজনা দেয়। হাসিম শেখ সেই জমি চায়—সে দেড় টাকা হারে স্বীকার করিতেছে। জমিদার রামাকে উঠিতে বলিলেন। রামার হয়ত দখলের অধিকার নাই, সে অমনি উঠিল। নয় ত অধিকার আছে, কিন্তু কি করে? কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করিবে কি প্রকারে? অধিকার বিসর্জন দিয়া সেও উঠিল। জমিদার বিঘা পিছু আট আনা বেশী পাইলেন।

এইরূপে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কোন সময়ে না কোন সময়ে, কোন সুযোগে না কোন সুযোগে দেশের অধিকাংশ ভূমির হারবৃদ্ধি হইয়াছে। আইন-আদালতের আবশ্যক করে নাই, বাজারে যেরূপ গ্রাহকবৃদ্ধি হইলে ঝিঙ্গা-পটলের দর বাড়ে, প্রজাবৃদ্ধিতে সেইরূপ জমির হার বাড়িয়াছে। সেই বৃদ্ধি জমিদারের উদরেই গিয়াছে।

অনেকেই রাগ করিয়া এ সকল কথা অস্বীকার করিবেন। তাঁহারা বলিবেন, আইন আছে, নিরিখ আছে, জমিদারের দয়াধর্ম্ম আছে। আইন—সে একটা তামাসা মাত্র, বড়মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে। নিরিখ পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে বাড়িয়া গিয়াছে। আর জমিদারের—যখন আর স্ক্রু ফিরে না, তখন লোকের প্রতি দয়াধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। স্ক্রু ফিরাইয়া ফিরাইয়া বঙ্গদেশের অধিকাংশ বর্দ্ধিত ধার্য্য আয় ভূস্বামিগণ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারের যে হস্তবুদ ছিল, অনেক স্থানেই তাহার ত্রিগুণ, চতুর্গুণ হইয়াছে, কোথাও দশগুণ হইয়াছে। কিছু না বাড়িয়াছে, এমন জমিদারী অতি অল্প।

আমরা দেখাইলাম, এই ঈশ্বর-প্রেরিত কৃষিধনের বৃদ্ধির ভাগ রাজা পাইয়া থাকেন, ভূস্বামী পাইয়া থাকেন, বণিক্ পান,—কৃষক কি পায়? যে এই ফসল উৎপন্ন করে, সে কি পায়?

13—1731 B.T.

আমরা এমত বলি না যে, সে কিছুই পায় না। বিন্দুবিসর্গ মাত্র পাইয়া থাকে। যাহা পায়, তাহাতে তাহার কিছু অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। অদ্যাপি ভূমির উৎপন্নে তাহার দিন চলে না। অতএব যে সামান্য ভাগ কৃষক-সম্প্রদায় পায়, তাহা না পাওয়ারই মধ্যে। যার ধন, তার ধন নয়। যাহার মাথার কালঘাম ছুটাইয়া ফসল জন্মে, লাভের ভাগে সে কেহ হইল না।

আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থবর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী, বণিক্, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধিই নাই। সহস্র লোকের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই। এমন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে তুলক ; আমি তুলির না। এই নয় শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি না দেখিলে আমি কাহারও জয়গান করিব না।

বসন্তের কোকিল*

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু ? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক, চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা-মাজা কালো-কালো দুলালী ধরণের শরীরখানি কোথায় থাকে ? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

* কমলাকান্তের উক্তি (সংক্ষিপ্ত)

রাগ করিও না—তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন ; যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়—কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়—কত কবিতা, শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজী, মেঠো ইংরেজী, চোরা ইংরেজী, ছেঁড়া ইংরেজীতে নসীবাবুর বৈঠকখানা পারাবতকাকলীসঙ্কুল গৃহসৌধবৎ মুখরিত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ী আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাসে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিঁপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ, এ জন্য আসিতে পারিলেন না ; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এ জন্য আসিতে পারিলেন না ; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না ; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এ জন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে ; বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন ?

তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া, রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, অনন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু—উঃ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু—উঃ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো—পরান্ন-প্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু," তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, "কু—উঃ।" যখন পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে, তাহাতে তোমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ," কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্ন-প্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্পস্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল—তখনি ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ," যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এক কালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে,

তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু—উঃ।" যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুর-শ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না—পূর্ণ-যৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া, হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে, তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুল-কুঞ্জ হইতে ডাকিও, "কু—উঃ।"

যখন দেখিবে, শুভ্রমুখী স্তব্ধশরীরা সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যাশিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্য্যের হ্রাস দেখিয়া, ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে—স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দলরাজি বিকসিত করিবার উপক্রম করিতেছে—যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া—"আদরেতে আগুসারি" —কণ্ঠভরা গুন্ গুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে—তখন হে কালামুখ আবার "কু—উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা মিটাইও। * * *

ঐটি তোমার জিত—ঐ পঞ্চমস্বর। নইলে তোমার ও কু—উঃ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়—তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে—নহিলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাচা ভাল।

* * * তবে কোকিল, তুমি প্রকৃতির পালিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময়, নীলচন্দ্রাতপমণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, এ মহাসভাগৃহে তোমার এ মধুর পঞ্চমস্বরে—"কু—উঃ" বলিয়া ডাক—সিংহাসন হইতে হেষ্টিংস পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু—উঃ।" ভাল, তাই; ও কলকণ্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতায় কণ্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়। কু—উঃ বটে—তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চমস্বরে বলিলেই কু মানিব—নচেৎ কুঁকুড়ো বাবাজি "কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাতনিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে। * * *

এখন আয় পাখি! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে—সমান দুঃখের দুঃখী, সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্প-কাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে, আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস্—আমিও এই সংসার-কাননে,—গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই—আয় ভাই তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই—আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই, আনন্দ অছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা, আমার পুঁজিপাটা এই আফিমের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চমস্বর ভালবাসিস্—আমিও তাই; তুই পঞ্চমস্বরে কারে ডাকিস্? আমিই বা কারে? বল্ দেখি পাখি, কাকে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত, সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস্। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্ না, আমিও জানি না; তোর ও ডাক পৌছিলে আমারও ডাক পৌছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চমস্বরে ডাকি।

তবে কুহরবে সাধা গলায় কোকিল একবার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখনও বলিতে পারিলাম না। যদি তোর এ ভুবন-ভুলানো স্বর পাইতাম ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্ দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্ দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না,—যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই,—অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলী মধ্যে উড়িয়া, কখন কি "কুহু" বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল, আমার হয়ে একবার ডাক্ দেখি রে!

দেব-ধর্ম্মী মানব

চন্দ্রনাথ বসু

[মনীষী চন্দ্রনাথ বসু ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। এম.এ., বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে ব্যবহারাজীবের, তারপর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের—তৎপরে অধ্যাপকের কার্য্য করেন। পরে তিনি বাঙ্গালা সরকারের অনুবাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন।

বিখ্যাত প্রবন্ধলেখক বলিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যক্ষেত্রে ইঁহার খ্যাতি ছিল। শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, সাবিত্রীতত্ত্ব, ফুল ও ফল, হিন্দুত্ব ইত্যাদি ইঁহার রচিত প্রবন্ধ-সঙ্কলনের পুস্তক। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।]

দিন রাত্রি, আলো অন্ধকার, শুক্ল কৃষ্ণপক্ষ, সুখ দুঃখ, তিক্ত মধুর, শীতল উষ্ণ, পৃথিবীর দুইটি দিক, দুইটি রূপ, দুইটি ভাগ। ইহার মধ্যে একটিমাত্র দেখিলে পৃথিবী দেখা হয় না; পৃথিবীর অর্দ্ধেকও দেখা হয় না। যে শুধু তিক্ত রস আস্বাদন করিয়াছে, কখনও মধুর রস আস্বাদন করে নাই, সে তিক্ত রসও আস্বাদন করে নাই। অতএব পৃথিবী বুঝিতে হইলে তাহার দুইটি দিক্‌ই বুঝা আবশ্যক, একটি দিক্‌মাত্র বুঝিলে তাহার কোন দিক্‌ই বুঝা হয় না। কিন্তু পৃথিবীর যেমন, মানুষেরও তেমনি দুইটি দিক্ আছে। একটি ভাল দিক্, একটি মন্দ দিক্। মানুষের পদতলে পৃথিবী, মানুষের মস্তকোপরি স্বর্গ। তাই বুঝি মানুষের এক দিকে পশু, আর একদিকে দেবতা। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, কথাটা ঠিক যে মানুষ এক দিকে পশু, আর একদিকে দেবতা। অতএব মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পশুধর্ম্মও বুঝা চাই, দেবধর্ম্মও বুঝা চাই।

জন্তু-ধর্ম্মী মানবের ন্যায় দেব-ধর্ম্মী মানবও নানাশ্রেণীর ও নানাপ্রকৃতির। জন্তু-প্রকৃতিও যেমন বহুবিধ, দেব-প্রকৃতিও তেমনি বহুবিধ। জন্তুর মধ্যে সর্প, বৃশ্চিক, সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কুর, মার্জ্জার প্রভৃতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট। অতএব জন্তু-ধর্ম্মী মানুষের মধ্যে সকল রকমের মনুষ্য যেমন বর্ণনা

করিয়া উঠা যায় না, দেব-ধর্ম্মী মনুষ্যের মধ্যেও তেমনি সকল রকমের মনুষ্য বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। ফলতঃ সকল রকমের বর্ণনা করিবার আবশ্যকতাও নাই। উদাহরণস্বরূপ দুই তিন রকমের দেব-ধর্ম্মী মানুষের কথা বলিলেই পাঠক সকল রকমের দেব-ধর্ম্মী মানুষ ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। অতএব তাহাই করিব।

অত্র অন্নপূর্ণা-ধর্ম্মী

জগন্মাতা অন্নপূর্ণা জগৎকে অন্ন দিয়া রক্ষা করেন। মনুষ্যমধ্যেও অন্নপূর্ণা আছে।

এই সেদিনকার কথা বলিতেছি, সেইদিনকার সেই পিতামহ ঠাকুরের কথা বলিতেছি। পিতামহ ঠাকুরের গৃহে লোক ধরে না—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভাই-ভাইপো তো আছেই। কিন্তু আরও যে কত আছে, তাহা বলিতে পারি না। আহা! জ্ঞাতি-কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রী বল, পুরুষ বল, যে যেখানে নিরন্ন নিরাশ্রয় হইয়াছে, সেই আমার পিতামহ ঠাকুরের গৃহে পুত্রকন্যা অপেক্ষাও প্রিয়, গৃহদেবতা অপেক্ষাও সমাদৃত, গুরুদেব অপেক্ষাও সম্মানিত। পিতামহ ঠাকুরের বেশভূষা নাই—তাঁহার পায়ে একটি জোড়া খড়ম, পরণে একখানি থান কাপড়, স্কন্ধে একখানি সেইরূপ উত্তরীয়। তাঁহার ভোগ-বিলাস নাই—তিনি গাড়ীঘোড়া কখনও চক্ষে দেখেন নাই, আতর-গোলাপের নাম শুনিয়াছেন মাত্র; ভোজন করেন আশ্রিত অনাথ-অনাথারা যাহা আহার করে তাহাই—তাহার চেয়ে বরং মন্দ ত ভাল নয়। তাঁহার বিষয়-সম্পদের ভাবনা নাই—তিনি মনুষ্যমধ্যে অন্নপূর্ণা। তাঁহার একমাত্র ভাবনা, কিসে তাঁহার সেই অন্নের কাঙালগুলি অন্ন পাইবে। তিনি সকলের পেটের জ্বালা বোঝেন, কিন্তু তাঁহার আপনার পেটের জ্বালা নাই। বেলা দুই প্রহর হইয়াছে, তখনও তিনি আহার করেন নাই, কেন না, তখনও তিনি অনুসন্ধান করিতেছেন, পাড়ার হাড়ি, মুচি, চাঁড়ালের মধ্যে কাহারও অন্ন যুটিতে বাকি আছে কিনা। যাহার অন্ন যুটে নাই, তাহাকে অন্ন দিয়া তবে আপনি বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় স্বয়ং এক মুঠা ভক্ষণ করেন। তিনি মনুষ্যমধ্যে অন্নপূর্ণা। তেমন অন্নপূর্ণা আমরা আর দেখিব না। আমাদের সে অন্নপূর্ণার পুরী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আর সেই রাঙ্গাদিদির কথা মনে পড়ে কি? সেই অসামান্য-রূপলাবণ্য-সম্পন্না বালবিধবা রাঙ্গাদিদিকে মনে পড়ে কি? যদি না মনে পড়ে তবে সেই কৈলাসবাসিনী ভিখারী ভূতনাথের অন্নপূর্ণাকে মনে কর, তাহা হইলেই বঙ্গের সেই বালবিধবা রাঙ্গাদিদিকে মনে করা হইবে। তিনি যখন শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিয়া আলুথালু কালো কেশরাশি কপালের উপরভাগে এলো বন্ধনে বাঁধিয়া রাঙ্গা হস্তে দর্ব্বী ভরিয়া গৃহপ্রাঙ্গণে শত শত বালকবালিকাকে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিতেন, সকলে কানাকানি করিত যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়াছেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপে সমস্ত গৃহকার্য্যনির্ব্বাহকারিণী রাঙ্গাঠাকুরাণীই প্রধান ভাণ্ডারিণী ছিলেন; তিনি নিজ হস্তে যাহাকে যাহা দিতেন, তাহাই তৃপ্তিকর; তাহার দ্বিগুণ অপরের হস্ত হইতে প্রাপ্ত হইলেও কেহ সুখী হইত না। আম হউক বা কুল হউক, রাঙ্গাঠাক্রুণ বাঁটিয়া না দিলে কাহারও মঞ্জুর হইত না। আজ অন্নমেরু, কাল তুলা, পরশ্ব সাবিত্রী ব্রতদানে রাঙ্গাদিদির নিয়ত ম্লান মুখটি কখন কখন প্রফুল্লতায় উজ্জ্বল হইত। স্বয়ং নিঃসন্তান, কিন্তু দেশের ছেলেরা তাঁহার সন্তান ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এ রাঙ্গাদিদিকে যে মানবী বলে, দেবতা কাহাকে বলে সে জানে না। হিন্দুর গৃহে গিয়া অন্নপূর্ণারূপিণী হিন্দুবিধবাকে দেখিলে সে প্রকৃত দেবতত্ত্ব শিখিতে পারে। রাঙ্গাদিদির ন্যায় অন্নপূর্ণা এখনও আমাদের ঘরে আছে। তাই আমরা এখনও একেবারে উৎসন্ন হই নাই। তাই বিষ্ণু এখনও আমাদিগকে পালন করিতেছেন এবং বিষ্ণু-পালিত বিশ্বে আমাদের এখনও দাঁড়াইবার স্থান আছে। তাই মনুষ্যসমাজে আমাদের মনুষ্য বলিয়া এখনও কিছু মান-সম্ভ্রম আছে।

আমার মেজকাকী আর একটি অন্নপূর্ণা। মেজকাকীর বয়স চল্লিশের বেশী, কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, পাতলা ছিপছিপে। মেজকাকী গৃহের মধ্যে একজন গৃহিণী; কিন্তু অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী, ছেলেপুলেরাও তাঁহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। মেজকাকীর গলা নাই, তিনি এখনও আস্তে আস্তে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কন। মেজকাকীর ছেলেপুলে নাই। মেজকাকীর ঝাড়া হাত-পা। কিন্তু মেজকাকীর ঘরে ছেলে ধরে না। ঘোষেদের ছেলে, মিত্রদের ছেলে, সরকারদের ছেলে, গ্রামের সকলের ছেলেমেয়ে, মেজকাকীর

ঘরে সদাই ছেলের হাট। মেজকাকী কোন ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, কোন ছেলেকে পরাইতেছেন, কোন ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছেন, কোন ছেলের গা মুছাইয়া দিতেছেন। মেজকাকী উপর হইতে নীচে যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে যাইতেছে; নীচে হইতে উপরে আসিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ সাতটা ছেলে আসিতেছে। মেজকাকী ঠাকুর প্রণাম করিতেছেন, তাঁহার এ পাশে ও পাশে সামনে পিছনে ছেলের পালও টিপ্ টিপ্ করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিতেছে। রাত্রি একপ্রহর, তখনও মেজকাকীর ঘরে পাঁচটা ছেলে। মেজকাকী তাহাদিগকে দুধ খাওয়াইয়া গুন্ গুন্ স্বরে গান গাইয়া ঘুম পাড়াইলেন, ছেলেদের মায়েরা আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। একটি ছেলে মেজকাকীর ঘরেই রহিল। সে ছেলেটা বড় দুরন্ত এবং তাহার মা'র আর পাঁচটা ছেলে আছে। তাহার মা তাহাকে মেজকাকীর কাছে রাখিয়া বাঁচিল। মেজকাকীর নিজের জন্য একটি পয়সা খরচেরও দরকার নাই। কিন্তু খেলনায় ও সন্দেশ, মিঠাই, খৈ, বাতাসায় তাঁহার মাসে পনের'-ষোল টাকা ব্যয় হয়। মেজকাকা একটু একটু আফিম খান, তাই তাঁহার প্রতিদিন সেরটাক দুধের দরকার, তার বেশী নয়; কিন্তু প্রতিদিন তাঁহার ঘরে পাচ ছয় সের দুধ খরচ হয়। মেজকাকীর ঝাড়া হাত-পা, কিন্তু দিনে রাতে তাঁহার অবকাশ নাই—এমন কি মেজকাকা পাঁচবার চাহিয়াও একবার এক ঘটী জল পান না। মেজকাকী—জগদ্ধাত্রী, যাহার ধাত্রীর আবশ্যক সেই তাঁহার কাছে আসে। তিনি অন্নপূর্ণা; স্নেহের ভিখারী শিশুকে তিনি দিবারাত্রি স্নেহসুধা পান করান।

আর ঐ ছোটদাদা? উনিও অন্নপূর্ণা। দশঘর জ্ঞাতির মধ্যে উনিও একঘর। কিন্তু এক ঘর হইয়াও উনি সকল ঘরেই সমান। আপনার ঘরেও যেমন, জ্ঞাতির ঘরেও তেমনি। ওঁর আপনার ছেলেমেয়ে, ভাই-ভাইপোও যেমন, জ্ঞাতির ছেলেমেয়ে, ভাই-ভাইপোও তেমনি। জ্ঞাতি সুখী হইলে উঁহার সুখ উথলিয়া উঠে। জ্ঞাতিরা কষ্ট পাইলে, উঁহার প্রাণ কাঁদিতে থাকে। জ্ঞাতিও যেমন আপনার, গ্রামশুদ্ধ লোকও তেমনি আপনার। উনি সকলেরই ছোটদাদা। উনি 'কোম্পানির ছোটদাদা'। উঁহার গুণে সমস্ত গ্রামখানি একটি কোম্পানি—এক পথে চলে, এক সুরে কাঁদে, এক সুরে গায়। উঁহাকে ধরিয়া গ্রামখানি বাঁচিয়া আছে। উনি গ্রামখানির প্রাণ। উনি গ্রামের

অন্নপূর্ণা। কিন্তু হায়। উঁহাকে এখন আর বড় দেখিতে পাই না। তখন বঙ্গের গ্রামে গ্রামে কোম্পানির দাদা, কোম্পানির কাকা দেখিতে পাইতাম। এখন আর পাই না। বঙ্গদেশ এখন দেবতাশূন্য হইতেছে। সত্যই বঙ্গে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে।

তুমি বঙ্গীয় প্রাচীন সমাজের কতই নিন্দা কর এবং বলিয়া থাক যে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে সে সমাজ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে সমাজে দেবতা ও দেবচরিত্র ছিল। সে দেবতা ও দেবচরিত্র হারাইয়া তোমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তোমাদের তথাকথিত উন্নতি তাহার এক-শতাংশও পুরণ করিতে পারিবে না। বুদ্ধি বল, বিদ্যা বল, চরিত্রের সমান কিছুই নয়। আমরা সেই চরিত্র হারাইতেছি। বিধাতা জানেন, আমাদের উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে।

তত্র দিক্‌পাল-ধর্ম্মী

হিন্দুশাস্ত্রে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পাল দেখিতে পাই। সকল দিক্ রক্ষিত না হইলে কোন দিক্‌ই থাকে না। আপনার দিক্‌ও যায়। সেইজন্য দিক্‌পাল চাই। মনুষ্যমধ্যেও দিক্‌পাল-ধর্ম্মী আছে। গর্ডন ও গারিবল্‌দি উচচ শ্রেণীর দিক্‌পাল। গর্ডন যখন সুদানে ও চীনদেশে যান, তখন দিক্-রক্ষার্থ দিক্‌পাল-স্বরূপ গিয়াছিলেন। গারিবল্‌দি যখন গাম্বেতার রিপাবলিকের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যান, তখন তিনি দিক্-রক্ষার্থ দিক্‌পাল-স্বরূপ গিয়াছিলেন। একটা দিক্ যখন জলিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন দিক্‌পাল বরুণ যেমন বারি বর্ষণ করিয়া সেই দিক্‌টা রক্ষা করেন, তেমনি পৃথিবীর দুইটা দিক্ যখন উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন গর্ডন ও গা।রবল্‌দি দিক্‌পাল-স্বরূপ সেই সেই দিক্ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু অত বড় দিক্‌পাল পৃ।থবীতে বড় কম।

সামান্য সংসারধর্ম্মী মানবের অত বড় দিক্‌পালের কথা শুনিয়াও বিশেষ লাভ নাই। অতএব সমাজে নিত্য যে সব ছোট-ছোট দিক্‌পাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের কথা বলাই ভাল। আগে আমাদের সমাজে তেমন ছোট ছোট দিক্‌পাল অনেক ছিল। রঘুনাথ দিব্য জোয়ান পুরুষ—বয়স ৩০।৩৫। রঘুনাথ

অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল। তোমার বাড়ীতে আজ একটি বৃহৎ ক্রিয়া। তোমার লোকবল নাই। রঘুনাথ আসিয়া তোমার জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া দিল, ঘরবাড়ী পরিষ্কার করাইয়া দিল, চালাচুল্লী প্রস্তুত করাইয়া দিল, লোকজন খাওয়াইয়া দিল। দশদিন ধরিয়া রঘুনাথ এইসব করিল। তুমি রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলে, রঘুনাথ তোমাকে নমস্কার করিয়া গিয়া তাহার পর দিন হইতে আবার ঐ সিংহমহাশয়ের কন্যার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। রঘুনাথ চিরকালই এইরূপ করে—শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অহঙ্কার নাই, অভিমান নাই। রঘুনাথকে কি কখনও দেখ নাই? ঐ যে মিত্র মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে ঐ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সহস্রাধিক লোক একবারে ভোজন করিতে বসিয়াছে, আর ঐ যে রঘুনাথ—যুবা রঘুনাথ, দীর্ঘাকার রঘুনাথ, বলিষ্ঠ রঘুনাথ—কোমরে গামছা বাঁধিয়া পৌষমাসের দারুণ শীতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অসুরবিক্রমে ঐ সহস্রাধিক ভোক্তাকে অন্নব্যঞ্জন ক্ষীর দধি মিঠাই খৈচুর রসকরা মোণ্ডা পরিবেষণ করিতেছে, প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তাহার পদভরে টলমল করিতেছে, বল দেখি, রঘুনাথ যথার্থই অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণের ন্যায় দিক্‌পাল কিনা?

আবার মিত্র মহাশয়ের অন্দরে যাও—সেখানে রঘুনাথের মাকে দেখিবে, তিনিও দিক্‌পাল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান করিয়া তিনি রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বাদশটা চুল্লী জ্বলিতেছে, রঘুনাথের মা রন্ধন করিতেছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, এখনও রন্ধন করিতেছেন। কোমরে অঞ্চল জড়ানো, মস্তকোপরি কেশ চূড়ার আকারে বাঁধা, মুখ রক্তবর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত—এখনও রঘুনাথের মা অসীম উৎসাহে অসীম তেজে রন্ধন করিতেছেন। মিত্রবাড়ীর গৃহিণী বারংবার বলিতেছেন—"রঘুর মা, এক ফোঁটা চিনির পানা গলায় দিয়া যাও।" রঘুর মা এখন উন্মাদিনী, সে কথায় তাঁহার কাণ নাই। বল দেখি, রঘুনাথের মা যথার্থ অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণের ন্যায় দিক্‌পাল কিনা?

দিক্‌পাল-ধর্ম্মীকে দিবাভাগে কেহ তাহার আপন বাড়ীতে দেখিতে পায় না। পূর্ব্বাহ্নে হউক, অপরাহ্নে হউক, যখনই হউক, রঘুনাথের বাড়ীতে গিয়া রঘুনাথকে ডাকিলে, রঘুনাথের সাড়া-শব্দ পাইবে না। আবার ডাকিলে,

একটি ছেলে আসিয়া বলিবে—বাবা বাড়ীতে নাই, ঘোষেদের বাড়ীতে আছেন। ঘোষেদের বাড়ীতে গিয়া দেখিলে রঘুনাথ ভিয়ান-ঘরে ভোক্তার সংখ্যা ধরিয়া মিষ্টান্নের পরিমাণ ঠিক করিতেছেন। রঘুনাথ কখন্ একটিবার বাড়ীতে আসিয়া দুমুঠা ভাত খাইয়া যায়, কেহ জানে না,—কেহ বলিতে পারে না। রাত্রিকালে দিক্‌পাল-ধর্ম্মীর নিদ্রা বড় কম। যে নিদ্রাটুকু হয়, তাহাও কাকনিদ্রাবৎ; একটা টিকটিকির শব্দে সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। নিদ্রাতেও দিক্‌পালধর্ম্মীর কর্ণ চারিদিকে।

রাত্রি ঘোর অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। দিক্‌পাল রঘুনাথ ঘুমাইয়াও জাগরিত। রোদনধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, অনাথা হরসুন্দরীর পুত্রটি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। অমনি শয্যা ত্যাগ করিয়া আপনার ন্যায় আরও ২।৩টি দিক্-পালকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া, মৃত পুত্রটির সৎকার করিয়া আসিলেন। রঘুনাথ দিক্‌পাল বৈ কি—রঘুনাথ দেবতা। কিন্তু রঘুনাথকে আর বড় দেখিতে পাই না। রঘুনাথ সভ্য হইয়া কিছু সৌখিন হইয়াছেন। রঘুনাথ এখন সর্ব্বত্র উঁকিঝুঁকি মারেন, কিন্তু ঘাড় পাতিবার ভয়ে কোথাও আর দেখা দেন না। রঘুনাথ এখন বাবু। আমাদের কি উন্নতি হইয়াছে?

তত্র নারায়ণ-ধর্ম্মী

অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণ স্বয়ং কিছু করেন না। তিনি সেই অনন্তশয্যায় শয়ন করিয়া এক রকম নিদ্রিত বলিলেও হয়। সব জানেন, সব দেখেন, কিন্তু নিদ্রিত। দেবতারা যখন বিপদে পড়েন, কি করিলে বিপদের শান্তি হয় ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না, তখন তাঁহারা নারায়ণের নিকট গমন করেন, এবং তাঁহার পরামর্শ লইয়া বিপদ্ খণ্ডন করেন। গ্রামবৃদ্ধ গুরুচরণ সরকার মহাশয়ও নারায়ণ-ধর্ম্মী। তাঁহার বড় একটা নড়া-চড়া নাই। দিবারাত্রি সেই বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানা ঘরটির ভিতর বসিয়া আছেন। একখানি মাদুরের উপর একখানি ক্ষুদ্র তোশক, তদুপরি বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি হুঁকা, তাহাতে একটি পাতার নল। এক পাশে একটি জলপাত্র, তদুপরি একখানি

পাট করা গামছা। ঘরের দেয়ালে দুই চারিখানি ঠাকুর-দেবতার পট। ঘরে সর্ব্বদাই একটি লোক আছে। তিনি গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবীণ এবং গ্রামের সকল লোকের সকল কথাই জানেন। তাই সকলেই তাঁহার পরামর্শ লইতে আইসে। তিনি তাহাদের সমস্ত কথা—সমস্ত কাহিনী জানেন, তাহারাও তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলে, তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা গোপন করে না, গোপন করা আবশ্যক মনে করে না। যাহারা শাস্ত্রানুসারে ও গ্রামবৃদ্ধদিগের দৃষ্টান্ত ও উপদেশানুসারে সংসারধর্ম্ম করে, তাহাদের কাহারও নিকটে গোপন করিবার কোন কথা থাকে না। তাই গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয় বাল্যকাল হইতে তাহাদের সকলের সকল কথা জানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার পিতৃপিতামহের নিকট তাহাদের সকলের আগেকার সকল কথা শুনিয়াছেন। এখনকার মতন লোকের ঘরের কথা জানিয়া তাহাদের কুৎসা রটাইবার জন্য জানেন নাই। সদুপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সৎপথে রাখিবেন বলিয়া তাহাদের সকল কথা জানিয়াছেন। তাই তাহারাও তাঁহার কাছে কোন কথা গোপন করে না এবং তিনিও সকল কথা শুনিয়া ঠিক পরামর্শ দিয়া তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। সর্ব্বজ্ঞ না হইলে বিধাতা হওয়া যায় না। নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জগতের বিধাতা এবং দেবতারাও তাঁহার নিকট ঠিক পরামর্শ পান। গ্রামবৃদ্ধ সরকার মহাশয়ও গ্রাম সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ। তাই তিনি গ্রামের বিধাতা এবং গ্রামের সকল লোকই তাঁহার নিকট ঠিক পরামর্শ পায়। সামান্য সংসারী লোকের পক্ষে তেমন একটা বিধাতা বা পরামর্শদাতা থাকা কি কম সুখ ও সৌভাগ্যের কথা?

আমরা লেখাপড়া করিতেছি, গাড়ীঘোড়া চড়িতেছি, পুস্তক-প্রবন্ধ লিখিতেছি, সমাজসংস্কার করিতেছি, সংবাদপত্র চালাইতেছি, এখানে যাইতেছি ওখানে যাইতেছি, সভাসমিতি করিতেছি, বড় বড় বক্তৃতা করিতেছি। এত তাড়াতাড়ি এত কাণ্ড করিলে সকল দেশে সকলেরই মনে হয়, কতই উন্নতি করিতেছি। কিন্তু একবার স্থির হইয়া বসিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমরা প্রকৃতপক্ষে উন্নত হইতেছি, না অবনত হইতেছি—আমাদের মধ্যে যে দেব-চরিত্র ছিল, যে দেব-চরিত্র মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পদ্ ও আভরণ, সে দেব-চরিত্র লয়প্রাপ্ত হইতেছে কি পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে। আমি কিছুরই

বিরোধী নহি—গাড়ীঘোড়া, পুস্তকপ্রবন্ধ, সমাজসংস্কার, সভাসমিতি—কিছুরই বিরোধী নহি। কিন্তু সে সমস্ত পূর্ণ মাত্রায় পাইয়াও যদি সেই দেব-চরিত্র হারাই, তবে অবশ্যই বলিব, আমাদের সে সব পাওয়া বৃথা হইল। সে সব পাইয়া আমাদের লাভ কিছুই হইল না, বরং মর্ম্মঘাতী ক্ষতি হইল।

প্রতিভা

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

[রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নদীয়া জেলার গোসাই দুর্গাপুর গ্রামে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এম.এ., বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি একাধিক কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং শেষে বাংলা সরকারের অনুবাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি বহু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের একজন লেখক ছিলেন। ইঁহার রচিত প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ। 'মিত্রবিলাপ' ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪১ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

ভূমণ্ডলে যে সকল লোক প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল পুরাতন জ্ঞান ও কার্য্যপ্রণালীতে সুপরিপক্ক, অপর দল নূতনপথদর্শী। একদল অন্যনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে বিলক্ষণ দক্ষতা দেখাইতে পারেন, অপর দল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন গড়িতে বা অভিনবপ্রকার সৃষ্টি বা আবিষ্কার-করিতে পারেন। প্রথমোক্তদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী, এবং শেষোক্ত-দিগকে প্রতিভাশালী বলা যায়।

কেহ কেহ অন্য-নির্ম্মিত কল দেখিয়া তদনুরূপ গড়িতে পারেন; অন্যা-বিষ্কৃত তত্ত্ব স্মরণ রাখিতে পারেন; বা অন্যোদ্ভাবিত ভাবে অলঙ্কৃত হইতে পারেন। কিন্তু নূতন কলনির্ম্মাণ, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার বা নূতন ভাবের উদ্ভাবন, তাঁহাদিগের শক্তিসাধ্য নহে। এরূপ লোক কার্য্যক্ষম, বিজ্ঞানবিদ্ বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তাঁহাদিগকে দক্ষ বা পারদর্শী বলা যাইবে, কিন্তু প্রতিভাশালী বলা যাইবে না। তাঁহারা ভগবানের পালনশক্তি

পাইয়াছেন, কিন্তু বিধাতার সৃষ্টিশক্তিতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। আদ্যন্ত রামায়ণ যাঁহার কণ্ঠস্থ, এবং কথাবার্ত্তায় ও লিখন-পঠনে যিনি রামায়ণের শ্লোক উদ্ধৃত করিতে পারেন, তিনি যত কেন ক্ষমতাপন্ন হউন না, তাঁহার ঈদৃশ দক্ষতা আদি-কবি বাল্মীকির নূতন ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিকারিণী প্রতিভা হইতে কত বিভিন্ন।

পূর্ব্বকালে প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেবানুগৃহীত বলিয়া গণ্য হইতেন। তখন লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিভা শিক্ষানিরপেক্ষ দেবদত্ত শক্তি। এই প্রত্যয়ের সাহায্যে অন্ধকারময় অতীতকাল ভেদ করিতে গিয়া রঙ্গময়ী কল্পনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, দুরাচার জ্ঞানহীন দস্যু রত্নাকর ব্রহ্মার বরে ভাবরত্নাকর বাল্মীকি; এই বিশ্বাসের বলেই জনশ্রুতি প্রচার করিয়াছেন যে, শকুন্তলাপ্রণেতা কালিদাস মহামূর্খ ছিলেন, পরে বিদ্যাবতী রমণীর পদাঘাতে অভিমানে কাননে প্রবেশ করিয়া সরস্বতীর প্রসাদে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত-চূড়ামণি হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কেবল ভারতবর্ষে নহে, অন্যান্য দেশেও ঈদৃশী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডীয় পুরাবিদ্ বিডি সাহেব বলেন যে, প্রসিদ্ধ সাক্সন কবি সিড্‌মন্ প্রথমে এমন সঙ্গীত-রসাস্বাদবিহীন ছিলেন যে, গান শুনিলেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন, পরে স্বপ্নাদেশবশতঃ তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য গীতিশক্তি জন্মে। যদিও ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ প্রকার আকস্মিক দৈবশক্তির আবির্ভাব অপ্রামাণ্য ও অনৈসর্গিক, তথাপি প্রতিভা যে দেবদত্ত, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দিয়াছেন। একদল হয় ত গণিত বুঝিতে পারিবে না, সাহিত্য-রসপান করিতে পারিবে। অপর কেহ বা সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনিয়া অম্লানমুখে বলিবে, "ইহাতে ত কিছুরই উপপত্তি হইল না।" কেহ হয় ত একখানি চিত্র দেখিয়া মোহিত হইবে, সঙ্গীতের মনোহর তান বিরক্তিকর ভাবিবে। কেহ বা সুরম্য চিত্রপট অকিঞ্চিৎ-কর জ্ঞান করিয়া গীতসাগরে নিমগ্ন হইবে। কেহ প্রফুল্ল কুসুমোদ্যান পরিত্যাগ করিয়া বিজন বন্য শৈলময় প্রদেশ ভালবাসিবে; কেহ বা তরুলতা-শূন্য বন্ধুর গিরি কষ্টকর বোধ করিয়া প্রসূনপরিপূরিত বল্লরীপল্লববিভূষিত নিকুঞ্জে মনস্তুষ্টিসাধনার্থ আশ্রয় লইবে। কেহ চিন্তাশীল, কার্য্যে অপটু; কেহ বা কার্য্যদক্ষ, চিন্তায় অপটু। এইরূপ স্বাভাবিক শক্তিভেদ যে প্রতিভার

মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা, আমি, তুমি সকলেই কালিদাস বা আর্য্য ভট্ট, সেক্ষপিয়র বা নিউটন হইতে পারিতাম।

প্রতিভা যদিও আমাদিগের মতে স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি আমরা এরূপ বলি না যে, ইহা শিক্ষা-নিরপেক্ষ। যদি কেহ আপনাকে প্রতিভাশালী মনে করেন, তিনি যেন স্বপ্নেও ভাবেন না, "আমি শিক্ষাব্যতিরেকেই বড়লোক হইব।" সকলপ্রকার উন্নতিই পরিশ্রমসাপেক্ষ।

যত্নশীলই রত্নলাভে অধিকারী। সেক্ষপিয়র 'কল্পনার পুত্র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। যাঁহাকে লোকে অনেক দিন ধরিয়া অশিক্ষিত ভাবিয়া আসিয়াছে, তাঁহার নাটক-নিচয় পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, তিনি তাৎকালিক অনেক ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ ও বহুবিধ নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন এবং আইনে ও লাটিন ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। যে কালিদাস 'সরস্বতীর বরপুত্র', তিনিও অধ্যয়নশূন্য ছিলেন না। তিনি রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি পড়িয়াছিলেন; ইহা বলা বাহুল্য। কালিদাস অন্যান্য শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। অতএব কালিদাস যে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

যদি কালিদাস ও সেক্ষপিয়র অশিক্ষিত না হইলেন, তবে আমরা একপ্রকার ধরিয়া লইতে পারি যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে কেহই বড়লোক হইতে পারে না। শিক্ষার স্থল অনেক—বিদ্যালয়, গ্রন্থ, মনুষ্য-সমাজ, বাহ্যজগৎ। ইহাদের মধ্যে কেহ একটি, কেহ অপরটি হইতে বিশেষ সাহায্য পান। কিন্তু যত্নপূর্ব্বক অধ্যয়ন না করিলে কোনটি হইতে পর্য্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

অপর পক্ষে, কেহ কেহ বা শিক্ষার অমৃতময় ফল সন্দর্শন করিয়া এমন মোহিত হন যে, তাঁহারা প্রতিভাকে স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদিগের মতে প্রতিভা অভ্যাস বা মনোযোগ মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, "যে কার্য্য কোন ব্যক্তি বারংবার করে, বা যে বিষয়ে অধিক মনোযোগ দেয়, তাহাতেই তাহার এক প্রকার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে—উহাকেই প্রতিভা কহে; বাস্তবিক, সৃষ্টিকর্ত্তা যে কাহারও প্রতি পক্ষপাতী হইয়া তাহাকে অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে।"

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রতিভা অভ্যাস মাত্র—এই মতটি কতদূর সুসঙ্গত। যদি আমি তুমি কবিতা লিখিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে কি কালিদাস হইতে পারিব? অনেক পদ্যলেখক আছেন যাঁহারা ছন্দোগ্রন্থনে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন কবি? ভট্টিকার বৈয়াকরণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারেন, কিন্তু কে তাঁহাকে রঘুবংশরচয়িতার সহিত তুলনা করিবে? তিনি বিলক্ষণ পদ্য লিখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্ব কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে?

অভ্যাসের প্রকৃতি বিবেচনা করিলে, এ বিষয়ের মীমাংসা সহজ হইবে। অভ্যাস কার্য্যসমষ্টিজাত। একটি কার্য্য বারংবার সম্পাদন করিলে তৎসম্পাদন পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য হয়, এবং তৎপক্ষে প্রবল প্রবৃত্তি ও দক্ষতা জন্মে। যে বারংবার অনুষ্টুপ্ লিখে, সে সহজে অনুষ্টুপ্ লিখিতে পারিবে, কিন্তু বাল্মীকি হইতে পারিবে না।

অভ্যস্ত বিদ্যা পুরাতনাতিরিক্ত হইতে পারে না। লোকে যাহা করিয়াছে, অভ্যাস দ্বারা তাহাতেই পারদর্শী হওয়া যায়। কিন্তু যে নূতন সৃষ্টি প্রতিভার অন্তরায়-স্বরূপ, তাহা অভ্যাস কোথা পাইবে? আমি ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত-শিরোমণি বা নিউটনের প্রিন্সিপিয়া অভ্যাস করিতে পারি; কিন্তু তাদৃশ অভ্যাস দ্বারা তাঁহাদিগের নিরূপিত তত্ত্বগুলিই জানিতে পারিব, অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিব না।

যাঁহারা বিবেচনা করেন প্রতিভা মনোযোগমাত্র, তাঁহাদিগেরও বিষম ভ্রম। যে বিষয়ে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করা যায়, সে বিষয়ের সেই পরিমাণে স্মরণ থাকে। কিন্তু স্মরণ দ্বারা পূর্ব্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। সুতরাং প্রতিভার যেটি প্রধান লক্ষণ, মনোযোগে সেটি নাই। কাজে কাজেই প্রতিভাকে মনোযোগমাত্র বলা যাইতে পারে না।

যদিও মনোযোগ বা অভ্যাস প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ নহে, তথাপি তাহারা প্রয়োজনীয় সহকারী। যিনি কোন বিষয়ের নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহেন, তাঁহার তদ্বিষয়ক পুরাতন তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। পুরাতন তত্ত্ব-সংগ্রহের জন্য মনোযোগ ও অভ্যাসের প্রয়োজন। এইরূপ পুরাতন তত্ত্ব-সংগ্রহই শিক্ষার

উদ্দেশ্য। এইজন্যই আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ নহে। কিন্তু যাঁহারা ঈদৃশ শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহারা প্রাচীন বিদ্যায় পারদর্শী; প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের অভিনব তত্ত্বমন্দিরে প্রবেশের অধিকার নাই।

সাধারণের উন্নতি

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

[১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গঙ্গাচরণ সরকারও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। ইনি 'সাধারণী' নামে সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' নামে মাসিক পত্র অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি 'বঙ্গদর্শনে'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। ওকালতী ছাড়িয়া দিয়া ইনি চিরজীবন সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমযুগে ইনি সুদক্ষ সাহিত্য-সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার প্রণীত 'সনাতনী,' 'কবি হেমচন্দ্র,' 'গোচারণের মাঠ' (যুক্তাক্ষর-বর্জিত ক্ষুদ্র কাব্য), 'মহাপূজা,' 'রূপক ও রহস্য,' 'পিতাপুত্র' প্রভৃতি পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত।]

কোন একটি দেশে কেবল উর্দ্ধতন শ্রেণীর জনকতক লোকের জ্ঞানার্জনে, ধনসঞ্চয়ে বা বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার বা সুবিধা থাকিলে, সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সে শ্রী অধিক দিন থাকে না। মনু বলিয়াছেন যে, যে পরিবার-মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কষ্ট পায়, সে পরিবার-মধ্যে কখনও লক্ষ্মী থাকে না। আমরাও সেইরূপ দেখিতেছি যে, যে দেশের সাধারণ লোকসকল অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন থাকে, সে দেশের ক্রমোন্নতি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ সামাজিক নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল বহুকালব্যাপী গভীর চিন্তাদ্বারা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের মত স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেন। দায়ক্রম, বিবাহ, ব্যবহার, বিচার, প্রজাপালন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা যে সকল ব্যবস্থা ও নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন, সে সকল অপেক্ষা ভাল নিয়ম

এখনও মানবের বুদ্ধির গোচরীভূত হয় নাই। কেবল এই একটি বিষয়ে অবহেলা করাতেই সেই মহাত্মগণের গঠিত এই বিপুল প্রাসাদ চূর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে। ঋষিগণ অট্টালিকার প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ, স্তম্ভ, শীর্ষ সকলই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ভিত্তিতে যে মহৎ দোষ ছিল, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করেন নাই, অর্থাৎ নিম্নস্তরের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করেন নাই। কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় পাইলে, হলধারী বৈশ্যে, বা দ্বিজসেবক শূদ্রে সে ক্ষতি পূরণ করিতে পারিল না। সেইবার ভারতে আর্য্যজাতির প্রথম পতন। নিম্নস্তরের উত্থানশক্তি ছিল না বলিয়া, শূদ্র-বৈশ্যের ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রাপ্তির অধিকার ছিল না, ক্ষমতাও ছিল না, তাহাতেই ভারতবর্ষ অধঃপাতে গিয়াছে।

তবে যে ভারতবর্ষে উন্নতি উন্নতি বলা যায়, সে কেবল ছাদের কার্ণিসের পারিপাট্য-মাত্র; তলেতে, ভিত্তিতে সেই পূর্ব্বের মত আমা ইটের কাঁচা গাঁথুনি আছে। এবং বহুকালের গাঁথুনি বলিয়া এখন লোণা লাগিয়াছে, কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কোথাও ফাটিয়া রহিয়াছে। তখন যেরূপে আর্য্যভূমি অধঃপাতে গিয়াছে, এখনও আমরা সেই পাপে লিপ্ত। এখনও আমরা অনেকে মনে করি যে, ছোট লোকের ঘরে পয়সা হইলে, কিংবা গায়ে বল থাকিলে, অথবা তাহারা লেখাপড়া শিখিলে, আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এ ভ্রম যতদিন থাকিবে, ততদিন আমাদের মঙ্গল নাই।

ছোট লোকের বাড় হউক, ঘরে পয়সা, মরায়ে ধান, গায়ে বল থাকুক, আর ভদ্রসন্তানের অবস্থা হীন হউক, এ ইচ্ছা কাহারও নাই। আমরা বলি—সাধারণ লোককে অজ্ঞ, মূর্খ, নিঃস্ব রাখিয়া আমরা বড় থাকিতে চাহি না। দশ হাজার কুটীরবাসী ধাঙ্গড়ের মধ্যে একজন রামকৃষ্ণ পোদ্দার হইয়া থাকা ভাল?—না, যেখানে পঞ্চাশ ঘর মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ আছে, পঞ্চাশ ঘর চাকুরে কায়স্থ আছে, কাজকারবারে শাঁসেজলে পাঁচশতঘর নবশাখ আছে, সেকরায় সোণা-রূপার কারবার করিতেছে, কামারে তলোয়ার, খাঁড়া তৈয়ার করিতেছে, কাঁসারিতে ঢালাই-গলাই করিতেছে, জেলে বাগ্দী মাছ ধরিয়া চালানি দিতেছে, সকলেরই ঘরে দু'পয়সা আছে, আর সকল জাতির মধ্যেই পাঁচসাতজন লেখাপড়া জানে অর্থাৎ চিঠি লিখিতে পারে, হিসাব রাখিতে জানে, এবং বিল-কবজ পড়িতে পারে, এরূপ স্থানে থাকা ভাল?

আমাদের বিবেচনায় অসভ্য ধাঙ্গড়ের মধ্যে প্রভুত্ব করা অপেক্ষা এরূপ সমাজে অন্ন কষ্ট সহ্য করিয়াও বাস করা শত গুণে শ্রেয়স্কর। ধাঙ্গড়ের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিতে হইলে, ক্রমে ধাঙ্গড় হইতে হয়। সমাজের নিম্নস্তরে সকলের সম্প্রসারণ-শক্তি না থাকিলে উর্দ্ধতন শ্রেণীর কখন স্থায়ী উন্নতি হইবে না, সময়ে সময়ে অধঃপতন হইবেই হইবে।

সাধারণের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, প্রথমতঃ সাধারণকে তাহাদের আপনার কথা ভাবিতে শিখানো উচিত। যে আপনার ভাবনা ভাবে না, তাহার ভাবনা আর পাঁচ জনে ভাবিয়া কি করিবে? আমাদের দেশে সাধারণ লোকের দুঃখের ভাবনা সকলেই ভাবে, কিন্তু সে কেবল নিজের বা নিজ-পরিবারের জন্য। সকলে মিলিয়া সকলের জন্য ভাবিতে প্রায় জানে না। সকল শিক্ষার আদি, মধ্য, অন্ত—শিক্ষার সার হইতেছে, পরের ভাবনা ভাবিতে শিক্ষা। যাহার এ শিক্ষা নাই, সে শিক্ষিত নহে। যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শিখেন নাই, তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না। এই শিক্ষা আছে বলিয়াই ইউরোপের উন্নতি; এবং আমেরিকার অত্যুন্নতি। এই শিক্ষা নাই বলিয়াই আমাদের দেশের এত অবনতি। এই শিক্ষা দেশমধ্যে প্রচলিত করানো নিতান্ত আবশ্যক।

দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা সহজেই পাওয়া যায়। তুমি যদি আমার ভাবনা ভাবিতে থাক, তাহা হইলে আমি তোমার ভাবনা অবশ্য ভাবিব, আর মধ্যে মধ্যে আরও পাঁচ জনের জন্য ভাবিতে শিখিব; আমি যদি আরও দশজনকে আমার ব্যথার ব্যথী হইতে দেখি, তবে ক্রমে আমিও সেই কয়জন ছাড়া আরও দশজনের ব্যথা বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশের শিক্ষা-দোষে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সাধারণ লোকের ব্যথার ব্যথী লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণের একে শিক্ষা নাই, তাহাতে কেহ কোন দৃষ্টান্ত দেখিতে পায় না, কাজেই পরস্পরের বেদনা পরস্পরে বুঝিতে পারে না।

যতদিন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণের সহিত নিম্নস্তরের এই অসংখ্য প্রাণীর সহানুভূতি না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

যাঁহারা সাধারণের জন্য বেদনা বোধ করেন না, তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া মত পরিবর্ত্তিত করানো আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলি, যাঁহারা বাস্তবিক সাধারণের অবস্থা দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন, তাঁহাদের মনের ভাব যাহাতে সকলে বুঝিতে পারেন, তাঁহারা যেন তাহার চেষ্টা করেন, এবং কার্য্যতঃ সেই মনের ভাব ব্যক্ত করেন।

আজিকালি অনেকে সাধারণের হীন অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছেন। যাহাতে সাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, তৎপক্ষে তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাধারণের শিক্ষা দিবার কথাবার্ত্তা উঠিয়াছে। বড় আহ্লাদের কথা।

সীতা

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি. আই. ই. ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটি গ্রামে প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন, পরে এই কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। ইনি বহুদিন বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। ইনি বহু ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ও ঐতিহাসিক গবেষণায় ইঁহার দান অসামান্য। ভারতমহিলা, বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা, বেনের মেয়ে ইত্যাদি ইঁহার রচিত সাহিত্যগ্রন্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।]

বাল্মীকির সীতা একটি সুশীলা ও শান্তস্বভাবা বালিকা। তিনি বিবাহের পর সর্ব্বদা স্বামিশুশ্রূষায় ব্যাপৃতা থাকিতেন। রামচন্দ্র এই সময়ে সীতার সান্নিধ্যে বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। রাম কৈকেয়ীর গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন সীতাকে বনগমনের কথা বলিলেন, তখন সীতাও তাঁহার সহগামিনী হইতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে সকলেরই হৃদয় করুণরসে আপ্লুত হয়। সীতা বনবাসে যাইবেন,

রাম তাঁহাকে বাধা দিলেন। রাম কত বুঝাইলেন, বনগমনের নানা কষ্ট বর্ণনা করিলেন; গৃহবাসের সুখ বর্ণনা করিলেন; গৃহবাস করিলে নানাবিধ ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে পারা যায় এবং তাহা দ্বারা স্বামীর নানাবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারা যায়। সীতা অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন, "আমায় না লইয়া বনে যাওয়া তোমার কোনমতেই উচিত নহে। তোমার সহিত তপস্যাই করি, আর বনেই বাস করি, সেই আমার স্বর্গ। আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া কিছুতেই ক্লান্তি বোধ করিব না। তুমি আমায় যে কুশ কাশ-শরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ও কণ্টকীবৃক্ষের ভয় দেখাইতেছ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার সহিত গমনকালে তাহাদের স্পর্শ তুলা ও অজিনের ন্যায় কোমল হইবে।" এই বলিয়া তিনি রামের গলদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাম তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না, তিনি উঁহাকে বনে লইয়া যাইব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

শ্বশ্রূদিগকে প্রণাম করিয়া রামের সহিত সীতা বিলাস-ভূষণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জটা ও বল্কল ধারণ করিতে গেলেন। তিনি নিতান্ত মুগ্ধস্বভাবা, বল্কল কিরূপে ধারণ করিতে হয়, জানেন না, তিনি একখানি চীরবস্ত্র হস্তে ধারণ ও অপরখানি স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া শূন্যদৃষ্টিতে রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং অপ্রতিভমুখে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, 'স্বামিন্! চীর-ধারণ কিরূপে করিতে হয়?' রাম তখন সীতার কৌষেয় বস্ত্রের উপরি চীরদ্বয় সংযোগ করিয়া দিলেন। তাহার পর সীতা স্বামীর সহিত বনে বনে নানা কষ্ট পাইয়াছেন। পথপর্য্যটনে তিনি সর্ব্বদাই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। বিস্বাদ বনফল মাত্র তাঁহার আহার ছিল; পর্ণশয্যায় শয়ন ছিল; কিন্তু তাঁহার সে সকল কষ্ট কেবল রামমুখাবলোকন করিয়া দূর হইত। চিত্রকূট হইতে পঞ্চবটী-গমনসময়ে সীতা রামকে অকারণ বৈর করিতে নিষেধ করিয়া একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

যখন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, সে রথের উপরে তাঁহাকে কত বুঝাইতে লাগিল, "সীতে, আমিই তোমার যোগ্য পতি। তুমি আমার স্ত্রী হও, দেবতারাও তোমার অধীন হইবে। আমার পাটরাণীও তোমার দাসী হইবে। পাঁচ হাজার দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে।" সীতা

তাহার কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তাহাকে বলিলেন, "রামের সহিত তুলনায় তুমি শৃগালস্বরূপ, দাঁড়কাকস্বরূপ। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। তুমি আমায় হরণ করিতেছ, ইহার জন্য তোমায় সবংশে মরিতে হইবে।"

যখন রাবণের অশোকবনে তিনি বন্দী, রাবণ প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করে, তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করে; সীতা তাহাকে কেবল বলেন, "রাম-নামে পরম ধার্মিক পুরুষ, তিন লোকে বিখ্যাত, তাঁহার বাহু দীর্ঘ ও নয়ন বিশাল, তিনিই আমার স্বামী ও আমার দেবতা।"

অনেক দিন এইরূপে গেলে একদিন রাবণ বলিল, "তুমি যদি আর একমাসের মধ্যে আমায় স্বামী বলিয়া স্বীকার না কর, তোমার মাংসভোজন করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিব।" তখন পতিপরায়ণা সীতা অণুমাত্র ভীতা না হইয়া বলিলেন, "আমার এ শরীর সংজ্ঞাশূন্য, তুমি ইচ্ছা হয়, ইহাকে রক্ষা কর, ইচ্ছা হয়, ইহাকে নাশ কর, আমি শরীর ও জীবন কিছুই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি না।"

হনূমান্ আসিয়া অশোকবনমধ্যে সীতাকে দেখিলেন। সীতা শোকভারে আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত অশ্রুপাত করিতেছেন; রাবণ তাঁহার নিকট বহুসংখ্যক রাক্ষসী রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা দিনরাত তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতেছে, ভয় দেখাইতেছে, কখন বা তাঁহাকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিতেছে, কিন্তু তিনি আপন গুণে সেই ভয়ানক রাক্ষসপুরীমধ্যেও ত্রিজটা ও সরমা নামে দুই রাক্ষসীকে সখী পাইয়াছেন। তাহারা অবসর পাইলেই তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করে।

হনূমান্‌কে দেখিয়া সীতা অনেক দিনের পর আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি হনূমান্‌কে আশীর্ব্বাদ করিলেন, রামকে আপন মনের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। তখন তাঁহার ভরসা হইল, রাম তাঁহাকে অবশ্য উদ্ধার করিবেন।

রাবণবধের পর বিভীষণকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া রামচন্দ্র সীতাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সীতা উপস্থিত হইলে বলিলেন, "সীতে। আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিয়াছি, শত্রুনাশ করিয়াছি এবং কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছি। আজি বিভীষণাদির শ্রম সফল হইল।" এই সকল

কথা শুনিয়া সীতার মুখ উদ্ভাসিত হইল; আনন্দাশ্রুতে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গেল। তখন রাম গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "জানকি! আমার কর্ম্ম আমি করিয়াছি। কিন্তু তোমাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। তুমি পরগৃহে অনেকদিন বাস করিয়াছ। আমি সৎকুলপ্রসূত হইয়া তোমাকে গ্রহণ করিলে কেবল নিন্দাভাগী হইব মাত্র। অতএব তোমায় অনুমতি দিতেছি, তোমার যাহাকে ইচ্ছা হয়, আশ্রয় করিয়া জীবন রক্ষা কর।"

সীতা এই পরুষবাক্যে অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "স্বামিন্, তুমি আমাকে প্রাকৃত রমণীর ন্যায় ভাবিলেও আমি লঙ্কাপুরীর মধ্যে কি অবস্থায় বাস করিয়াছি, তোমার দূত হনুমান্ সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। অতএব এক্ষণে আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে? তুমি যে বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, সে কথা একবার মনেও করিলে না। আমার স্বভাব ও ভক্তির কথা সমস্তই ভুলিয়া গেলে?"

এই বলিয়া লক্ষ্মণকে চিতাসজ্জা করিতে কহিলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বহ্নিপ্রবেশসময়ে দেবতা ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "যেহেতু আমার মন কখনও রাম হইতে অপনীত হয় নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন। যেহেতু আমি কায়মনোবাক্যে রামচন্দ্রেরই সেবা করিয়াছি, অন্য কাহারও কথা কখনও মনে করি নাই, অতএব লোকসাক্ষী পাবক আমায় রক্ষা করুন।"

অগ্নিপ্রবেশ করিলে তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। সকলে ধন্য ধন্য বলিয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতে লাগিল।

সীতা কিছুকাল অযোধ্যায় রামগৃহে অবস্থান করিলে পর ভদ্রক নামে একজন লোক প্রসঙ্গক্রমে সভামধ্যে বলিল, "রাবণগৃহে বহুকাল থাকিলেও রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রজারা অনেকে তাঁহার নিন্দা করে।" রাম ক্ষত্রিয় পুরুষ, তাঁহার ধমনীতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়শোণিত প্রধাবিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সীতা-পরিত্যাগে সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, "তুমি আশ্রমগমনব্যপদেশে সীতাকে ভাগীরথীতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" লক্ষ্মণও সীতাকে লইয়া গেলেন। সীতা নিদারুণ পরিত্যাগসংবাদ শ্রবণ

করিয়া ক্ষণকাল হতচেতন হইয়া রহিলেন। পরে লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, নিরন্তর নিতান্ত দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহ সৃষ্ট হইয়াছিল। আমি পূর্ব্বজন্মে যে কি পাপ করিয়াছিলাম, কোন্ পতিপরায়ণা নারীকে অসহ্য পতিবিরহযন্ত্রণা দিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, নচেৎ নৃপতি আমায় কেন পরিত্যাগ করিবেন?" পুনশ্চ বলিলেন, "লক্ষ্মণ, তুমি আর্য্য-পুত্রকে বলিও যে, তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুন না কেন, তিনিই আমার পরম গতি। তাঁহাকে সর্ব্বদা আপন কর্ম্মে অবহিত হইতে বলিও।" এরূপ সময়েও সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত পতিকল্যাণকামনা করা প্রাকৃত রমণীর কার্য্য নহে। সীতার বাক্যের প্রত্যেক অক্ষরেই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাব এবং অলৌকিক প্রণয় প্রকাশ পাইতেছে।

অনাথা সীতা আবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিলেন এবং ঋষিরা আবার রামকে তাঁহার পুনর্গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন। রামও আবার সর্ব্ব-সমক্ষে সীতার পরীক্ষা লইতে সংকল্প করিলেন। এবার অগ্নিপরীক্ষা নহে—এবার শপথ। সীতা যখন সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার নয়ন স্বপদে অর্পিত, তাঁহার মনের ভাব কিরূপ তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। তাঁহার অলৌকিক অনির্ব্বচনীয় প্রণয় পূর্ব্ববৎই আছে; কিন্তু সভামধ্যে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা দেওয়ায় তাঁহার মনে দারুণ ধিক্কার উপস্থিত হইয়াছে; ক্ষত্র-রমণী-সুলভ তেজও বিলক্ষণ আছে। তিনি সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া করুণস্বরে স্বীয় জননী পৃথিবীদেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে এবং তাঁহার সকরুণ বচনাবলী পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও দ্রবীভূত হয় এবং সহৃদয় হৃদয়ে গভীর শোকসাগর উথলিয়া উঠে। তিনি বলিতে লাগিলেন, "যেহেতু রাম ভিন্ন অন্য কাহারও কথা আমি কখন মনেও করি নাই, অতএব হে দেবি পৃথিবি! তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু চিরকাল কায়মনোবাক্যে রামেরই পূজা করিয়া আসিতেছি; অতএব হে দেবি পৃথিবি! তুমি আমায় অবকাশ প্রদান কর। যেহেতু আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, অতএব হে দেবি! তুমি আমায় স্থান দেও।"

সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইল। ঋষিগণ অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সহসা প্রদীপ্তজ্যোতিঃ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধরণীদেবী আবির্ভূত হইলেন এবং সীতাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পাতালমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

সীতা সর্ব্বগুণসম্পন্না ছিলেন; তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহাকে যাদৃশ প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল, কোনকালে কোন নারী তাদৃশ প্রলোভনে পড়িয়াছিল কিনা সন্দেহ। অদৃষ্টের দোষে তাঁহাকে নানা কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তিনি রাজনন্দিনী ও সসাগরা ধরণী-পতির মহিষী হইয়াও একপ্রকার জন্মদুঃখিনী হইয়া ছিলেন। প্রথমতঃ স্বামীর সহিত বনে গেলেন। তথায় রাবণ তাঁহাকে হরণ করিল। তিনি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তাহার পর স্বামী তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সে দায়ে কোনরূপে উদ্ধার পাইলেন। আবার মিথ্যাপবাদভীত হইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এবার তিনি বনে বনে একাকিনী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে প্রায় যাবজ্জীবন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষকালে তিনি সশরীরে ভগবতী পৃথিবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন।

সীতা ও সাবিত্রী দুইজনই অদ্বিতীয়া রমণী। পৃথিবীর কোন দেশের কোন কবিই স্বীয় কল্পনাশক্তিবলে উঁহাদের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী সৃষ্টি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সীতার স্নেহপ্রবৃত্তি অলৌকিক, সুখ-দুঃখ বিপৎ-সম্পদ্ সকল সময়েই স্বামীর প্রতি তাঁহার মনোভাব অবিচলিত। দেবর লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার স্নেহ সর্ব্বদা সমান। দেবর তাঁহাকে বনমধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসিলেন, তথাপি তিনি উঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং গুরুজনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর বিরহে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাঁহাদের উভয়েরই বুদ্ধিবৃত্তি সমান প্রভাবশালিনী। সীতা রাবণের সহিত, সাবিত্রী যমরাজের সহিত কথোপকথনে ইহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সীতা অপেক্ষা সাবিত্রী কর্ম্মক্ষমতায় অনেক উৎকৃষ্ট। বাল্মীকি কোন স্থলেই সীতার কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দেন নাই। তিনি উঁহাকে সুশীলা ও

একান্ত সুধীরস্বভাবা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাবিত্রীও ধীরস্বভাবা সন্দেহ নাই, সময় উপস্থিত হইলে তিনি কোন শ্রমকেই শ্রম জ্ঞান করেন নাই; এবং এমন কষ্ট নাই যে, তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের দুইজনেরই মনের তেজস্বিতা আছে। যমরাজও সাবিত্রীর তেজস্বিতা স্বীকার করিয়াছেন। সীতাও দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময়ে উহার পরিচয় দিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা-বিষয়ে সাবিত্রী সীতা অপেক্ষা উন্নতস্বভাবা হইলেও তাঁহার স্নেহপ্রবৃত্তি সম্যক্ প্রকাশিত হয় নাই। সীতা ও সাবিত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতচরিত্রা বলিবার কারণ এই যে, তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহের যুগপৎ সমুন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়।

কারবালা-প্রান্তরে

মীর মশর্‌রফ হোসেন মরহুম

[ঊনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকদের মধ্যে মীর মশর্‌রফ হোসেনই অগ্রগণ্য। ইঁহার রচিত 'বিষাদসিন্ধু' পুস্তকখানি একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য। মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনার জন্য এই পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত দিলদুয়ারনিবাসী জমিদার গজনভী সাহেবের ম্যানেজার ছিলেন। এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি আজীবন বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইনিই বঙ্গীয় মুসলিম গদ্যসাহিত্যের প্রথম সার্থক সাধক ও স্রষ্টা। 'গাজী মিয়ার বোস্তানী' এবং 'ইসলামের জয়' নামক আরও দুইখানি পুস্তক লিখিয়া ইনি যশস্বী হ'ন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।]

হোসেন সপরিবারে ষষ্টিসংখ্যক অনুচর লইয়া কুফায় আশ্রয় লইতে চলিয়াছেন। ক্রমাগত চলিয়াছেন—কিন্তু কুফার পথের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইতেছেন না। একদিন হোসেনের অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া গেল। এইরূপ

কেন হইল? কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু মোহম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী হোসেনের মনে পড়িল। নির্ভীক হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। হোসেন গণনা করিয়া দেখিলেন, আজ মোহর্‌রম মাসের ৮ম তারিখ। ভয়ে ভয়ে অশ্বে কশাঘাত করিয়া কিঞ্চিৎ আগে গিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। যতদূর দৃষ্টি যায়, জীবজন্তর নামমাত্র নাই। আতপ-তাপ-নিবারণের উপযোগী কোনপ্রকার বৃক্ষও নাই, কেবলই প্রান্তর—মহা-প্রান্তর। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতি যেন 'হায়! হায়!' শব্দে চীৎকার করিয়া নিদারুণ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে। জনপ্রাণীর নামমাত্র নাই, কে কোথা হইতে শব্দ করিতেছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

হোসেন করুণ-স্বরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দান করিয়া সঙ্গিগণকে বলিতে লাগিলেন,—"ভাইসকল, হাস্যপরিহাস দূর কর; করুণাময় ঈশ্বরের নাম কর। আমরা বড় ভয়ানক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানের নাম করিতে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে, প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। ভাইসকল! মাতামহ বলিয়া গিয়াছেন, 'যে স্থানে তোমার অশ্বপদ মৃত্তিকায় দাবিয়া যাইবে, নিশ্চয় জানিও, সেই তোমার জীবনবিনাশের নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং তাহারি নাম, "দশ্‌তে কারবালা"।'

"মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়; পথ ভুলিয়া আমরা কার্‌বালায় আসিয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তোমরা কি কর্ণে কিছু শুনিতে পাইতেছ? দৈবশব্দ কিছু শুনিতেছ?"

তখন সকলেই মনোনিবেশ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দিকেই 'হায় হায়' রব। হোসেন বলিলেন,—"মাতামহ ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, 'চতুর্দ্দিক হইতে যে স্থানে "হায় হায়" শব্দ উত্থিত হইবে, নিশ্চয় জানিও সেই কার্‌বালা।' আমি কার্‌বালায় আসিয়াছি, আর উপায় কি? ভাইসকল, ঈশ্বরের নাম করিয়া গমনে ক্ষান্ত হও।" ক্রমে সঙ্গীরা সকলেই আসিয়া একত্র মিলিত হইল। যে যেখান হইতে ঐ হাহাকার শুনিল, সে সেখানেই অমনি বসিয়া পড়িল।

হোসেন বলিলেন,—"ভ্রাতৃগণ! আর চিন্তা কি? ঈশ্বরের নিয়মিত কার্য্যে ভাবনা কি? এই স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া, ঈশ্বরের উপর নির্ভর

করিয়া তাঁহারই নাম ভরসা করিয়া থাকিব। আমি জানি, ফোরাত নদী এই স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কত দূর এবং কোন্ দিকে তাহা নির্ণয় করিয়া, কেহ কেহ জল আহরণে প্রবৃত্ত হও।"

শিবির রচনা করিবার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে এবং রন্ধনের কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, শোণিতাক্ত কুঠারহস্তে বাষ্পাকুল-লোচনে তাহারা হোসেনের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল,—

"হজরত! এমন অদ্ভুত ব্যাপার আমরা কোন স্থানেই দেখি নাই, কোনদিন কাহারও মুখে শুনিও নাই; যে বৃক্ষের যে স্থানে কুঠারাঘাত করিলাম, সেই বৃক্ষে অজস্র শোণিত-ক্ষরণ দেখিয়া ভয় হইল। ভয়ে ভয়ে ফিরিয়া আসিলাম। এই দেখুন! আমাদের সকলের কুঠারে শোণিত-চিহ্ন বিদ্যমান।"

হোসেন কুঠারের গায়ে শোণিত-চিহ্ন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"নিশ্চয়ই এই কার্‌বালা। তোমরা সকলে এই স্থানে 'শহিদ্' হইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, তাহারই লক্ষণ ঈশ্বর এই শোণিত-চিহ্নে দেখাইতেছেন। উহাতে আর আশ্চর্য্যান্বিত হইও না, ঐ বন হইতেই কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনয়ন কর। দারু-রস শোণিতে পরিণত দেখিয়া ভীত হইও না।"

আরবদেশে দাসের অভাব নাই। যে সকল ক্রীতদাস হোসেনের সঙ্গে ছিল, তাহারা কয়েকজন একত্র হইয়া ফোরাতের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিয়া কাতরভাবে এমামের নিকট বলিতে লাগিল, "বাদ্‌শা নামদার, আমরা ফোরাত্ নদীর অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলাম। পশ্চিম দিকে গিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ফোরাত্ নদী কুল্ কুল্ রবে দক্ষিণবাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু নদীতীরে অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অতি সতর্কতার সহিত নদীর জল রক্ষা করিতেছে। যতদূর দৃষ্টির ক্ষমতা হইল, দেখিলাম, এমন কোন স্থান নাই যে, নির্বিঘ্নে একবিন্দু জল লইয়া পিপাসা-নিবৃত্তি করা যায়। আমরা সৈন্যদিগকে কিছু না বলিয়া যেমন নদীতীরের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, তাহারা অমনি অতি কর্কশ বাক্যে বিশেষ অপমানের সহিত আমাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বলিল,—'মহারাজ এজিদের আজ্ঞায় ফোরাত্ নদীকূল রক্ষিত হইতেছে। এই রক্ষক বীরগণের একটিরও প্রাণ বাঁচিয়া থাকিতে এক বিন্দু জলও কেহ লইতে পারিবে না'।"

ক্রমে সকলেই পিপাসার্ত্ত হইয়া হোসেনের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "জলাভাবে এত লোক মরে। পিপাসায় সকলেই শুষ্ক-কণ্ঠ, আর ত সহ্য হয় না।"

কাতর-কণ্ঠে হোসেন কহিলেন,—"কি করি। বিন্দুমাত্র জল পাইবার প্রত্যাশা আর নাই। ঈশ্বরের নামামৃত পান ভিন্ন পিপাসা-নিবৃত্তির আর এখন উপায় কি আছে? বিনা জলে যদি প্রাণ যায়, সকলেই সেই করুণাময় বিশ্ব-নাথের নাম করিয়া পিপাসা নিবৃত্ত কর। সকলেই আপন আপন স্থানে যাইয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ কর।"

সকলেই পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে ৯ই তারিখ কাটিয়া গেল, দশম দিনের প্রাতে হোসেনের শিবিরে মহাকোলাহল। 'প্রাণ যায়, আর সহ্য হয় না!' এই প্রকার গগনভেদী শব্দ উঠিতে লাগিল। পরিবারস্থ সকলের আর্ত্তনাদে এবং কাতরস্বরে হোসেন আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। উপাসনায় ক্ষান্ত দিয়া, হাস্‌নে বানু ও জয়নাবের বস্ত্রাবাসে যাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। কন্যা, পুত্র এবং অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা আসিয়া একবিন্দু জলের জন্য তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সাহার বানু দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তানটিকে ক্রোড়ে করিয়া আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ সাত রাত আট দিনের মধ্যে একবিন্দু জলও স্পর্শ করিলাম না। পিপাসায় আমার জীবন শেষ হউক, তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ করি না; কিন্তু স্তনের দুগ্ধ পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। এই দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রাণনাশের উপক্রম হইল। এই সময়ে একবিন্দু জল—কোন উপায়ে ইহার কণ্ঠে প্রবেশ করাইতে পারিলেও বোধ হয় বাঁচিতে পারিত।"

হোসেন বলিলেন, "জল কোথায় পাইব? এজিদের সৈন্যগণ ফোরাত্ নদীকূল অবরুদ্ধ করিয়াছে, জল আনিতে কাহারও সাধ্য নাই।"

সাহার বানু বলিলেন, "এই শিশু-সন্তানটির জীবন-রক্ষার্থে যদি আপনি নিজে গিয়াও ইহাকে কিঞ্চিৎ জল পান করাইতে পারেন, তাহাতেই বা হানি কি? একটি প্রাণ ত রক্ষা পাইবে? আমাদের জন্য আপনাকে যাইতে বলিতেছি না।"

হোসেন বলিলেন, "জীবনে কোন দিন শত্রুর নিকট কি বিধর্ম্মীর নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থী হই নাই। কাফেরের নিকট কোনকালে কিছু যাচ্ঞা করি নাই। জল চাহিলে কিছুতেই পাইব না। আর আমি এই শিশুর প্রাণ-রক্ষার কারণেই যদি তাদের নিকট জল ভিক্ষা করি, তবে আমি চাহিলে তাহারা জল দিবে কেন? আমাকে মনোবেদনা দিতেই ত তাহারা কার্‌বালায় আসিয়াছে, আমার জীবন বিনাশ করিবার জন্যই ত তাহারা ফোরাত্‌-কূল অবরুদ্ধ করিয়াছে।"

সাহার বানু বলিলেন, "তাহা যাহাই বলুন, এই দুগ্ধপোষ্য সন্তান দুগ্ধ-পিপাসায়—শেষে জল-পিপাসায় প্রাণ হারাইবে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে ইহা কিরূপে স্বচক্ষে দেখিব?"

হোসেন আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। সত্বর উঠিয়া গিয়া অশ্ব সজ্জিত করিয়া বলিলেন, "দাও! আমার ক্রোড়ে দাও! দেখি আমার সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া দেখি।"—এই বলিয়া হোসেন অশ্বে উঠিলেন। সাহার বানু সন্তানকে হস্তে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে স্বামীর ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন। হোসেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্বে কশাঘাত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে ফোরাত্‌ নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া নদীতীরস্থ সৈন্যগণকে বলিলেন, "ভাইসকল! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ মুসলমান থাক, তবে এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ জল দান কর। তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই, এই শিশু-সন্তানটির জীবন-রক্ষার্থে ইহার মুখের প্রতি চাহিয়া কিঞ্চিৎ জল দান কর।"

কেহই উত্তর করিল না, সকলেই একদৃষ্টে হোসেনের দিকে চাহিয়া রহিল। পুনরায় হোসেন বলিতে লাগিলেন, "ভাইসকল! এ সুদিন তোমাদের চিরকাল থাকিবে না, কোন দিন ইহার সন্ধ্যা হইবেই হইবে। পিপাসায় জল-দান মহাপুণ্য, তাহাতে আবার অল্পবয়স্ক শিশু। আমি সামান্য সৈনিক পুরুষ নহি; আমার পিতা মহামান্য হজরত আলী, মাতামহ নুরনবী হজরত মোহম্মদ, মাতা ফাতেমা-জোহরা খাতুন জেন্নাত; এই সকল পুণ্যাত্মাদিগের নাম স্মরণ করিয়াই এই শিশুসন্তানটির প্রতি অনুগ্রহ কর। মনে কর, যদি আমি তোমাদের নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইয়াও থাকি, এই দুগ্ধপোষ্য শিশু ত তোমাদের কোন অনিষ্ট করে নাই; ইহার জীবন রক্ষা কর।"

সৈন্যগণের মধ্যে একজন বলিল, "তোমার পরিচয় জানিলাম; তুমি হোসেন। তুমি সহস্র অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিলেও জল দিব না। তোমার পুত্র জল-পিপাসায় জীবন হারাইলে তাহাতে আর তোমার দুঃখ কি? তোমার জীবনও তো এখনই যাইবে। এই তোমার সকল জ্বালা-যন্ত্রণা একেবারে নিবারণ করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া সেই ব্যক্তি হোসেনের বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া এক বাণ নিক্ষেপ করিল। ক্ষিপ্রহস্ত-নিক্ষিপ্ত সেই সুতীক্ষ্ণ বাণ হোসেনের বক্ষে না লাগিয়া ক্রোড়স্থ শিশু-সন্তানের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া গেল। হোসেনের ক্রোড় রক্তে ভাসিয়া গেল।

হোসেন শিবির-সম্মুখে আসিয়া মৃত সন্তান ক্রোড়ে করিয়াই লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সাহার বানুর নিকট গিয়া বলিলেন, "ধর। তোমার পুত্র ক্রোড়ে লও। আজ বাছাকে স্বর্গের সুশীতল জল পান করাইয়া আনিলাম।" সাহার বানু সন্তানের বুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

মাৎসর্য্য

অশ্বিনীকুমার দত্ত

[১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রামে অশ্বিনীকুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজমোহন দত্ত। অশ্বিনীকুমার একজন বিখ্যাত দেশভক্ত নেতা ছিলেন। ইনি ধর্ম্মমূলক ও নীতিমূলক প্রবন্ধরচনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। 'ভক্তিযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থ এবং ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ক সঙ্গীতাবলী রচনার জন্য ইনি সাহিত্য-সমাজে চিরকাল সমাদৃত হইবেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

অপরের প্রতি প্রেমের বিস্তার মাৎসর্য্যের পরম ঔষধ। যে যাহাকে ভালবাসে সে কখনও তাহার শ্রী দেখিয়া কাতর হইতে পারে না;

ভালবাসার পাত্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে আনন্দেরই বৃদ্ধি হয়, কখন প্রাণে মাৎসর্য্য স্থান পাইতে পারে না। অতএব যাহার শ্রী দেখিলে কাতর হই, তাহার সদ্‌গুণ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া যদি কোন প্রকারে হৃদয়ে তাহার প্রতি ভালবাসার ভাব আনিতে পারি, তবে কখনও তাহার প্রতি মাৎসর্য্যের দ্বারা ক্লিষ্ট হইব না। এইরূপে যতই ভালবাসা অপর লোকের উপর ছড়াইয়া পড়িবে, ততই মাৎসর্য্যের হ্রাস হইবে। এইজন্য যাহাদিগের প্রতি কোনরূপ মাৎসর্য্যের ভাব হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তাহাদিগের সহিত সর্ব্বতোভাবে সৌহার্দ্দ্যস্থাপনের চেষ্টা কর্ত্তব্য।

সঙ্কীর্ণতা মাৎসর্য্যের প্রধান পোষক। যে মনে করে সুখ, সম্ভ্রম, সম্পদ্ যাহা কিছু ছিল, অমুক ব্যক্তি ভোগ করিয়া লইল, আমার জন্য ত কিছুই রহিল না ; সে পরের সুখ, সম্ভ্রম, সম্পদ্ দেখিলে প্রাণে কষ্ট পাইতে পারে ; কিন্তু যাহার মনে হয় এই প্রকাণ্ড পৃথিবী পড়িয়া রহিয়াছে, অন্তর্জগতে ও বহির্জগতে লোকের সুখী, সম্ভ্রান্ত অথবা সম্পত্তিশালী হওয়ার পথের অন্ত নাই, প্রত্যেকেরই পৃথিবীতে কোন না কোন প্রকারে শ্রেষ্ঠ হইবার অধিকার আছে, তাহার হৃদয়ে মাৎসর্য্য রাজত্ব করিতে পারে না। যত উদারতা-বৃদ্ধি, তত মাৎসর্য্যের নাশ।

পরনিন্দা মাৎসর্য্যের প্রধান সহচর। প্রাণের ভিতরে মাৎসর্য্যের অধিকার যত বিস্তৃত হয়, তত পরনিন্দায় জিহ্বা নৃত্য করিতে থাকে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি যত কমাইতে পারিবেন, মাৎসর্য্যও তত আঘাত পাইবে। পরনিন্দার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি দমনের জন্য দুইটি উপায় উৎকৃষ্ট। নিন্দুক আপনার স্বীয় জীবনের দোষগুলি সর্ব্বদা মনের সম্মুখে রাখিবেন। যে ব্যক্তি আপনার দোষগুলি সম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগরিত, সে ব্যক্তি পরের নিন্দা করিতে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারে না। আপনার দিকে তাকাইয়া তাহার মুখ শুকাইয়া যায়, সে আর পরের দোষের আলোচনা করিবে কি ? পরের দোষানুসন্ধান না করিয়া পরের গুণানুসন্ধান করিতে করিতে তাহাদিগের গুণকীর্ত্তন করিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস যত বৃদ্ধি পাইবে, পরনিন্দার প্রবৃত্তি তত কমিয়া যাইবে। সর্ব্বদা পরের গুণকীর্ত্তন যাঁহারা করেন, সেইরূপ লোকের সংসর্গ এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপকারী। নিতান্ত নিকৃষ্ট পাপীর

জীবনেরও গুণানুসন্ধান করিয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিলে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়। যাঁহার নিন্দা করিতে তোমার মন উৎসুক হইবে তাঁহার চরিত্রে ক্রমাগত গুণানুসন্ধান করিতে থাকিবে, কতকগুলি গুণ পাইবেই পাইবে, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যখনই আলাপ হইবে তখনই সেই গুণগুলির বিশেষ উল্লেখ করিবে ও তাহার মহত্ব ঘোষণা করিবে। এইরূপ করিতে থাকিলে ক্রমেই পরনিন্দার ইচ্ছা দূর হইবে ও পরগুণানুলোচনার অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে পারিবে।

যাহাতে প্রাণে ভাল হইবার জন্য প্রগাঢ় আবেগ জন্মে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ভাল হইতে যাঁহার বলবতী ইচ্ছা আছে, ঈর্ষা তাঁহার ভিতরে কার্য্য করিবার অবকাশ পায় না। ভাল হইবার জন্য যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, তিনি সর্ব্বদা পরের গুণকাহিনী শুনিয়া, পরের ভাল দেখিয়া দেখিয়া, আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন, পরের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাহার সময় থাকে না ও পরের মন্দ চিন্তা যে নিজের ভাল হইবার পথে কণ্টক, তাহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত, তাহার মন সর্ব্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার আর ভাল হইবার অবসর থাকে কোথায়? যাঁহার হৃদয়ে ভাল হইবার ইচ্ছা প্রবল তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই ভালটুকু নিজের জীবনে আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হন, তাঁহার মনে অপরকে অবনত করিয়া আপনার সমান না করিয়া, নিজে উন্নত হইয়া অপরের সমান হইবার জন্য যত্ন হয়। যে ব্যক্তি মাৎসর্য্যের দাস, সে নিজের উন্নতি ভুলিয়া পরের অবনতি কামনা করে; যাঁহার প্রাণে মাৎসর্য্য নাই, তিনি মনে করেন 'অন্যকে নামাইয়া আমার সমান না করিয়া আমি কেন উঠিয়া তাঁহার সমান না হই?' তাঁহার ঈর্ষার নাম শুনিতেও লজ্জা হয়।

মাৎসর্য্যের কুফল-চিন্তা মাৎসর্য্যদমনের প্রধান উপায়। যে ব্যক্তি ঈর্ষাগ্নিতে আপনার প্রাণটী আহুতি দেয়, তাহার অবস্থা শোচনীয়। যাহা দেখিলে মনুষ্যের প্রাণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়, ঈর্ষা তাহাই দেখিয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা পাইতে থাকে। সৌন্দর্য্য, সুখ, সাহস, সদ্‌গুণ দেখিলে কাহার না মনে আনন্দের সঞ্চার হয়? ঈর্ষীর প্রাণে তাহাই নরকাগ্নি প্রজ্বলিত

করিয়া দেয়। ভাল যাহার নিকটে মন্দ, সুধা যাহার নিকটে বিষ, স্বর্গ যাহার নিকটে নরক, পূর্ণ চন্দ্রের আলোক যাহার নিকটে অমানিশার অন্ধকার, তাহার যে কি দুঃখের অবস্থা তাহা কে বর্ণনা করিবে? সহস্র ব্যক্তি একজনের গুণগান করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিল, ঈর্ষীর কাণে যেই সেই ধ্বনি প্রবেশ করিল, অমনি তাহার প্রাণ যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল—বল' দেখি ইহার ন্যায় হতভাগ্য কে আছে?

যাহার দোষ-চিন্তা ও দোষ-দর্শনই ব্যবসায়, সে যে কিরূপ হতভাগ্য তাহা মনে করিলেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। যে ব্যক্তি চন্দ্রে কলঙ্ক ভিন্ন আর কিছু দেখে না, কুসুমে কীট ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারে না, মৃণালে কণ্টক ভিন্ন আর কিছু বুঝে না, তাহার ন্যায় দুঃখী এ জগতে আর কে? ঈর্ষীর প্রাণ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন, কণ্টকাকীর্ণ, ক্লেদপূর্ণ। ভগবান্ সকলকে ঈর্ষার হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

ঈর্ষা হলাহলের ন্যায় অস্থি পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে, ঈর্ষীর দিবানিশি প্রাণে অসুখ। সর্ব্বদা তাহার প্রাণে কষ্ট। তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না। হৃদয়ের স্বাচ্ছন্দ্য চলিয়া যায়।

এ জগতে বিবাদ বিসংবাদ প্রায়ই ঈর্ষামূলক দেখিতে পাই। কত কত ব্যক্তি, কত কত জাতি, ঈর্ষানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটি কথা মনে রাখিলে ঈর্ষাকে হৃদয়ে স্থান দিতে অনেকেরই লজ্জাবোধ হইবে। লর্ড বেকন বলিয়াছেন, 'যাহার নিজের গুণ নাই সে অপরের গুণ দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হয়। যাহার অপরের গুণ আয়ত্ত করিবার ভরসা নাই, সেই অপরকে টানিয়া নামাইয়া তাহার সমান করিতে চেষ্টা করে।' বাস্তবিক নিতান্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন কেহ ঈর্ষাকে স্থান দিতে পারে না। যাহার নিজের ভাল হইবার শক্তি নাই, অথচ পরের ভাল সহ্য হয় না, এরূপ ব্যক্তিই ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া থাকে। যে ভাল হইতে পারে সে অপরের ভাল দেখিয়া অবশ্য ভাল হইয়া তাহার সমান হইবার চেষ্টা করে, সে অপরের কখনও মন্দ কামনা করে না; আর যে আপনার মধ্যে ভাল হইয়া অপরের সমান হইবার শক্তি দেখিতে পায় না, তাহার মনে ইচ্ছা হয়

যে, সেই ব্যক্তি ক্রমে নিম্নে আসিয়া তাহার সমান হউক। দুর্ব্বল, ইতর হৃদয় ঈর্ষার ভিত্তি—ইহা যাঁহার উপলব্ধি হইবে, তিনি কখন ঈর্ষার বশবর্তী হইবেন না।

ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে

জগদীশচন্দ্র বসু

[আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামের একটি প্রাচীন বংশে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এ. ডিগ্রী, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এস-সি. ডিগ্রী এবং পরে ডি.এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। জগদীশচন্দ্র বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদিগের অন্যতম। উদ্ভিদ্-বিদ্যাক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার জন্য ইনি বৈজ্ঞানিক জগতে খ্যাতিলাভ করেন। গভর্ণমেন্ট ইঁহাকে 'স্যর' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইঁহার "অব্যক্ত" নামক পুস্তক ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত Response of the Living and the Non-Living নামক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

আমাদের বাড়ীর নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল। বৎসরের এক সময়ে কূল প্লাবন করিয়া জলস্রোত বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত; আবার হেমন্তের শেষে ক্ষীণকলেবর ধারণ করিত। প্রতিদিন জোয়ারভাটায় বারিপ্রবাহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতাম। নদীকে আমার একটি গতিপরিবর্ত্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত। সন্ধ্যা হইলেই একাকী নদীতীরে আসিয়া বসিতাম। ছোট-ছোট তরঙ্গগুলি তীরভূমিতে প্রতিহত হইয়া কুলু কুলু গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইত। যখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিত এবং বাহিরের কোলাহল একে একে নীরব হইয়া যাইত, তখন নদীর সেই কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে কত কথাই শুনিতে পাইতাম! কখন মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া

যাইতেছে, ইহা ত কখনও ফিরে না ; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" নদী উত্তর করিত, "মহাদেবের জটা হইতে।" তখন ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন-বৃত্তান্ত স্মৃতিপটে উদিত হইত।

তাহার পর, বড় হইয়া নদীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা শুনিয়াছি ; কিন্তু যখনই শ্রান্তমনে নদীতীরে বসিয়াছি, তখনই সেই চিরাভ্যস্ত কুলু কুলু ধ্বনির মধ্যে সেই পূর্ব্বকথা শুনিতাম, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একবার নদীতীরে আমার এক প্রিয়জনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে ভস্মীভূত হইতে দেখিলাম। আমার সেই আজন্মপরিচিত বাৎসল্যের বাস-মন্দির সহসা শূন্যে পরিণত হইল। সেই স্নেহের এক গভীর বিশাল প্রবাহ কোন্ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় দেশে বহিয়া চলিয়া গেল? যে যায়, সে ত আর ফিরে না ; তবে কি সে অনন্তকালের জন্য লুপ্ত হয়? মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিসমাপ্তি? যে যায়, সে কোথায় যায়? আমার প্রিয়জন আজ কোথায়?

তখন নদীর কলধ্বনির মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "মহাদেবের পদতলে।"

চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল, কুলু কুলু শব্দের মধ্যে শুনিতে পাইলাম, "আমরা যথা হইতে আসি, আবার তথায় ফিরিয়া যাই। দীর্ঘ প্রবাসের পর উৎসে মিলিত হইতে যাইতেছি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথা হইতে আসিয়াছ, নদি?" নদী সেই পুরাতন স্বরে উত্তর করিল, "মহাদেবের জটা হইতে।"

একদিন আমি বলিলাম, "নদি, আজ বহুকাল অবধি তোমার সহিত আমার সখ্য। পুরাতনের মধ্যে কেবল তুমি! বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত তুমি আমার জীবন বেষ্টন করিয়া আছ, আমার জীবনের এক অংশ হইয়া গিয়াছ ; তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, জানি না। আমি তোমার প্রবাহ অবলম্বন করিয়া তোমার উৎপত্তিস্থান দেখিয়া আসিব।"

শুনিয়াছিলাম, উত্তর-পশ্চিমে যে তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়, তথা হইতে জাহ্নবীর উৎপত্তি হইয়াছে। আমি সেই শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া, বহু গ্রাম, জনপদ ও বিজন অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কূর্ম্মাচল নামক পুরাণপ্রথিত দেশে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে সরযূনদীর উৎপত্তি-স্থান

দর্শন করিয়া দানবপুরে আসিলাম। তাহার পর, পুনরায় বহুল গিরিগহন লঙ্ঘনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম।

একদিন অতীব বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা, তাহাদের পার্শ্বদেশে নিবিড় অরণ্যানী; এক অভ্রভেদী শৃঙ্গ তাহার বিরাট্ দেহ-দ্বারা পশ্চাতের দৃশ্য অন্তরাল করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার পথিপ্রদর্শক বলিল, "এই শৃঙ্গে উঠিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। নিম্নে যে রজতসূত্রের ন্যায় রেখা দেখা যাইতেছে, উহাই বহু দেশ অতিক্রম করিয়া তোমাদের দেশে অতি বেগবতী, কূলপ্লাবিনী, স্রোতস্বতী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। সম্মুখস্থ শিখরে আরোহণ করিলেই দেখিতে পাইবে, এই সূক্ষ্ম সূত্রের আরম্ভ কোথায়।"

এই কথা শুনিয়া আমি সমুদয় পথশ্রম বিস্মৃত হইয়া নব উদ্যমে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলাম। আমার পথিপ্রদর্শক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "সম্মুখে দেখ, জয় নন্দাদেবী! জয় ত্রিশূল!"

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে পর্ব্বতমালা আমার দৃষ্টি অবরোধ করিয়া ছিল। এখন উচ্চতর শৃঙ্গে আরোহণ করিবামাত্র আমার সম্মুখে আবরণ অপসৃত হইল। দেখিলাম, অনন্ত-প্রসারিত নীল নভোমণ্ডল। সেই নিবিড় নীলস্তর ভেদ করিয়া দুই শুভ্র তুষার-মূর্ত্তি শূন্যে উত্থিত হইয়াছে। একটি গরীয়সী রমণীর ন্যায়। মনে হইল যেন আমার দিকে সস্নেহ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। যাঁহার বিশাল বক্ষে বহু জীব আশ্রয় ও বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মূর্ত্তি সেই মাতৃরূপিণী ধরিত্রীর বলিয়া চিনিলাম। ইহার অনতিদূরে মহাদেবের ত্রিশূল স্থাপিত। এই ত্রিশূল পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া মেদিনী-বিদারণপূর্ব্বক শাণিত অগ্রভাগ-দ্বারা আকাশ বিদ্ধ করিতেছে। ত্রিভুবন এই মহাস্ত্রে গ্রথিত! *

এইরূপে পরস্পরের পার্শ্বে, সৃষ্ট জগৎ ও সৃষ্টিকর্ত্তার হস্তের আয়ুধ সাকার-রূপে দর্শন করিলাম। এই ত্রিশূল যে স্থিতি ও প্রলয়ের চিহ্নরূপী, তাহা পরে বুঝিলাম।

* কুমায়ুনের উত্তরে দুই তুষার-শিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

আমার পথিপ্রদর্শক বলিল, "সম্মুখে এখনও দীর্ঘ পথ রহিয়াছে; উহা অতীব দুর্গম; দুই দিন চলিলে পর তুষার-নদী দেখিতে পাইবে।"

সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীত এত দিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল, সহসা যেন কোনো ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন, নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড ঊর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে, যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোনো মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিকখনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশালক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী, বহুদূর-প্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার-নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হই-তেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, মধ্যে ঘন কুজ্ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

তুষার-নদীর উপর দিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময়ে পর্ব্বতদেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে, সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্দ্ধে উঠিতেছি বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমগ্র পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জল-প্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলুমুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই গঙ্গে পারিজাত-বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্পবর্ষণ করিতেছে; দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া

শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষার-পর্ব্বতের বজ্রনিনাদ স্থির করিতে পারিলাম না।

কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়া ছিল, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শীর্ষোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতি বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূমরাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে, এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীব্যাপী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

শিব ও রুদ্র। রক্ষক ও সংহারক। এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। মানস-চক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র-স্থাপিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়-রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।

সম্মুখে আকাশভেদী যে পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতেছি, হিমাণুরূপ বারিকণা উহাদের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; প্রবেশ করিয়া মহাবিক্রমে উহাদের দেহ বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুত শিখর বজ্রনিনাদে নিম্নে পতিত হইতেছে।

বারিকণারাই নিম্নে শুভ্র তুষার-শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। ভগ্ন শৈল এই তুষার-শয্যায় শায়িত হইল। তখন কণাগুলি একে অন্যকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, আমরা ইহার অস্থি দিয়া পৃথিবীর দেহ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করি।"

কোটি কোটি ক্ষুদ্র হস্ত অসংখ্য অণুপ্রমাণ শক্তির মিলনে, অনায়াসে সেই পর্ব্বতভার বহিয়া নিম্নে চলিল। কোন পথ ছিল না, পতিত পর্ব্বতখণ্ডের ঘর্ষণেই পথ কাটিয়া লইল—উপত্যকা রচিত হইল। পর্ব্বতগাত্রে ঘৃষ্ট হইতে হইতে উপলস্তূপ চূর্ণীকৃত হইল।

আমি যে স্থানে বসিয়া আছি, তাহার উভয়তঃ তুষারবাহিত প্রস্তরখণ্ড রাশীকৃত রহিয়াছে। ইহার নিম্নেই তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া

ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিৎ পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিপ্রদেশ অতিবর্ত্তন করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে।

পথে একস্থানে উভয়কূলস্থ দেশ মরুভূমিপ্রায় হইয়াছিল। নদী তট উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ প্লাবিত করিল। পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ-সংযোগে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা-শক্তি বর্দ্ধিত হইল। কঠিন পর্ব্বতের দেহাবশেষ-দ্বারা বৃক্ষলতার সজীব শ্যামদেহ নির্ম্মিত হইল।

বারিকণাগণই বৃষ্টিরূপে পৃথিবী ধৌত করিতেছে, এবং মৃত ও পরিত্যক্ত দ্রব্য বহন করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছে। তথায় মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। সমুদ্রে মিলিত বারিকণাকুল সর্ব্বদা বিতাড়িত হইয়া বেলাভূমি ভঙ্গ করিতেছে। জলকণা কখনও ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া পাতালপুরস্থ অগ্নিকুণ্ডে আহুতি-স্বরূপ হইতেছে। সেই মহাযজ্ঞোত্থিত ধূমরাশি পৃথিবী বিদারণ করিয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার-রূপে প্রকাশ পাইতেছে; সেই মহাতেজে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; ঊর্দ্ধভূমি অতলে নিমজ্জিত ও সমুদ্রতল উন্নত হওয়ায় নূতন মহাদেশ নির্ম্মিত হইতেছে।

সমুদ্রে পতিত হইয়াও বারিবিন্দুগণের বিশ্রাম নাই। সূর্য্যের তেজে উত্তপ্ত হইয়া ইহারা ঊর্দ্ধে উড্ডীন হইতেছে। ইহারাই একদিন অশনি ও ঝঞ্ঝাবলে পর্ব্বতশিখরাভিমুখে ধাবিত হইয়া, তথায় বিপুল জটাজাল-মধ্যে আশ্রয় লইবে; আবার কালক্রমে বিশ্রামান্তে পর্ব্বতপৃষ্ঠে তুহিনাকারে পতিত হইবে। এই গতির বিরাম নাই, শেষ নাই।

এখনও ভাগীরথী-তীরে বসিয়া তাহার কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ করি। এখনও তাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় কথা শুনিতে পাই। এখন আর বুঝিতে ভুল হয় না।

"নদি, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?"—ইহার উত্তরে এখন সুস্পষ্ট স্বরে শুনিতে পাই—

"মহাদেবের জটা হইতে।"

লোকনায়ক অশ্বিনীকুমার

বিপিনচন্দ্র পাল

[শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত পৈল গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপিনচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'সন্ধ্যা,' 'প্রবাহিণী,' 'বঙ্গদর্শন' (নব পর্য্যায়), 'বিজয়া,' 'নারায়ণ' প্রভৃতি পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ইনি সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার প্রত্যেক লেখায় চিন্তাশীলতা ও বিদ্যাবত্তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার প্রণীত 'চরিত্র-চিত্র' গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে। বিপিনচন্দ্র বাঙ্গালার, তথা ভারতের, অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

প্রকৃত লোকনায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। এক সময়ে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে যে শ্রেণীর লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে ক্রমশই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃ-পিতামহেরা যেভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্মক হইয়া বাস করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তাঁহারাও সময়ে সময়ে, বিষয়কর্ম্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়া দূরদূরান্তে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই বাস করিতেন। যে ক্ষেত্রে তাঁহারা পরিবার-সঙ্গে কর্ম্মস্থলে যাইতেন, সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণগত অন্তরঙ্গ যোগ কখনও নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে তাঁহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিতেন, গ্রামে আসিয়া, আপনার আত্মীয়কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের মধ্যেই সে অর্থ ব্যয় করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাঁহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী হইত; সাক্ষাৎভাবে তাহারা তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠার দ্বারা সময়ে অসময়ে অনেক সাহায্য লাভ করিত। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম্মে, দোলদুর্গোৎসবাদি নৈমিত্তিক পূজাপার্ব্বণে, নিত্য দেবসেবা ও অতিথিসেবার ভিতর দিয়া, গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা নিকট সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হইয়া যাইত। আর এইজন্য, তাঁহারা যেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেন, শত শত লোকে সেখানে যাইয়া তাঁহাদের

পুষ্টপোষক হইয়া দাঁড়াইত। তাঁহারা যে কাজ করিতে যাইতেন, সকলে সে কাজে রত হইত। তাঁহারা যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিনা ওজরে, বিনা বিচারে সে পথ ধরিয়া চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোকনেতৃত্ব ছিল। ইহারাই সেকালে প্রকৃত লোক-নায়ক ছিলেন।

আর আজ—'তে হি নো দিবসা গতাঃ'। সে দিনও নাই—সে সমাজও নাই। লোকে লেখাপড়া শিখিয়া, যাহারা লেখাপড়া জানে না তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে 'শিক্ষিত' ও 'অশিক্ষিতে'র, 'বিজ্ঞে'র ও 'অজ্ঞে'র মধ্যে এককালে এরূপ সাঙ্ঘাতিক ব্যবধান ছিল না। গ্রামের বিদ্যাভূষণ বা তর্কসিদ্ধান্ত বা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে আপামরসাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে, যখন তিনি শিষ্যমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্মৃতি বা ন্যায়ের অধ্যাপনা করিতেন, তখনও গ্রামের চাষী ও ব্যবসায়ীরা তাঁহার কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত এবং নানাভাবে তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত। তাহাদের সঙ্গে তাঁহার বিদ্যার ব্যবধান যাহাই থাকুক না কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশী ছিল না।

আর এই এক-প্রাণতানিবন্ধন, দেশের আপামরসাধারণে এ সকল উদার-চরিত ব্রাহ্মণের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়াও, তাহাদের চরিত্রের প্রভাবে, কথা-বার্ত্তার গুণে, উপদেশে ও অনুশাসনে অনেকটা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুল পাঠশালায় মিলে না। আমরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায়, ভাবে, আদর্শে, অভ্যাসে সকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিষ্টি লাগে না, আমাদের কথাও তাহাদের বোধগম্য হয় না। তাহাদের আমোদপ্রমোদে আমরা প্রাণের সঙ্গে প্রাণ দিতে পারি না; আমাদের উৎসবব্যসনাদিতেও তাহারা আমাদের কাছে ঘেঁষিতে পারে না।

এক অশ্বিনীকুমারের পক্ষে ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরেজিনবিশদিগের মত জীবনটা কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া, কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে, আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করেন।

বহুদিন পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারের একবার কলিকাতা আসিয়া বাস করিবার প্রস্তাব হয়, এরূপ শুনিয়াছি। প্রবীণ সাহিত্যিক, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রায়ই দেওঘরে যাইয়া বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। অশ্বিনীকুমারের কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিয়া, রাজনারায়ণবাবু তাঁহাকে এমন আত্মঘাতী কর্ম্ম করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেন। অশ্বিনীকুমার যদি এ নিষেধ না শুনিতেন, আমাদের দশজনের মত যদি তিনি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সে স্থান কিছুতেই পাইতেন না, ইহা নিশ্চয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বিশেষভাবে আমাদের মধ্যে ছাত্রদের কাছ হইতে অল্প বেতন লইয়া উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। আজিকালি দেশে এ শ্রেণীর অনেকগুলি বেসরকারী স্কুল-কলেজ হইয়াছে, কিন্তু এক বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত এই বেসরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃগণের প্রায় অপর সকলেই এগুলিকে জীবিকা উপার্জনের একটি প্রশস্ত উপায়রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা করেন নাই। সে প্রয়োজনও তাঁহার ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে অশ্বিনীকুমারের মত আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থ ভাবে স্বদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। এইজন্য আজ পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালনা-কার্য্যে কোনও প্রকারের ব্যবসাদারির পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন; কখনো তাহার এক কপর্দ্দকেরও প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এইজন্যই বোধ হয়, তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, ইংরেজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচচা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বদেশী আন্দোলন যে পূর্ব্ববঙ্গে এতটা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা। স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, অশ্বিনীকুমার কখনো এমনটা মনে করেন নাই। শিষ্যদিগের চরিত্রগঠনের জন্যও তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্রগঠনের উপায় কেবলমাত্র উপদেশ নহে, সদনুষ্ঠানই প্রধান উপায়। অশ্বিনীকুমার আপনার স্কুল ও কলেজের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন।

চরিত্রগঠনের মূলে পরার্থপরতা। লোকসেবার ভিতর দিয়া যেভাবে ও যে পরিমাণে এই পরার্থপরতা সাধন করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়ে তাহা পারা যায় না। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা দল বাঁধিয়া বরিশালের আর্ত্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বহুদিন হইতেই বরিশালে মাঝে মাঝে বিসূচিকার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকেরা সে সব সময়ে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে পল্লীগ্রাম হইতে বহুলোক সর্ব্বদাই বরিশালে যাতায়াত করে। বরিশাল মুসলমানপ্রধান স্থান। সহরের এই সকল অভ্যাগতদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যাই বেশী হয়। ইহারা শহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া থাকে। এই সকল হোটেলের স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থাই যে নাই, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র ; বিশেষতঃ আপনার পরিবার-পরিজন হইতে দূরে আসিয়া এরূপ বন্ধুহীন স্থানে বিসূচিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত না দুর্গতি হয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা সর্ব্বদা নিতান্ত আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ইহাদিগের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়াছেন।

অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপন্ন লোকের ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের মৃতদেহের সৎকার পর্য্যন্ত করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কখনো কোনদিন কোনো প্রকারের জাতিবর্ণের বিচার করেন নাই। আকালে, অন্নকষ্টে, হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে ইঁহারা দেশের এবং বিদেশের সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিপন্ন জনের ক্ষুন্নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন।

অশ্বিনীকুমারের লোকসেবা কেবল যে শহরে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। বহুদিন হইতে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কতকটা নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আর কতকটা আপনার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষেও তিনি আপনার জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। এই সকল সফরের সময়ে দেশের গরীব লোকেরা সর্ব্বদাই নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য ও সেবা পাইয়া আসিয়াছেন। অশ্বিনী-কুমারের নৌকা কোথাও আসিয়াছে, শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর-মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগী ঔষধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায়, জিজ্ঞাসু উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছু নাই, সেও তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়া কেবলমাত্র কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়।

কি সহজ উপায়ে, তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে অনেক সময়ে তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটি সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িল।

বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান্ স্বদেশসেবক নমঃশূদ্রকে একদিন কেহ বলেন যে, "বাবুরা ত 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া ভাই-ভাই এক ঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাদের ভাই; কথাটি মন্দ নয়?" এ কথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনী-বাবু সেই অঞ্চলেই উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নমঃশূদ্র স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনী-কুমারের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়া ছিলেন। শয্যার নিকটেই একটি ফরাস পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটি অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তারপর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটি বলিলেন—"বাবু, আমি আপনাকে

একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিয়াছি, 'বন্দে মাতরম্' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।"

ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে কি সহজ, কি সামান্য ও স্বাভাবিক উপায়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার এই অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের একবৎসরবয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালনকার্য্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাতাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন, সুতরাং অনুকূল বাবুর উপর রাইচরণের পূর্ব্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্ব্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের

একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসঙ্গত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য্য ও বিচার-শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব্ব বিস্ময়ে বলিত, "মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর কোনো মানবসন্তান যে, এই বয়সে চৌকাঠ লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন।" বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া যোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্ত্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথার একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পূরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়া ছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাই-চরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকা-তীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্য্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "চন্ন ফু।"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ব-বৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্ব-ফুল ফুটিয়া ছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্ব-ফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়া-ছিল যে, সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখী—ওই উড়ে—এ গেলো। আয়রে পাখী আয় আয়"—এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষতঃ চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখী লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, "তবে তুমি গাড়িতে ব'সে থাকো, আমি চট্ ক'রে ফুল তুলে আনচি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব-বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব-ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্ব-ফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, "বাবু—খোকাবাবু, লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন-হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু, খোকাবাবু আমার" ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মাঠাক্‌রুণের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, "জানিনে মা।"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল, পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে একদল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাতাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চা'স্ তোকে দেবো।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে! গৃহিণী বলিলেন, "কেন? তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।"

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সংবরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশি দিন ভোগ করিতে পারিত না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই

শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্না—রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্না—যথাসময় পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তখন মাঠাক্রুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা, হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল, "আহা মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল, তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে!"—তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে, সেজন্য বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারী হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেল্নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোত-জমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতা লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরির জোগাড় করিয়া ফেল্নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, বৎস, ভালবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোন অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এমন করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং সৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ, সেবায় ভৃত্য

ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত, সেখানকার ছাত্রগণ রাইচরণকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিত, এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল-স্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্ম্মে সর্ব্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলি ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে ব্যক্তি পূরা বেতন দেয় বার্দ্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজ-কাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্ব্বদাই খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্ম্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল,—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মতো দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল বাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহুমূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্ব্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল—"জয় হোক্ মা।"

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে রে?"

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি রাইচরণ।"

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, "মাঠাক্‌রুণকে একবার প্রণাম করিতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাক্‌রুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া জোড়হস্তে কহিল—"প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—"

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কিরে। কোথায় সে।"

"আজ্ঞে, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সেদিন রবিবার কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষে দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া অতৃপ্ত নয়নে মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকারপ্রকারে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনো প্রমাণ আছে?"

রাইচরণ কহিল—"এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান্ জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।"

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনি হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তাহা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে?—

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন—"কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।"

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।"

কর্ত্রী বলিলেন, "আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাফ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাফ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, "সে আমি নয় প্রভু।"

"তবে কে?"

"আমার অদৃষ্ট।"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, "পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।"

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা উহাকে মাফ করো। বাড়ীতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য

লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে ও নামে কোনো লোক নাই।

ইচ্ছাপূরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুবলচন্দ্রের ছেলেটির নাম সুশীলচন্দ্র। কিন্তু সকল সময়ে নামের মতো মানষটি হয় না; সেইজন্যই সুবলচন্দ্র কিছু দুর্ব্বল ছিলেন এবং সুশীলচন্দ্র বড়ো শান্ত ছিলেন না।

ছেলেটি পাড়াশুদ্ধ লোককে অস্থির করিয়া বেড়াইত, সেইজন্য বাপ মাঝে মাঝে শাসন করিতে ছুটিতেন; কিন্তু বাপের পায়ে ছিল বাত, আর ছেলেটি হরিণের মত দৌড়িতে পারিত; কাজেই কিল, চড়চাপড় সকল সময় ঠিক জায়গায় পড়িত না, কিন্তু সুশীলচন্দ্র দৈবাৎ যেদিন ধরা পড়িতেন, সেদিন তাঁহার আর রক্ষা থাকিত না।

আজ শনিবারের দিনে দুটোর সময় স্কুলের ছুটি ছিল, কিন্তু আজ স্কুলে যাইতে সুশীলের কিছুতেই মন উঠিতেছিল না, তাহার অনেকগুলা কারণ ছিল। একে তো আজ স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষা, তাহাতে আবার ও-পাড়ার বোসেদের বাড়ী আজ সন্ধ্যার সময় বাজি পোড়ানো হইবে। সকাল হইতে সেখানে ধুমধাম চলিতেছে, সুশীলের ইচ্ছা, সেইখানেই আজ দিনটা কাটাইয়া দেয়।

অনেক ভাবিয়া, শেষকালে স্কুলে যাইবার সময় বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার বাপ সুবল গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, বিছানায় প'ড়ে আছিস্ যে? আজ স্কুলে যাবিনে?"

সুশীল বলিল, "আমার পেট কামড়াচ্ছে, আজ আমি স্কুলে যেতে পারব না।"

সুবল তাহার মিথ্যা কথা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বলিলেন, রোস, একে আজ জব্দ ক'রতে হবে। এই বলিয়া কহিলেন, "পেট কামড়াচ্ছে? তবে আর তোর কোথাও গিয়ে কাজ নেই, বোসেদের বাড়ী বাজি দেখতে হরিকে একলাই পাঠিয়ে দেব তখন। তোর জন্যে আজ লজঞ্চুস কিনে রেখেছিলুম সেও আজ খেয়ে কাজ নেই। তুই এখানে চুপ ক'রে প'ড়ে থাক্, আমি খানিকটা পাচন তৈরী ক'রে নিয়ে আসি।"

এই বলিয়া তাহার ঘরে শিকল দিয়া সুবলচন্দ্র খুব তিতো পাচন তৈয়ার করিয়া আনিতে গেলেন, সুশীল মহামুস্কিলে পড়িয়া গেল। লজঞ্চুস সে যেমন ভালবাসিত, পাচন খাইতে হইলে তাহার তেমনি সর্ব্বনাশ বোধ হইত। ওদিকে আবার বোসেদের বাড়ী যাইবার জন্য কাল রাত হইতে তাহার মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; তাহাও বুঝি বন্ধ হইল।

সুবলবাবু যখন খুব বড়ো এক বাটি পাচন লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, সুশীল বিছানা হইতে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পেট কামড়ানো একেবারে সেরে গেছে, আমি আজ স্কুলে যাব।"

বাবা বলিলেন, "না না, সে কাজ নেই, তুই পাচন খেয়ে এইখানে চুপচাপ ক'রে শুয়ে থাক্।" এই বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া পাচন খাওয়াইয়া ঘরে তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুশীল বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবল মনে করিতে লাগিল, আহা! যদি কালই আমার বাবার মতো বয়স হয়, আমি যা ইচ্ছে তাই ক'র্‌তে পারি, আমাকে কেউ বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারে না।

তাহার বাপ সুবলবাবু বাহিরে একলা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার বাপ মা আমাকে বড়ো বেশি আদর দিতেন ব'লেই তো আমার ভালো রকম পড়াশুনা কিছু হোল না। আহা! আবার যদি সেই ছেলেবেলা ফিরে পাই, তা-হোলে কিছুতেই সময় নষ্ট না ক'রে কেবল পড়াশুনো ক'রেনি।

ইচ্ছা ঠাক্‌রুণ সেই সময় ঘরের বাহির দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি বাপের ও ছেলের মনের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, আচ্ছা ভালো, কিছুদিন ইহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াই দেখা যাক।

এই ভাবিয়া বাপকে গিয়া বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কাল হইতে তুমি তোমার ছেলের বয়স পাইবে।" ছেলেকে গিয়া বলিলেন, "কাল হইতে তুমি তোমার বাপের বয়সী হইবে।" শুনিয়া দুইজনে ভারী খুশী হইয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধ সুবলচন্দ্র রাত্রে ভালো ঘুমাইতে পারিতেন না, ভোরের দিকটায় ঘুমাইতেন, কিন্তু আজ তাঁহার কী হইল, হঠাৎ খুব ভোরে উঠিয়া একেবারে লাফ দিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দেখিলেন খুব ছোট হইয়া গেছেন; পড়া দাঁত সবগুলি উঠিয়াছে; মুখের গোঁফ দাড়ি সমস্ত কোথায় গেছে, তাহার আর চিহ্ন নাই। রাত্রে যে ধুতি এবং জামা পরিয়া শুইয়াছিলেন, সকালবেলায় তাহা এত ঢিলা হইয়া গেছে যে, হাতের দুই আস্তিন প্রায় মাটি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, জামার গলা বুক পর্য্যন্ত নামিয়াছে, ধুতির কোঁচাটা এতই লুটাইতেছে যে পা ফেলিয়া চলাই দায়।

আমাদের সুশীলচন্দ্র অন্য দিন ভোরে উঠিয়া চারিদিকে দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ান, কিন্তু আজ তাহার ঘুম আর ভাঙ্গে না। যখন তাহার বাপ সুবলচন্দ্রের চেঁচামেচিতে সে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল, কাপড়চোপড়গুলো গায়ে এমনি আঁটিয়া গেছে যে ছিঁড়িয়া ফাটিয়া কুটি কুটি হইবার যো হইয়াছে; শরীরটা সমস্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে; কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়িতে অর্দ্ধেকটা মুখ দেখাই যায় না; মাথায় এক মাথা চুল ছিল, হাত দিয়া দেখে, সামনে চুল নাই—পরিষ্কার টাক তক্ তক্ করিতেছে।

আজ সকালে সুশীলচন্দ্র বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে চায় না। অনেকবার তুড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাই তুলিল; অনেকবার এপাশ ওপাশ করিল; শেষ-কালে বাপ সুবলচন্দ্রের গোলমালে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

দুই জনের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু ভারি মুস্কিল বাধিয়া গেল। আগেই বলিয়াছি, সুশীলচন্দ্র মনে করিত যে, সে যদি তাহার বাবা সুবলচন্দ্রের মতো বড়ো এবং স্বাধীন হয়, তবে যেমন ইচ্ছা গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপ দিয়া, কাঁচা আম খাইয়া, পাখীর বাচ্চা পাড়িয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইবে, যখন ইচ্ছা ঘরে আসিয়া যাহাই ইচ্ছা তাহাই খাইবে, কেহ বারণ করিবার থাকিবে না; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, সেদিন সকালে উঠিয়া তাহার গাছে চড়িতে ইচ্ছাই হইল

না। পানাপুকুরটা দেখিয়া তাহার মনে হইল, হহাতে ঝাঁপ দিলেই আমার কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসিবে। চুপচাপ করিয়া দাওয়ায় একটা মাদুর পাতিয়া ভাবিতে লাগিল।

একবার মনে হইল, খেলা-ধুলাগুলো একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় না, একবার চেষ্টা করিয়াই দেখা যাক। এই ভাবিয়া কাছে একটা আমড়া গাছ ছিল, সেইটাতে উঠিবার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিল, কাল যে গাছটাতে কাঠবিড়ালীর মতো তড় তড় করিয়া চড়িতে পারিত, আজ বুড়া শরীর লইয়া সে গাছে কিছুতেই উঠিতে পারিল না; নীচেকার একটা কচি ডাল ধরিবামাত্র সেটা তাহার শরীরের ভারে ভাঙ্গিয়া গেল এবং বুড়া সুশীল ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। কাছে রাস্তা দিয়া লোক চলিতেছিল, তাহারা বুড়োকে ছেলে-মানুষের মতো গাছে চড়িতে ও পড়িতে দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। সুশীলচন্দ্র লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া আবার সেই দাওয়ায় মাদুরে আসিয়া বসিল। চাকরকে বলিল, "ওরে বাজার থেকে এক টাকার লজঞ্চুস্ কিনে আন্।"

লজঞ্চুসের প্রতি সুশীলচন্দ্রের বড়ো লোভ ছিল। স্কুলের ধারে দোকানে সে রোজ নানা রঙের লজঞ্চুস সাজানো দেখিত; দু-চার পয়সা যাহা পাইত, তাহাতেই লজঞ্চুস কিনিয়া খাইত, মনে করিত, যখন বাবার মতো টাকা হইবে, তখন কেবল পকেট ভরিয়া ভরিয়া লজঞ্চুস কিনিবে এবং খাইবে। আজ চাকর এক টাকায় একরাশ লজঞ্চুস কিনিয়া আনিয়া দিল; তাহারই একটা লইয়া সে দন্তহীন মুখের মধ্যে পুরিয়া চুষিতে লাগিল; কিন্তু বুড়ার মুখে ছেলেমানুষের লজঞ্চুস কিছুতেই ভাল লাগিল না। একবার ভাবিল, এগুলো আমার ছেলে-মানুষ বাবাকে খাইতে দেওয়া যাক, আবার তখনই মনে হইল, না কাজ নাই, এত লজঞ্চুস খাইলে উহার আবার অসুখ করিবে।

কাল পর্যন্ত যে-সকল ছেলে সুশীলচন্দ্রের সঙ্গে কপাটি খেলিয়াছে, আজ তাহারা সুশীলের সন্ধানে আসিয়া বুড়ো সুশীলকে দেখিয়া দূরে ছুটিয়া গেল।

সুশীল ভাবিয়াছিল, বাপের মতো স্বাধীন হইলে তাহার সমস্ত ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই ডুডু ডুডু শব্দে কপাটি খেলিয়া বেড়াইবে; কিন্তু আজ রাখাল, গোপাল, অক্ষয়, নিবারণ, হরিশ এবং নন্দকে দেখিয়া মনে মনে

বিরক্ত হইয়া উঠিল; ভাবিল, চুপচাপ করিয়া বসিয়া আছি, এখনই বুঝি ছোঁড়াগুলো গোলমাল বাধাইয়া দিবে।

আগেই বলিয়াছি, বাবা সুবলচন্দ্র প্রতিদিন দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, যখন ছোটো ছিলাম তখন দুষ্টামি করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইলে সমস্তদিন শান্তশিষ্ট হইয়া, ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া, কেবলই বই লইয়া পড়া মুখস্থ করি। এমন কি, সন্ধ্যার পরে ঠাকুমার কাছে গল্প শোনাও বন্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রি দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত পড়া তৈয়ারি করি।

কিন্তু ছেলেবয়স ফিরিয়া পাইয়া সুবলচন্দ্র কিছুতেই স্কুলমুখো হইতে চাহেন না। সুশীল বিরক্ত হইয়া আসিয়া বলিত, "বাবা, ইস্কুলে যাবে না?" সুবল মাথা চুলকাইয়া মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিতেন, "আজ আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি ইস্কুলে যেতে পারব না।" সুশীল রাগ করিয়া বলিত, "পারবে না বই কি! ইস্কুলে যাবার সময় আমারও অমন ঢের পেট কামড়েছে, আমি ও-সব জানি।"

বাস্তবিক সুশীল এত রকম উপায়ে স্কুল পলাইত এবং সে এত অল্পদিনের কথা যে, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া তাহার বাপের কর্ম্ম নহে। সুশীল জোর করিয়া ক্ষুদ্র বাপটাকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিল। স্কুলের ছুটির পরে সুবল বাড়ি আসিয়া খুব একচোট ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িতেন; কিন্তু ঠিক সেই সময়টিতে বৃদ্ধ সুশীলচন্দ্র চোখে চশমা দিয়া একখানা কৃত্তিবাসের রামায়ণ লইয়া সুর করিয়া করিয়া পড়িত, সুবলের ছুটাছুটি গোলমালে তাহার পড়ার ব্যাঘাত হইত। তাই সে জোর করিয়া সুবলকে ধরিয়া সম্মুখে বসাইয়া হাতে একখানা স্লেট দিয়া আঁক কষিতে দিত। আঁকগুলো এমনি বড়ো বড়ো বাছিয়া দিত যে, তাহার একটা কষিতেই তাহার বাপের এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। সন্ধ্যাবেলায় বুড়া সুশীলের ঘরে অনেক বুড়ায় মিলিয়া দাবা খেলিত। সে-সময়টায় সুবলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য সুশীল একজন মাস্টার রাখিয়া দিল; মাষ্টার রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত তাহাকে পড়াইত।

খাওয়ার বিষয়ে সুশীলের বড়ো কড়াক্কড় ছিল। কারণ, তাহার বাপ সুবল যখন বৃদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার খাওয়া ভালো হজম হইত না, একটু

বেশী খাইলেই অম্বল হইত—সুশীলের সে-কথাটা বেশ মনে আছে, সেইজন্য সে তাহার বাপকে কিছুতেই অধিক খাইতে দিত না। কিন্তু হঠাৎ অল্পবয়স হইয়া আজকাল তাঁহার এমনি ক্ষুধা হইয়াছে যে, নুড়ি হজম করিয়া ফেলিতে পারিতেন। সুশীল তাঁহাকে যতই অল্প খাইতে দিত, পেটের জ্বালায় তিনি ততই অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। শেষকালে রোগা হইয়া শুকাইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের হাড় বাহির হইয়া পড়িল। সুশীল ভাবিল, শক্ত ব্যামো হইয়াছে; তাই কেবলই ঔষধ গিলাইতে লাগিল।

বুড়া সুশীলেরও বড়ো গোল বাধিল। সে তাহার পূর্ব্বকালের অভ্যাস-মতো যাহা করে, তাহাই তাহার সহ্য হয় না। পূর্ব্বে সে পাড়ায় কোথাও যাত্রা-গানের খবর পাইলেই, বাড়ী হইতে পালাইয়া, হিমে হোক, বৃষ্টিতে হোক, সেখানে গিয়া হাজির হইত। আজিকার বুড়া সুশীল সেই কাজ করিতে গিয়া, সর্দি হইয়া, কাসি হইয়া, গায়ে মাথায় ব্যথা হইয়া, তিন হপ্তা শয্যাগত হইয়া পড়িয়া রহিল। চিরকাল সে পুকুরে স্নান করিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই করিতে গিয়া, হাতের গাঁট পায়ের গাঁট ফুলিয়া বিষম বাত উপস্থিত হইল; তাহার চিকিৎসা করিতে ছয় মাস গেল। তাহার পর হইতেই দুই দিন অন্তর সে গরম জলে স্নান করিত এবং সুবলকেও কিছুতেই পুকুরে স্নান করিতে দিত না। পূর্ব্বেকার অভ্যাসমতো, ভুলিয়া তক্তপোষ হইতে সে লাফ দিয়া নামিতে যায়, আর হাড়গুলো টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠে। মুখের মধ্যে আস্ত পান পুরিয়াই হঠাৎ দেখে, দাঁত নাই, পান চিবানো অসাধ্য। ভুলিয়া চিরুনি ব্রুশ লইয়া মাথা আঁচড়াইতে গিয়া দেখে, প্রায় সকল মাথাতেই টাক। এক-একদিন হঠাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে তাহার বাপের বয়সী বুড়া হইয়াছে এবং ভুলিয়া পূর্ব্বের অভ্যাসমতো দুষ্টামি করিয়া পাড়ার বুড়ী আন্দি পিসির জলের কলসে হঠাৎ ঠন্ করিয়া ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত—বুড়ামানুষের এই ছেলেমানুষি দুষ্টামি দেখিয়া, লোকেরা তাহাকে মার্ মার্ করিয়া তাড়াইয়া যাইত, সে-ও লজ্জায় মুখ রাখিবার জায়গা পাইত না।

সুবলচন্দ্রও এক-একদিন দৈবাৎ ভুলিয়া যাইত যে, সে আজকাল ছেলেমানুষ হইয়াছে। আপনাকে পূর্ব্বের মতো বুড়া মনে করিয়া, যেখানে বুড়ামানুষেরা তাসপাশা খেলিতেছে সেইখানে গিয়া সে বসিত এবং বুড়ার মতো কথা বলিত,

শুনিয়া সকলেই তাহাকে "যা যা, খেলা করগে যা, জ্যাঠামি ক'রতে হবে না," বলিয়া কান ধরিয়া বিদায় দিত। হঠাৎ ভুলিয়া মাষ্টারকে গিয়া বলিত, "দাও তো, তামাকটা দাও তো, খেয়ে নিই।" শুনিয়া মাস্টার তাহাকে বেঞ্চের উপর একপায়ে দাঁড় করাইয়া দিত। নাপিতকে গিয়া বলিত, "ওরে বেজা, কদিন আমাকে কামাতে আসিস নি কেন?" নাপিত ভাবিত, ছেলেটি খুব ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে। সে উত্তর দিত, "আর বছর দশেক বাদে আসব এখন।" আবার এক-একদিন তাহার পূর্বের অভ্যাসমতো তাহার ছেলে সুশীলকে গিয়া মারিত। সুশীল ভারি রাগ করিয়া বলিত, "পড়াশুনো ক'রে তোমার এই বুদ্ধি হচেছ? একরত্তি ছেলে হ'য়ে বুড়োমানুষের গায়ে হাত তোল।" অমনি চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিয়া, কেহ কিল কেহ চড় কেহ গালি দিতে আরম্ভ করে।

তখন সুবল একান্তমনে প্রার্থনা করিয়া বলে, "হে দেবতা, বাপের মতো আমাকে ছোটো করিয়া দাও, মনের সুখে খেলা করিয়া বেড়াই। বাবা যে রকম দুষ্টামি আরম্ভ করিয়াছেন, উঁহাকে আর আমি সামলাইতে পারি না, সর্বদা ভাবিয়া অস্থির হইলাম।"

তখন ইচ্ছা ঠাক্‌রুণ আসিয়া বলিলেন, "কেমন তোমাদের সখ মিটিয়াছে?"

তাঁহারা দুই জনেই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দোহাই ঠাক্‌রুণ, মিটিয়াছে। এখন আমরা যে যাহা ছিলাম আমাদিগকে তাহাই করিয়া দাও।"

ইচ্ছা ঠাক্‌রুণ বলিলেন, "আচ্ছা, কাল সকালে উঠিয়া তাহাই হইবে।"

পরদিন সকালে সুবল পূর্বের মতো বুড়া হইয়া এবং সুশীল ছেলে হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। দুইজনেরই মনে হইল যে, স্বপ্ন হইতে জাগিয়াছি। সুবল গলা ভার করিয়া বলিলেন, "সুশীল, ব্যাকরণ মুখস্থ ক'রবে না?"

সুশীল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "বাবা, আমার বই হারিয়ে গেছে।"

বিলাসের ফাঁস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য—লোকের কাছে বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাইবার প্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে পূর্ব্বকালে অল্প ছিল, সে কথা মানিতে পারি না। তখনও লোকসমাজে খ্যাত হইবার ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এখনকার মতই প্রবল ছিল, তবে প্রভেদ এই—তখন খ্যাতির পথ একদিকে ছিল, এখন খ্যাতির পথ অন্যদিকে হইয়াছে।

তখনকার দিনে দান-ধ্যান, ক্রিয়া-কর্ম্ম, পূজা-পার্ব্বণ ও পূর্ত্তকার্য্যে ধনী ব্যক্তিরা খ্যাতিলাভ করিতেন। এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন, এমন ঘটনা শুনা গিয়াছে।

কিন্তু একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে-আড়ম্বরের গতি নিজের ভোগ-লালসা-তৃপ্তির দিকে নহে, তাহা নিতান্ত অসংযত হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দ্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না। মনে কর, যে ধনীর গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল, তাঁহার এই সেবায় ব্যয় যতই বেশী হউক না, অতিথিরা যে আহার পাইতেন, তাহাতে বিলাসিতার চর্চ্চা হইত না। বিবাহাদি কর্ম্মে রবাহূত অনাহূতদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার ফলে যজ্ঞের আয়োজন বৃহৎ হইলেও যথেষ্ট সরল হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের চালচলন বাড়িয়া যাইত না।

এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে, এইজন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন আহার, পরিচ্ছদ, বাড়ী, গাড়ী-জুড়ী, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদের চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত, তাহাদেরও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে ইহাতে কতদূর পর্য্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই

বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনো বদলায় নাই। এ সমাজ বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট। দূর নিকট, স্বজন পরিজন, অনুচর পরিচর, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। না হইলেও মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এ পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক কর্ম্মে এই সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য ছিল, এখন সাধারণের চালচলন বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ এখন আমাদের সমাজের পরিধি সে পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় নাই, এই জন্য সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি জানি, এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করে; তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর, পিতৃবিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার আয়ের অনুপাতে, তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর না কেন? সে বলিল, তাহার কোন উপায় নাই—গ্রামের লোক ও আত্মীয়-কুটুম্বগুলিকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ্ ঘটিবে। এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবী সম্পূর্ণই রহিয়াছে, অথচ সমাজের ক্ষুধা বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ আয়োজনে সাধারণের তৃপ্তি হইত, এখন আর তাহা হয় না। যাঁহারা ক্ষমতাশালী ধনী লোক, তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা সহরে আসিয়া কেবলমাত্র বন্ধু-মণ্ডলীকে লইয়া সামাজিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন নহেন, তাঁহাদের পলাইবার পথ নাই।

আমরা বীরভুম জেলায় একজন কৃষক গৃহস্থের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী তাহার ছেলেকে চাকরী দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম—কেন রে, ছেলেকে চাষবাস ছাড়াইয়া পরের অধীন করিবার চেষ্টা করিস্ কেন? সে কহিল,—বাবু, একদিন ছিল, যখন জমি-জমা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। এখন শুধু জমি-জমা হইতে আর দিন চলিবার উপায় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? সে উত্তর করিল,—আমাদের চাল বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বাড়ীতে কুটুম্ব আসিলে চিঁড়া-গুড়েই সন্তুষ্ট হইত, এখন সন্দেশ না পাইলে নিন্দা করে। তাই চাষ করিয়া আর চাষার চলে না।

কেহ কেহ বলিবেন, এ সমস্ত ভাল লক্ষণ; অভাবের তাড়নায় মানুষকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা-বিকাশের উত্তেজনা জন্মে। কেহ এমনও বলিবেন, বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া নষ্ট করে। অভাবের দায়ে এই সমাজের বহু বন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেলে মানুষ স্বাধীন হইবে। ইহাতে দেশের মঙ্গল।

এ সমস্ত তর্কের মীমাংসা সংক্ষেপে হইবার নহে। য়ুরোপে ভোগের তাগিদ দিয়া অনেকগুলি লোককে মারিয়া কতকগুলি লোককে ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। প্রাচ্য সমাজতন্ত্র কতক লোককে অনেকগুলি লোকের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সমাজকে ক্ষমতাশালী করিয়া রাখে। এই উভয় পন্থাতেই ভাল মন্দ দুই-ই আছে।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের প্রাচ্য সমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বহু সহস্র বৎসর যে অটল আশ্রয়ে আমরা বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছি, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর কিছু গড়িয়া উঠিবে কিনা, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভরতা দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে, আমাদের যাহা আছে নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।

এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই নিতান্ত বেশী সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য আমাদের সমাজেও এমন একটা দীনতা আসিয়াছে যে, টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিতে বসেন যে, আমি ধনী।

এই বাবুয়ানার প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠায় আমরা যে কত দিক হইতে কত দুঃখ পাইতেছি তাহার সীমা নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখ। একদিকে আমাদের সমাজবিধানে কন্যাকে একটা বিশেষ বয়সে বিবাহ দিতে সকলে বাধ্য, অন্যদিকে পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহ করা চলে না। গৃহস্থজীবনের ভারবহন করিতে যুবকগণ সহজেই শঙ্কাবোধ করে, এমন অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে হইলে পাত্রকে যে পণ দিয়া ভুলাইতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি আছে? এই পণ লওয়া প্রথার বিরুদ্ধে আজকাল অনেক

আলোচনা চলিতেছে। বস্তুতঃ ইহাতে বাঙ্গালী গৃহস্থের দুঃখ যে অত্যন্ত বাড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই—অথচ এজন্য আমাদের বর্ত্তমান সাধারণ অবস্থা ছাড়া ব্যক্তি-বিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না।

একদিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহুব্যয়সাধ্য, অপর দিকে কন্যামাত্রকেই নির্দ্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়-শ্রেণীতে গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার-স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্ম্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা, এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই। যাঁহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান, তাঁহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাঁটিবার চেষ্টা করেন, তবে লাভ কি? প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন, সংসারভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব্ব করুন, তবেই লোকের গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্য্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না।

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে, ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্ব্বে যে অর্থ সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে, দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলা দেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে; এবং যে দেশ বারো মাসে তের পার্ব্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত, সে দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া কোঠাবাড়ী, গাড়ীঘোড়া, সাজসরঞ্জাম, আহার-বিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাস ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়ই কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই;—তাঁহাদের অনেকেরই

টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে। কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্ত্তিরক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে ধন সমস্ত দেশের বিচিত্র অভাব-মোচনের জন্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্য্যের মায়া স্বজন করিতেছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত-সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্ম্মস্থানকে, বন্ধুস্থানকে, জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হ'তে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেই জন্যই এই ছদ্মবেশী সর্ব্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

মা ভৈঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মত। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস—তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না। তুমি আপনাকে যথার্থ ভালবাস তাহারো চরম পরীক্ষা আপনার উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর কি না।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্ব্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোট-বড়-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোনো উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস্‌মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কৃপণতা করে!

যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে, দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তক্‌মা-চাপরাশের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাস-বিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীর সুখসম্পদ্ তাহাদেরি। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব, এ কথা বলা যেমন শক্ত—সুখটা চাই না, এ কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চান, তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই!" নয়, বীর্য্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই না।" "চাই" বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই; "চাই না" বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ, চাহিবার উদ্যম নাই;—এমন ধিক্কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে

নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালী আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুস্কিল এই যে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোন পাস নাই। সুতরাং তাহার কথাবার্ত্তা যতই বড় হোক, কাহারো কাছে সে খাতির দাবী করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর এবং নাকিসুর লাগে। না মরিলে সেটার সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড় অভিযোগ। সেই ত আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালোমন্দ কোনো-একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন, তবে উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তিসম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সঙ্গতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই। এত-বড় দুর্ভাগ্য, এত বড় দীনতা আর কি হইতে পারে!

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধৃজাতিকে ডাকিয়া বলেন, "তোমরা লড়াই করিয়াছ—প্রাণ দিতে জান; যাহারা কখনো লড়াই করে নাই, কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্‌গ্রেস করিতে যাইবে?"

তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না। বিশ্বকর্ম্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না; যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসঙ্গত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অতএব, আরাম-কেদারায় হেলান্ দিয়া পোলিটিকাল্ সুখস্বপ্নে যখন কল্পনা করি—সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া মিশিয়া যাইতেছে, তখন মাঝখানে এই একটা দুশ্চিন্তা উঠে যে, বাঙালির সঙ্গে শিখ আপন ভাইয়ের মত মিশিবে কেন? বাঙালি বি.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষায় পাস্ হইয়াছে বলিয়া? কিন্তু যখন তাহার চেয়ে কড়া পরীক্ষার কথা উঠিবে, তখন সার্টিফিকেট বাহির করিব

কোথা হইতে? শুদ্ধমাত্র কথায় অনেক কাজ হয়, কিন্তু সকলেই জানেন চিঁড়ে ভিজাইবার সময় কথা দধির স্থান অধিকার করিতে পারে না; তেম্‌নি যেখানে রক্তের প্রয়োজন সেখানে বিশুদ্ধ কথা তাহার অভাব পূরণ করিতে অশক্ত।

অথচ যখন ভাবিয়া দেখি—আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, তখন আশা হয়—মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অবশ্য, তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোনো দেশেই লোক নির্ভয়ে ও স্বেচ্ছায় মরে না। কেবল স্বল্প একদল লোক মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে—বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তুরের তাড়নায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় না। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলেই তাহারা অনায়াসে অকপটে স্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোকে লজ্জায় পড়িয়া সাহস করে। যদি মিথ্যা গর্ব্ব করিতে হয়, তবে আমার সাহস আছে, এই মিথ্যাগর্ব্বই সব চেয়ে মার্জনীয়। কারণ, দৈন্যই বল, অজ্ঞতাই বল, মূঢ়তাই বল, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মত এত-ছোট আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথ্যা অহঙ্কার করে, অন্ততঃ তাহার লজ্জা আছে, এ সদ্‌গুণটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই, সেখানে এই লজ্জার চর্চ্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণ-বিসর্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়।

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল,—লজ্জায় হোক, প্রেমে হোক, ধর্ম্মোৎসাহে হোক, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, একথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মত বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিসর্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরমভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনো স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে,—দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি দ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয়-অমর স্মরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্টবসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয়ঘোষণা করুক।

অস্ত্রপরীক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ত্রিপুরার সেনাপতি ইশা খাঁর কক্ষ। ত্রিপুরার কনিষ্ঠ রাজকুমার রাজধর ও ইশা খাঁ। ইশা খাঁ অস্ত্র পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত]

রাজধর। দেখো সেনাপতি, আমি বারবার বলছি, তুমি আমার নাম ধ'রে ডেকো না।

ইশা খাঁ। তবে কী ধ'রে ডাকব? চুল ধ'রে, না কান ধ'রে?

রাজধর। আমি ব'লে রাখছি, আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ তোমার সম্মানও আমি রাখব না।

ইশা খাঁ। আমার সম্মান যদি তোমার হাতে থাকবার ভার থাকত, তবে কানাকড়ার দরে তাকে হাটে বিকিয়ে আসতুম। নিজের সম্মান আমি নিজেই রাখতে পারব।

রাজধর। তাই যদি রাখতে চাও তা' হ'লে ভবিষ্যতে আমার নাম ধ'রে ডেকো না।

ইশা খাঁ। বটে!

রাজধর। হাঁ।

ইশা খাঁ। হা হা হা হা! মহারাজাধিরাজকে কী ব'লে ডাকতে হবে? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা?

রাজধর। আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার সে-কথা তুমি ভুলে যাও।

ইশা খাঁ। সহজে ভুলি নি, তুমি যে রাজকুমার সে-কথা মনে রাখা শক্ত ক'রে তুলেছ।

রাজধর। তুমি আমার ওস্তাদ সে-কথাও মনে রাখতে দিলে না দেখছি।

ঈশা খাঁ। বস্‌। চুপ।

[দ্বিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমারের প্রবেশ]

ইন্দ্রকুমার। খাঁ সাহেব, ব্যাপারখানা কী?

ঈশা খাঁ। শোনো তো বাবা। বড়ো তামাশার কথা। তোমাদের মধ্যে এই যে ব্যক্তিটি সকলের কনিষ্ঠ এঁকে জাঁহাপনা, শাহানশা ব'লে না ডাকলে ওঁর আর সম্মান থাকে না—ওঁর সম্মানের এত টানাটানি।

ইন্দ্রকুমার। বল কি। সত্যি নাকি? হা হা হা হা।

রাজধর। চুপ করো দাদা।

ইন্দ্রকুমার। তোমাকে কী ব'লে ডাকতে হবে? জাঁহাপনা? হা হা হা হা। শাহানশা?

রাজধর। দাদা, চুপ করো বলছি।

ইন্দ্রকুমার। জনাব, চুপ ক'রে থাকা বড়ো শক্ত—হাসিতে যে পেট ফেটে যায়, হুজুর।

রাজধর। তুমি অত্যন্ত নির্বোধ।

ইন্দ্রকুমার। ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমারই থাক, তার প্রতি আমার কোনো লোভ নেই।

ঈশা খাঁ। ওঁর বুদ্ধিটা সম্প্রতি বড়োই বেড়ে উঠেছে।

ইন্দ্রকুমার। নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না—মই লাগাতে হবে।

[অনুচরসহ যুবরাজ চন্দ্রমাণিক্য ও মহারাজ অমরমাণিক্যের প্রবেশ]

রাজধর। মহারাজের কাছে আমার নালিশ আছে।

মহারাজ। কী হয়েছে?

রাজধর। ঈশা খাঁ পুনঃপুনঃ নিষেধসত্ত্বে আমার অসম্মান করেন। এর বিচার করতে হবে।

ঈশা খাঁ। অসম্মান কেউ করে না—অসম্মান তুমি করাও। আরও তো রাজকুমার আছেন—তাঁরাও মনে রাখেন আমি তাঁদের গুরু, আমিও মনে রাখি তাঁরা আমার ছাত্র—সম্মান-অসম্মানের কোনো কথাই ওঠে না।

মহারাজ। সেনাপতি সাহেব, কুমারদের এখন বয়স হয়েছে, এখন ওঁদের মান রক্ষা ক'রে চ'লতে হবে বই কি।

ইশা খাঁ। মহারাজ যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করেছেন, তখন মহারাজকে যে-রকম সম্মান করেছি রাজকুমারদের তা অপেক্ষা কম করি নে।

রাজধর। অন্য কুমারদের কথা ব'লতে চাই নে, কিন্তু—

ইশা খাঁ। চুপ করো, বৎস। আমি তোমার পিতার সঙ্গে কথা কচ্ছি। মহারাজ, মাপ করবেন, রাজবংশের এই কনিষ্ঠ পুত্রটি বড়ো হ'লে মুন্‌শির মতো কলম চালাতে পারবে, কিন্তু তলোয়ার এর হাতে শোভা পাবে না। (যুবরাজ এবং ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া) চেয়ে দেখুন মহারাজ, এঁরাই তো রাজপুত্র, রাজগৃহ আলো ক'রে আছেন।

মহারাজ। রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলছেন। তুমি অস্ত্রশিক্ষায় ওঁকে সন্তুষ্ট ক'রতে পার নি?

রাজধর। সে আমার ভাগ্যের দোষ, অস্ত্রশিক্ষার দোষ নয়। মহারাজ নিজে আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মহারাজ। আচ্ছা উত্তম। কাল আমাদের অবসর আছে, কালই পরীক্ষা হবে। তোমাদের মধ্যে যে জিতবে, তাকে আমার এই হীরে-বাঁধানো তলোয়ার পুরস্কার দেব। [প্রস্থান

ইশা খাঁ। শাবাশ রাজধর, শাবাশ! আজ তুমি ক্ষত্রিয়সন্তানের মতো কথা ব'লেছ। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তুমি হারো তাতেও তোমার গৌরব নষ্ট হবে না—হারজিত তো আল্লার ইচ্ছা, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মনে স্পর্ধা থাকা চাই।

রাজধর। থাক্ সেনাপতি, তোমার বাহবা অন্য রাজকুমারদের জন্য জমা থাক্; এতদিন তা না পেয়েও যদি চ'লে গিয়ে থাকে তবে আজও আমার কাজ নেই।

যুবরাজ। রাগ কোরো না ভাই, রাজধর। সেনাপতি সাহেবের সরল ভর্ৎসনা ওঁর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই কেবল ওঁর মুখে। কোনো একটি গুণ দেখলেই তৎক্ষণাৎ উনি সব ভুলে যান। অস্ত্রপরীক্ষায় যদি তোমার জিত হয় তা' হ'লে দেখবে, খাঁ সাহেব তোমাকে যেমন মনের সঙ্গে পুরস্কৃত ক'রবেন এমন আর কেউ নয়।

রাজধর। দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে, আজ রাত্রে যখন গোমতী নদীতে বাঘে জল খেতে আসবে তখন শিকার ক'রতে গেলে হয় না?

যুবরাজ। বেশ কথা। তোমার যদি ইচ্ছে হ'য়ে থাকে তো যাওয়া যাবে।

ইন্দ্রকুমার। কী আশ্চর্য্য। রাজধরের যে শিকারে প্রবৃত্তি হ'ল। এমন তো কখনও দেখা যায় নি।

ইশা খাঁ। ওঁর আবার শিকারে প্রবৃত্তি নেই। উনি সকলের চেয়ে বড়ো জীব শিকার ক'রে বেড়ান। রাজসভায় দুই-পা-ওয়ালা এমন একটি জীব নেই যিনি ওঁর কোনো-না-কোনো ফাঁদে আটকা না প'ড়েছেন।

যুবরাজ। তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার জিহ্বাও তেমনি, দুই-ই খরধার—যার উপর গিয়ে পড়ে তার একেবারে মর্মচ্ছেদ না ক'রে ফেরে না।

রাজধর। দাদা, তুমি আমার জন্যে ভেবো না। খাঁ সাহেব জিহ্বায় যতই শান দিন না কেন আমার মর্মে আঁচড় কাটতে পারবেন না।

ইশা খাঁ। তোমার মর্ম পায় কে বাবা। বড়ো শক্ত।

ইন্দ্রকুমার। যেমন, হঠাৎ আজ রাত্রে তোমার শিকারে যাবার সখ হ'ল, এর মর্ম ভালো বোঝা যাচ্ছে না।

যুবরাজ। আহা ইন্দ্রকুমার, প্রত্যেক কথাতেই রাজধরকে আঘাত করাটা তোমার অভ্যাস হ'য়ে যাচ্ছে।

রাজধর। সে-আঘাতে বেদনা না পাওয়াও আমার অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ রাত্রে শিকারে যাওয়াই তোমার মত না কি?

যুবরাজ। তোমার সঙ্গে, ভাই, শিকার ক'রতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। নিতান্ত নিরামিষ শিকার ক'রতে হয়। তুমি বনে গিয়ে বড়ো বড়ো জন্তু মেরে আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়ো কচু কাঁটাল শিকার ক'রেই মরি।

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া) যুবরাজ ঠিক বলেছেন, পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়ে লাগে—তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কে?

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা নয়। তুমি না গেলে কে শিকার ক'রতে যাবে?

যুবরাজ। আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের ইচ্ছে হ'য়েছে, ওকে নিরাশ ক'রব না।

ইন্দ্রকুমার। কেন দাদা, তোমার ইচ্ছে হ'য়েছে ব'লে কি যেতে নেই?

যুবরাজ। সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই যাচ্ছি।

ইন্দ্রকুমার। তাই বুঝি পুরোনো হ'য়ে গেছে?

যুবরাজ। আমার কথা অমন উল্‌টো বুঝলে বড়ো ব্যথা লাগে।

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা করছিলুম,—চলো প্রস্তুত হই গে।

ঈশা খাঁ। ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সইতে পারে, কিন্তু দাদার সামান্য অনাদরটুকু সইতে পারে না।

[অনুচরগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

অনুচরগণ

প্রথম। কথাটা তো ভালো ঠেকছে না হে। আমাদের ছোটো কুমারের ধনুর্বিদ্যার দৌড় তো সকলেরই জানা আছে—উনি মধ্যম কুমারের সঙ্গে অস্ত্র-পরীক্ষায় এগোতে চান এর মানে কী?

দ্বিতীয়। কেউ বা তীর দিয়ে লক্ষ্য ভেদ করে, কেউ বা বুদ্ধি দিয়ে।

প্রথম। সেই তো ভয়ের কথা। অস্ত্রপরীক্ষায় অস্ত্র না চালিয়ে যদি বুদ্ধি চালাও সেটা যে দুঃবুদ্ধি।

তৃতীয়। দেখো বংশী, অস্ত্রই চলুক আর বুদ্ধিই চলুক মাঝের থেকে তোমার ঐ জিভটিকে চালিও না, আমার এই পরামর্শ। যদি টিকে থাকতে চাও তো চুপ ক'রে থাকো।

দ্বিতীয়। বনমালী ঠিক কথাই ব'লেছে। ঐ ছোটো কুমারের কথা উঠলেই তুমি যা মুখে আসে তাই ব'লে ফেল। রাজার ছেলে কে ভালো কে মন্দ সে-বিচারের ভার আমাদের উপর নেই। তবে কিনা, আমাদের যুবরাজ বেঁচে থাকুন আর আমাদের মধ্যম কুমার ভাই লক্ষ্মণের মতো সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁকে রক্ষে করুন, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করো। ছোটো কুমারের কথা মুখে না আনাই ভালো।

প্রথম। ইচ্ছে ক'রে তো আনি নে। আমাদের মধ্যম কুমার সরল মানুষ—মনে তাঁর ভয়ডরও নেই, পাকচক্রও নেই—সর্বদাই ভয় হয়, ঐ যাঁর নামটা করছি নে তিনি কখন তাঁকে কী কোপাদে ফেলেন।

দ্বিতীয়। চল্ চল্ ঐ আসছেন।

প্রথম। ঐ যে সঙ্গে ওঁর মামাতো ভাই ধুরন্ধরটিও আছেন, শনির সঙ্গে মঙ্গল এসে জুটেছেন।

[প্রস্থান

রাজধর ও ধুরন্ধর

রাজধর। অসহ্য হয়েছে।

ধুরন্ধর। কিন্তু সহ্য করতেও তো কসুর নেই। ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে তো প্রায় জন্মাবধিই এইরকম চ'লছে, কিন্তু অসহ্য হয়েছে এমন তো লক্ষণ দেখি নে।

রাজধর। লক্ষণ দেখিয়ে লাভ হবে কী? যখন দেখাব একেবারে কাজে দেখাব। একটা সুযোগ এসেছে। এইবার অস্ত্রপরীক্ষায় আমি লক্ষ্য ভেদ ক'রব।

ধুরন্ধর। ইন্দ্রকুমারের বক্ষে নাকি?

রাজধর। বক্ষে নয়, তার হৃদয়ে। এবারকার পরীক্ষায় আমি জিতব, ওঁর অহংকারটাকে বিঁধে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রব।

ধুরন্ধর। অস্ত্রপরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারকে জিতবে, এইটেকেই সুযোগ ব'লছ?

রাজধর। সুযোগ কি তীরের মুখে থাকে? সুযোগ বুদ্ধির ডগায়। তোমাকে কিন্তু একটি কাজ ক'রতে হবে।

ধুরন্ধর। কাজ তো তোমার বরাবরই ক'রে আসছি, ফল তো কিছু পাই নে।

রাজধর। ফল সবুরে পাওয়া যায়। কোনোরকম ফন্দিতে ইন্দ্রকুমার-দাদার অস্ত্রশালায় ঢুকে তাঁর তূণের প্রথম খোপটি থেকে তাঁর নামলেখা তীরটি তুলে নিয়ে আমার নামলেখা তীর বসিয়ে আসতে হবে। তাঁর সঙ্গে আমার তীর বদল ক'রতে হবে, ভাগ্যও বদল হবে।

ধুরন্ধর। সবই যেন বুঝলুম কিন্তু আমার প্রাণটি? সেটি গেলে তো কারও সঙ্গে বদল চ'লবে না।

রাজধর। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি।

ধুরন্ধর। তুমি তো বরাবরই আছ, কিন্তু ভরও আছে। সেই যখন ইন্দ্রকুমারের রুপোর পাত দেওয়া ধনুকটার উপরে তুমি লোভ ক'রলে আমিই তো সেটি সংগ্রহ ক'রে তোমার ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিলুম—শেষকালে যখন ধরা প'ড়লে, ইন্দ্রকুমার ঘৃণা ক'রে সে-ধনুকটা তোমাকে দান ক'রলেন, কিন্তু আমার যে-অপমানটা ক'রলেন সে আমার জীবন গেলেও যাবে না। তখনো তো, ভাই, তুমি ছিলে—রক্ষা যত ক'রেছিলে সে আমার মনে আছে।

রাজধর। এবার তোমার সময় এসেছে—সে অপমানের শোধ দেবার জোগাড় করো।

ধুরন্ধর। সময় কখন কার আসে সেটা যে পরিষ্কার বোঝা যায় না। দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক ক'রবার শক্তিটাই ভালো; শোধ তোলবার সখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়। ঐ যে ওঁরা সব আসছেন। আমি পালাই। তোমার সঙ্গে আমাকে একত্রে দেখলেই ইন্দ্রকুমার যে কথাগুলি ব'লবেন তাতে মধুবর্ষণ ক'রবে না—আর ঈশা খাঁও যে তোমার চেয়ে আমার প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রকাশ ক'রবেন এমন ভরসা আমার নেই। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার]

ইন্দ্রকুমার। কী হে প্রতাপ, ব্যাপারখানা কী? আমাকে হঠাৎ অস্ত্র-শালার দ্বারে যে ডাক প'ড়লো?

প্রতাপ। মধ্যম বৌরাণীমা আপনাকে খবর দিতে ব'ললেন যে, আপনার অস্ত্রশালার মধ্যে একটি জ্যান্ত অস্ত্র ঢুকেছেন, তিনি বায়ু-অস্ত্র, না নাগপাশ, না কী, সেটা সন্ধান নেওয়া উচিত।

ইন্দ্রকুমার। বল কী প্রতাপ, কলিযুগেও এমন ব্যাপার ঘটে নাকি?

প্রতাপ। আজ্ঞে, কুমার, কলিযুগেই ঘটে, সত্যযুগে নয়। দরজাটা খুললেই সমস্ত বুঝতে পারবেন।

ইন্দ্রকুমার। তাই তো বটে, পায়ের শব্দ শুনি যে।

[দ্বার খুলিতেই রাজধরের নিষ্ক্রমণ

এ কী। রাজধর যে। হা হা হা হা। তোমাকে অস্ত্র ব'লে কেউ ভুল ক'রেছিল নাকি? হা হা হা হা।

রাজধর। মেজবৌরাণী তামাশা ক'রে আমাকে এখানে বন্ধ ক'রে রেখেছিলেন।

ইন্দ্রকুমার। এ ঘরটা তো সহজ তামাশার ঘর না—এখানকার তামাশা যে ভয়ংকর ধারালো তামাশা—এখানে তোমার আগমন হ'ল যে?

রাজধর। আজ রাত্রে শিকারে যাব ব'লে অস্ত্র খুঁজতে গিয়ে দেখলুম আমার অস্ত্রগুলোতে সব ম'রচে প'ড়ে র'য়েছে। কালকের অস্ত্রপরীক্ষার জন্যে সেগুলোকে সমস্ত সাফ ক'রতে দিয়ে এসেছি। তাই বৌরাণীর কাছে এসেছিলুম তোমার কিছু অস্ত্র ধার নেবার জন্যে।

ইন্দ্রকুমার। তাই তিনি বুঝি সমস্ত অস্ত্রশালাসুদ্ধই তোমাকে ধার দিয়ে ব'সে আছেন? হা হা হা হা। তা বেরিয়ে এলে কেন? যাও, ঢুকে পড়ো। ধারের মেয়াদ ফুরিয়েছে নাকি? হা হা হা হা।

রাজধর। হাসো, হাসো। এ তামাশায় আমিও হাসব। কিন্তু, এখন নয়। চললুম দাদা, আজ আর শিকারে যাচ্ছি নে। [প্রস্থান

প্রতাপ। ছোটোকুমারকে নিয়ে আপনাদের এ-সমস্ত ঠাট্টা আমার ভালো বোধ হয় না।

ইন্দ্রকুমার। ঠাট্টা নিয়ে ভয় কিসের? উনিও ঠাট্টা করুন না।

প্রতাপ। ওঁর ঠাট্টা বড়ো সহজ হবে না।

তৃতীয় দৃশ্য

[পরীক্ষাভূমি]

[রাজা, রাজকুমারগণ, ঈশা খাঁ, নিশানধারী ও ভাট]

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ তোমাকে জিততেই হবে, নইলে চ'লবে না।

যুবরাজ। চ'লবে না তো কী? আমার তীরটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লেও জগৎ-সংসার যেমন চলছিল ঠিক তেমনি চ'লবে। আর, যদিবা নাই চ'লত তবু আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা দেখছি নে।

ইন্দ্রকুমার। দাদা, তুমি যদি হারো তবে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হব।

যুবরাজ। না ভাই, ছেলেমানুষি কোরো না। ওস্তাদের নাম রাখতে হবে।

ইশা খাঁ। যুবরাজ, সময় হ'য়েছে—ধনুক গ্রহণ করো। মনোযোগ কোরো। দেখো, হাত ঠিক থাকে যেন।

[যুবরাজের তীর-নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ। যাঃ ফসকে গেল।

যুবরাজ। মনোযোগ ক'রেছিলুম খাঁ সাহেব, তীরযোগ ক'রতেই পারলুম না।

ইন্দ্রকুমার। কখনো না। মন দিলে তুমি নিশ্চয়ই পারতে। দাদা, তুমি কেবল উদাসীন হ'য়ে সব জিনিস ঠেলে ফেলে দাও, এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

ইশা খাঁ। তোমার দাদার বুদ্ধি তীরের মুখে কেন খেলে না, তা জান? বুদ্ধিটা তেমন সূক্ষ্ম নয়।

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, তুমি অন্যায় ব'লছ।

ইশা খাঁ। (রাজধরের প্রতি) কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ করো, মহারাজ দেখুন।

রাজধর। আগে দাদার হোক।

ইশা খাঁ। এখন উত্তর ক'রবার সময় নয়, আমার আদেশ পালন করো।

[রাজধরের তীর-নিক্ষেপ]

ইশা খাঁ। যাক, তোমার তীরও তোমার দাদার তীরেরই অনুসরণ ক'রেছে —লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যও করে নি।

যুবরাজ। ভাই, তোমার বাণ অনেকটা নিকট দিয়েই গেছে, আর একটু হ'লেই লক্ষ্য বিদ্ধ ক'রতে পারত।

রাজধর। লক্ষ্য বিদ্ধ তো হ'য়েছে। দূর থেকে তোমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ না। ঐ যে বিদ্ধ হ'য়েছে।

যুবরাজ। না রাজধর, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হ'য়েছে—লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি।

রাজধর। আমার ধনুর্বিদ্যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস নেই ব'লেই তোমরা দেখেও দেখতে পাচ্ছ না। আচ্ছা, কাছে গেলেই প্রমাণ হবে।

[ইন্দ্রকুমারের ধনুক গ্রহণ]

যুবরাজ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) ভাই, আমি অক্ষম, সেজন্যে আমার উপর তোমার রাগ করা উচিত নয়। তুমি যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হও, তাহ'লে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ ক'রবে, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

[ইন্দ্রকুমারের তীরনিক্ষেপ]

(নেপথ্যে জনতা। জয়, কুমার ইন্দ্রকুমারের জয়।)

[বাদ্য বাজিয়া উঠিল। যুবরাজ ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন।]

ইশা খাঁ। পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাকো। মহারাজ, মধ্যমকুমার পুরস্কারের পাত্র। যেরূপ প্রতিশ্রুত আছেন তা পালন করুন।

রাজধর। না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপ্য। আমারই তীর লক্ষ্যভেদ ক'রেছে।

মহারাজ। কখনোই না।

রাজধর। সেনাপতি সাহেব, পরীক্ষা ক'রে আসুন কার তীর লক্ষ্যে বিঁধে আছে।

ইশা খাঁ। আচ্ছা, আমি দেখে আসি। [প্রস্থান

[তীর হাতে লইয়া ইশা খাঁর পুনঃপ্রবেশ]

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের প্রতি) বাবা, আমি বুড়োমানুষ, চোখে তো ভুল দেখছি নে? এই তীরের ফলায় যেন রাজধরের নাম দেখা যাচ্ছে?

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, রাজধরেরই নাম।

মহারাজ। দেখি। তাই তো। একসঙ্গে আমাদের সকলেরই ভুল হ'ল?

রাজধর। আজ নয় মহারাজ, আমার প্রতি বরাবরই ভুল হ'য়ে আসছে।

ইশা খাঁ। কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

ইন্দ্রকুমার। আমি বুঝেছি।

রাজধর। মহারাজ, আজ বিচার করুন।

ইন্দ্রকুমার। (জনান্তিকে) বিচার। তুমি বিচার চাও। তাহ'লে যে মুখে চুনকালি প'ড়বে। বংশের লজ্জা প্রকাশ ক'র্‌ব না—অন্তর্যামী তোমার বিচার ক'রবেন।

ইশা খাঁ। কী হ'য়েছে, বাবা? এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। শিলা কখনো জলে ভাসে না, বানরে কখনো সংগীত গায় না। বাবা ইন্দ্রকুমার, ঠিক কথা বলো তো, কী হ'য়েছে। তূণ বদল হয় নি তো?

রাজধর। কখনোই না। পরীক্ষা ক'রে দেখো।

ইশা খাঁ। তাই তো দেখছি—তূণ তো ঠিকই আছে। আচ্ছা, বাবা ইন্দ্রকুমার, সত্য ক'রে বলো, এর মধ্যে তোমার অস্ত্রশালায় কেউ কি প্রবেশ ক'রেছিল?

ইন্দ্রকুমার। সে-কথায় প্রয়োজন নেই, খাঁ সাহেব।

ইশা খাঁ। ঠিক ক'রে বলো, বাবা—তুমি নিশ্চয় জান, কেউ তোমার অস্ত্রশালায় গিয়ে তোমার সঙ্গে তীর বদল ক'রেছে?

ইন্দ্রকুমার। চুপ করো, খাঁ সাহেব। ও কথা থাক।

ইশা খাঁ। তাহ'লে তুমি হার মানছ?

ইন্দ্রকুমার। হাঁ, আমি হার মানছি।

ইশা খাঁ। শাবাশ, বাবা, শাবাশ! তুমি রাজার ছেলে বটে। মহারাজ, কোথাও একটা কিছু অন্যায় হ'য়ে গেছে, সে কথাটা প্রকাশ হ'চ্ছে না। আর-একবার পরীক্ষা না হ'লে ঠিকমতো মীমাংসা হ'তে পারবে না।

রাজধর। খাঁ সাহেব, অন্যায় আর কিছু নয়, আমার জেতাই অন্যায় হ'য়েছে। কিন্তু, তাই ব'লে আবার পরীক্ষার অপমান আমি স্বীকার ক'রতে পারব না। আমার জিত হওয়া যদি অন্যায় হ'য়ে থাকে, সে অন্যায়ের সহজ প্রতিকার আছে। আমি পুরস্কার চাই নে, মধ্যমকুমারকেই পুরস্কার দেওয়া হোক।

মহারাজ। সে কথা আমি ব'লতে পারি নে—তীরে যখন তোমার নাম লেখা আছে তখন তোমাকে পুরস্কার দিতেই আমি বাধ্য। এই তুমি নাও।

[তলোয়ার প্রদান

রাজধর। পুরস্কার আমি শিরোধার্য্য ক'রে নিচ্ছি, কিন্তু আমার এই সৌভাগ্যে কারো মন যখন প্রসন্ন হ'চ্ছে না, তখন এই তলোয়ার আমি দাদা ইন্দ্রকুমারকেই দিলুম।

[ইন্দ্রকুমারের দিকে তলোয়ার অগ্রসরকরণ

ইন্দ্রকুমার। (তলোয়ার মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া) ধিক্। তোমার হাত থেকে এ পুরস্কারের অপমান গ্রহণ ক'রবে কে?

ইশা খাঁ। (ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া) কী! ইন্দ্রকুমার, মহারাজের দত্ত তলোয়ার তুমি মাটিতে ফেলে দিতে সাহস কর। তোমার এই অপরাধের সমুচিত শাস্তি হওয়া চাই।

ইন্দ্রকুমার। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ইশা খাঁ। পুত্র, এ কী, পুত্র! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হ'য়েছ?

ইন্দ্রকুমার। সেনাপতি সাহেব, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যথার্থই আত্মবিস্মৃত হ'য়েছি। আমাকে শাস্তি দাও।

যুবরাজ। ক্ষান্ত হও, ভাই, ঘরে ফিরে চলো।

ইন্দ্রকুমার। (মহারাজের পদধূলি লইয়া) পিতঃ, অপরাধ মার্জনা করুন। আজ সকল রকমেই আমার হার হ'য়েছে।

ইশা খাঁ। মহারাজ, আমার একটি নিবেদন আছে। খেলার পরীক্ষা তো চুকেছে এবার কাজের পরীক্ষা হোক। দেখা যাবে, তাতে আপনার কোন্ পুত্র পুরস্কার আনতে পারে।

মহারাজ। কোন্ কাজের কথা ব'লছ, সেনাপতি?

ইশা খাঁ। আরাকানরাজের সঙ্গে মহারাজের যুদ্ধের মতলব আছে। সৈন্যও তো প্রস্তুত হ'য়েছে। এইবার কুমারদের সেই যুদ্ধে পাঠানো হোক।

মহারাজ। ভালো কথাই ব'লেছ, সেনাপতি। খবর পেয়েছি, আরাকানের রাজা চট্টগ্রামের সীমানার কাছে এসেছেন। বারবার শিক্ষা দিয়েছি কিন্তু মূর্খের শিক্ষার শেষ তো কিছুতেই হয় না, যমরাজার পাঠশালায় না পাঠালে গতি নেই। কী বল, বৎসগণ? আমাদের সেই চিরশত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ে যাত্রা ক'রে ক্ষাত্রচর্যে দীক্ষা গ্রহণ ক'রতে রাজি কি?

ইন্দ্রকুমার। আছি। দাদাও যাবেন।

রাজধর। আমিও যাব না, মনে ক'রছ নাকি?

মহারাজ। তবে, ইশা খাঁ, তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ হ'য়ে এদের সকলকে শত্রু-বিজয়ে নিয়ে যাও। ত্রিপুরেশ্বরী তোমাদের সহায় হোন।

ভারতের দুর্দ্দশা

স্বামী বিবেকানন্দ

[ইঁহার নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত—'বিবেকানন্দ' ইঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। ইনি ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার শিমুলিয়ার প্রসিদ্ধ দত্ত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসদেবের দেহত্যাগের পর, ছয় বৎসর কাল ইনি হিমালয়ে সাধনায় এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান পরিভ্রমণে অতিবাহিত করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো নগরে "পার্লিয়ামেণ্ট অব্ রিলিজিয়ন্‌স্" নামক মহতী সভায় ইনি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আমেরিকার নানা স্থানে ইনি বক্তৃতা করিয়া তদ্দেশবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশে প্যারী নগরে "কংগ্রেস অব্ দি হিস্টরি অব্ রিলিজিয়ন্‌স্" নামক সভায় ইঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার ইউরোপীয় শিষ্যগণের মধ্যে মিস্ মার্গারেট নোব্‌ল্ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; ইনি 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে পরিচিতা। স্বদেশে স্বামীজী 'রামকৃষ্ণ মিশন,' নামক লোক-হিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ইঁহার 'জ্ঞানযোগ,' 'কর্ম্মযোগ,' 'রাজযোগ,' 'শিকাগো বক্তৃতা,' 'ভক্তিরহস্য' প্রভৃতি পুস্তকে এবং ইংরেজী রচনাবলীতে ইঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বয়সে বিবেকানন্দের তিরোভাব হয়।]

আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্ম-স্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্য ভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলীন্য-প্রথা হইতে ভোজ্যাভোজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় রাজাই নির্দ্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্য দেশে সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন।

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জন-মানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত এখনও অণুমাত্র হয় নাই। যে আত্মপ্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহা এখনও ব্যাবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্যসাধন—এদেশে এখনও ফলদায়ক

হয় না ; এইজন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা, "মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা—" সাধারণ কোথা ? তাহার উপর, আমরা এতই বীর্য্যহীন যে, কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে, তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্য্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকী থাকে না ; এজন্যই বোধ হয় আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" প্রত্যক্ষ করি। ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশা করি না, যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবকসম্প্রদায়—ধীর, স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য করাই ভাল। এক্ষণে তাহাদের প্রধান কার্য্য জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-প্রচার।

আধুনিক সভ্যতা ও প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে সেইদিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যে দিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চ জাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতি-দিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে-জাতির জন-সাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে-জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটি—দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয় তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া উঠিতে হইবে।

আজ অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। দশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা 'ভদ্রলোক' নামে প্রথিত ব্যক্তিরা 'ভদ্রলোক' হইয়াছেন ও রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটি সভাও দেখিলাম না।

মুসলমান কয়জন সিপাহী আনিয়াছিল ? ইংরাজ কয়জন আছে ? ছয় টাকার জন্য নিজের পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায় ? সাতশত বৎসর মুসলমান রাজত্বে ছয় কোটি মুসলমান, একশত বৎসর খৃষ্টান-রাজত্বে কুড়ি লক্ষ খৃষ্টান। কেন এমন হয় ? Originality (মৌলিক চিন্তা) একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ

করিয়াছে ? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে ? কি বলেই বা জার্ম্মান শ্রমজীবী ইংরেজ শ্রমজীবী বহুশতাব্দী-প্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে ?

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা ! ইউরোপের বহু নগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল ?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন ; আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হইতেছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish Colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসী) আসিতেছে—ইংরাজপদনিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটি লাঠি ও তাহার অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তাহার চলন সভয়, তাহার চাউনি সভয়। ছয় মাস পরে আর এক দৃশ্য ! সে সোজা হইয়া চলিতেছে, তাহার বেশভূষা বদলাইয়া গিয়াছে ; তাহার চাউনিতে, তাহার চলনে আর সে ভয়-ভয় ভাব নাই।

কেন এমন হইল ? আমাদের বেদান্ত বলিতেছে যে, ঐ আইরিশম্যানকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হইয়াছিল—সমস্ত প্রকৃতি একবাক্যে বলিয়াছিল, "Pat, তোর আর আশা নেই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।" আজন্ম শুনিতে শুনিতে Pat-এর তাহাই বিশ্বাস হইল, তাহার মনেও ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, সে অতি নীচ ; তাহার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আর আমেরিকায় নামিবা মাত্র চারিদিক্ হইতে ধ্বনি উঠিল—"Pat, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ। মানুষেই ত সব ক'রেছে, তোর আমার মত মানুষ সব ক'রতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।"—Pat ঘাড় তুলিল, দেখিল, ঠিক কথাই ত ; ভিতরের ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বলিলেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

নিয়মের রাজত্ব

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমায় রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা রিপন কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং উত্তরকালে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হ'ন। কেবল বিজ্ঞান নয়, ইনি সর্ব্বশাস্ত্রেই অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর অন্যতম। ইঁহার প্রণীত পুস্তকগুলির মধ্যে 'প্রকৃতি,' 'জিজ্ঞাসা,' 'যজ্ঞকথা' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ছিলেন এবং দেশীয় শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে বহুবিধ হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোক-গমন করেন।]

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই—সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। মানুষের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহাদের একটাকেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই ; কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি-লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন, ভাবাবেশে গদ্‌গদকণ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা 'মিরাক্‌ল' বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময়ে এই নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও, অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাঁহারা মিরাক্‌ল মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতি-পক্ষকে মিথ্যাবাদী, নির্ব্বোধ, পাগল ইত্যাদি সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন।

বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম-সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ মনে না করিলেও চলিতে পারে।

প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই-একটা দৃষ্টান্ত-দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্য্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সে ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে—আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই উর্দ্ধমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম, জাম, নারিকেল কেন, যে-কোন দ্রব্য উর্দ্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই সাধারণ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম এ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূ-কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ।

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃন্তচ্যুত হইবামাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে, লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে লোকটা পাগল; কেহ বলিবে, লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন-নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত' বলিবেন "হ'তেও-বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতর জলের পরিবর্ত্তে 'হাইড্রোজেন গ্যাস' ছিল।" কেন-না তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল—খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ হেন নারিকেল—কখনই প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না।

খাঁটি নারিকেল নিয়মভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়মভঙ্গ করিতে পারে। বৃষ্টি ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; 'প্যারাসুট'-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে।

তবে এইখানে বুঝি নিয়মভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিঃশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলাম, পার্থিব দ্রব্যমাত্রই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের ব্যভিচার আছে, যথা—মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডোবে, কিন্তু শোলা ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হটিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন,—তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্যমাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতি-ভেদ আছে। গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডোবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে। নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে, কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়? ঐ জিনিসটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিসটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে, লোহা ডোবে না, ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিন্তু জল হইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে নিক্ষেপ করিলে ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভেদ হইল।

উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু-লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে, বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তাহার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু, কাজেই বায়ুমধ্যে কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারা অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলে দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ।

এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্ব্বে গুরু-লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা-যোজনার দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা-সংশোধনের পর, প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম:

ধারা :—কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে উর্দ্ধগামী হইবে।

ব্যাখ্যা :—এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ :—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন-মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না।

সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এখন দেখা যাউক, কতদূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্যমাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে। সুতরাং উহার ব্যভিচার দেখিলে, বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখন-বা উপরে উঠে, কখন-বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে। যেমন শূন্যপ্রদেশে, 'পাম্প্'যোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদমধ্যে কোন জিনিস রাখিলে, তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য।

তবে, যত দোষ এই জলের আর তেলের, পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধি এই বিষম সংশয়-উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধি-জীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে। নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি।

বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া ; শোলা জলে ভাসে, জল আছে বলিয়া ; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া ;—নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না ; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কিনা—পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থমাত্রই তেমনি মগ্ন দ্রব্যমাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারকে নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায় ; চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্ত্তমান, সেখানে উভয়ই কার্য্য করে। যাহার যত জোর। যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয় ; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তস্থৌ"।

এখন, এ পক্ষ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিবেন,—দেখিলে প্রাকৃতিক নিয়মে আর ব্যতিক্রম আছে কি ? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম ;—কেবলই কি একটা আইন ? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের ধারা। যথা,—

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তুমাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল বা বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তুমাত্রই উর্দ্ধগামী হয়।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে, নামায়,—চাপ প্রবল হইলে, উঠায়।

কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে ? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম ; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতঃই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে,

তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে উর্দ্ধগামী হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন-না পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে অধিকার ছিল না। অগত্যা 'মরা মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আছে। বস্তুতই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নাম গ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম স্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বাগ্‌যত কর্ম্মনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আমাদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব সাধারণ বাঙ্গালী, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

অণুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে, যাহাতে ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুপার্শ্বস্থ

ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবল গিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সে উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাঁহার একান্তই অসদ্ভাব। প্রাণিতত্ত্ববিদেরা মেরুদণ্ড দেখিয়া সমগ্র প্রাণি-সমষ্টিকে উন্নত ও অনুন্নত দুই প্রধান পর্য্যায়ে ভাগ করেন। মেরুদণ্ডের অস্তিত্ব প্রাণীর পক্ষে সামর্থ্যের ও আত্মনির্ভর-শক্তির প্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর যে সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার তুলনা মিলে না।

এই দেশে এই জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটি কঠোর-কঙ্কাল-বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা বিষম সমস্যার কথা। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক, যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ কপটাচার হইতে আপনাকে মুক্ত রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই। এই উগ্রতা, এই কঠোরতা, এই দুর্দ্দমতা ও অনম্যতা, এই দুর্দ্ধর্ষ বেগবত্তার উদাহরণ, যাহারা কঠোর জীবনদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া দুই ঘা দিতে জানে ও দুই ঘা খাইতে জানে তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায়; আমাদের মত দুর্ব্বল লোকদের মধ্যে এই উদাহরণ কিরূপে মিলিল, তাহা গভীর আলোচনার বিষয়।

অনেকে বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পাশ্চাত্ত্য-জাতি-সুলভ বিবিধ গুণের বিকাশ দেখেন। ইউরোপীয়দের আমরা যতই নিন্দা করি না, অনেক বিষয়ে তাঁহারা খাঁটি মানুষ; আমাদের মনুষ্যত্ব তাঁহাদের নিকট নিষ্প্রভ ও মলিন।

যে পুরুষকারে পুরুষের পৌরুষ, সাধারণ ইউরোপীয়ের চরিত্রে যাহা বর্ত্তমান, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে যাহার অভাব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল; বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবনটা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। শুধু বাল্যজীবন কেন, তাঁহার সমগ্র জীবনকেই নিজের জন্য না হউক, পরের জন্য সংগ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করা

যাইতে পারে। এই সংগ্রাম তাঁহার চরিত্র-গঠনে অনেকটা আনুকূল্য করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতাপিতামহ হইতে তাঁহার ধাতুতে, মজ্জাতে ও শোণিতে এমন একটা পদার্থ তিনি পাইয়াছিলেন, যাহাতে সমুদয় বিপত্তি ভেদ করিয়া তিনি বীরের মত সেই রণক্ষেত্রে দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দুঃখ অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে, জীবনের বন্ধুর পথ অনেকের পক্ষেই কণ্টক-সমাবেশে আরও দুর্গম। কিন্তু এইরূপে সেই কাঁটাগুলিকে ছাঁটিয়া দলিয়া চলিয়া যাইতে অল্প লোককেই দেখা যায়। বাঙ্গালীর মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।

অথচ আশ্চর্য্য এই, এত প্রভেদ সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি খাঁটি বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার বাল্যজীবনে ইউরোপীয় প্রভাব তিনি কিছুই অনুভব করেন নাই। তিনি যেস্থানে যাঁহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেস্থানে তাঁহাদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য ভাবের প্রভাব তখন পর্য্যন্ত একেবারেই প্রবেশ-লাভ করে নাই। পর-জীবনে তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা অনেকটা পাইয়াছিলেন, অনেক পাশ্চাত্ত্য মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য চরিত্রে অনুকরণের যোগ্য অনেক পদার্থের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে তাঁহার চরিত্রকে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার চরিত্র তৎপূর্ব্বেই সম্যগ্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছিল, আর নূতন মালমশলা সংগ্রহের প্রয়োজন হয় নাই। * * * তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষদিন পর্য্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন। তাঁহার নিজস্ব এত প্রবল ছিল যে, অনুকরণ দ্বারা পরস্ব-গ্রহণের তাঁহার কখন প্রয়োজন হয় নাই। এমন কি, তাঁহার এই নিজস্ব সময়ে সময়ে এমন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিত যে, তিনি বলপূর্ব্বক এই পরস্বকে সম্মুখ হইতে দূরে ফেলিতেন। পাশ্চাত্ত্য চরিত্রের সহিত তাঁহার চরিত্রের যে কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি। অথবা তাঁহার পুরুষানুক্রমে আগত পৈতৃক সম্পত্তি। ইহার জন্য তাঁহাকে কখন ঋণ-স্বীকার করিতে হয় নাই।

চটি-জুতার প্রতি তাঁহার একটা আত্যন্তিক আসক্তি ছিল বলিয়াই তিনি যে চটি-জুতা ভিন্ন অন্য জুতা পায়ে দিতেন না, এমন নহে। আমরা যে স্বদেশের প্রাচীন চটি ত্যাগ করিয়া বুট ধরিয়াছি, ঠিক তাহা দেখিয়াই যেন

বিদ্যাসাগরের চটির প্রতি অনুরাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিকই এই চটি-জুতাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া একটা অভিমান, একটা দর্প তাঁহার অভ্যন্তর হইতে প্রকাশ পাইত। যে অভিমান ও দর্পের অনুরোধে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও মুটের মাথা হইতে বোঝা কাড়িয়া নিজের মাথায় তুলিয়া পথ চলিতেন, এই দর্প ঠিক সেই দর্প।

আচার-বিষয়ে অন্যের অনুকরণ দূরের কথা, বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এমন দুই একটা পদার্থ ছিল, যাহাতে পাশ্চাত্ত্য মানব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল ; এই প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব অনুভব করি।

বিদ্যাসাগরের লোক-হিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতি-শাস্ত্রের, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের, অর্থ-শাস্ত্রের বা সমাজ-শাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণা-বশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অনেকই আধুনিক সমাজ-তত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোনস্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতীকার করিতে হইবে, একালের সমাজ-তত্ত্ব সর্ব্বদা তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া পারিতেন না। লোকটার কুলশীলের পরিচয় লওয়ার অবসর ঘটিত না। তাহার অভাবের উৎপত্তি কোথায়,—তাহার অভাব পূরণ করিলে প্রকৃতপক্ষে তাহার উপকার হইবে কি অপকার হইবে, ও গৌণ সম্বন্ধে সমাজের ইষ্ট হইবে, কি অনিষ্ট হইবে, নীতি-তত্ত্ব-ঘটিত ও সমাজ-তত্ত্ব-ঘটিত এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি করিতেন না। অপিচ, দুঃখের সম্মুখে আসিবামাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্ব একেবারে অভিভূত হইয়া যাইত। তিনি আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইতেন ; পরের মধ্যে তাঁহার নিজত্ব একেবারে মগ্ন ও লীন হইয়া যাইত।

রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জন-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোন একটা কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত-গ্রন্থের প্রায়ই প্রতি

পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদন-প্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোন দীন-দুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; কোন বালিকা-বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা বহমানা, ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন।

বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মত কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন-ব্যাপার বড়ই গর্হিত কর্ম্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব; এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্যদেশে রোদনপ্রবণতা মনুষ্য-চরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তুচ্ছ গণনা করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণ-শোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

বিদ্যাসাগর একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, বিধবা-বিবাহে পথপ্রদর্শন তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। বস্তুতই এই বিধবা-বিবাহ-ব্যাপারে আমরা ঈশ্বরচন্দ্রের সমগ্র মূর্ত্তিটি দেখিতে পাই। কোমলতা ও কঠোরতা উভয় গুণের আধাররূপে তিনি লোকসমক্ষে প্রতীয়মান হয়েন। প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তে মানব-নির্য্যাতন তাঁহার কোমল প্রাণকে দিবা-নিশি ব্যথিত রাখিত; দুর্ব্বল মানুষের প্রতি নিষ্করুণ প্রকৃতির অত্যাচার তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে ব্যথা দিত; তাহার উপর মনুষ্য-বিহিত সমাজ-বিহিত অত্যাচার, তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়াছিল। বিধাতার কৃপায় মানুষের দুঃখের ত আর অভাব নাই, তবে কেন মানুষ আবার সাধ করিয়া আপন দুঃখের বোঝার ভার চাপায়। ইহা তিনি বুঝিতেন না, এবং ইহা তিনি সহিতেনও না। বাল-বিধবার দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; এবং সেই বিগলিত হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে করুণা-মন্দাকিনীর ধারা বহিল।

সুরনদী যখন ভূমি-পৃষ্ঠে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে, সে প্রবাহ রোধ করে। বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ যখন ছুটিয়াছিল, তখন কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটী-ভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই। এইখানে বিদ্যাসাগরের কঠোরতার পরিচয়। সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই যে, সেই মেরুদণ্ড নমিত করে।

বঙ্গদেশের মধ্যে ছোট-বড় এমন ব্যক্তি অল্পই আছেন, যিনি কোন না কোন প্রকারে বিদ্যাসাগরের নিকট ঋণগ্রস্ত নহেন। দূর মফঃস্বলের পল্লীগ্রামের মধ্যেও তাঁহার প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা চিন্তার অগোচর।

ভরত

দীনেশচন্দ্র সেন

[১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বগজুরা গ্রামে দীনেশচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচনা করেন। এই পুস্তকের নাম 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ' ছাড়া ইনি 'রামায়ণী কথা,' 'নীলমাণিক,' 'বেহুলা,' 'ফুল্লরা,' 'মুক্তাচুরি,' 'জড়ভরত,' 'বাঙ্গালার পুরনারী' প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার ইংরেজীতে রচিত 'History of Bengali Language and Literature', 'Chaitanya and his Age', 'Folk Literature of Bengal' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ য়ুরোপেও আদর লাভ করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ এবং "ডি.লিট." উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন এবং গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।]

ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।

রাম হইতেও আমি ভরতকে অধিকতর ধার্ম্মিক মনে করিয়া থাকি।" ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বনগমন করিলে

তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র ও স্বীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এমন নির্দ্দোষ—শুধু নির্দ্দোষ বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণকাব্যে একমাত্র আদর্শ চরিত্র ভরতের ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই। রামবনবাসোপলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে যে ভয়ানক বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও দুই এক বার এই নির্দ্দোষ রাজকুমারের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। প্রজাগণ রামের বনবাসকালে,—

"ভরতে সন্নিবন্ধাঃ স্ম শৌনিকে পশবো যথা।

আমরা ঘাতক-সন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম"—এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত-আত্মীয়গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভালবাসিতেন যে, "মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ" বলিয়া তিনি বারংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। কৌশল্যাকে রাম বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্ম-প্রাণ ভরতের কথা মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।" অথচ সেই রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি দুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, "তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না—ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না।"

পিতা দশরথ রামাভিষেকের উদ্যোগের সময়ে ভরতকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ, যদিও ভরত ধার্ম্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মনুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ।" ইক্ষ্বাকু-বংশের চিরাগত প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতারই প্রাপ্য; এমত অবস্থায় ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্র-মাহাত্ম্য এত বুঝিতেন, তথাপি বনবাসান্তে ভরদ্বাজাশ্রম হইতে হনূমান্‌কে ভরতের নিকট পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন—"আমার প্রত্যাগমন-সংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয়

কি না, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।" এই সন্দেহও একান্ত অমার্জনীয়। জগতে নিরপরাধের দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শ ধার্ম্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল।

কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, এই সকল বাক্যে ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেইরূপ বেদনা দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুল্যচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল বাহিনী সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক তখন তাঁহাকে রামের অনিষ্টকামনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে লগুড় ধারণ-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন কি ভরদ্বাজ ঋষি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোন পাপ অভিপ্রায় বহন করিয়া ত যাইতেছেন না?" প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল।

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্ব্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাঁহার মূর্ত্তি বিষণ্ণতাপূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন। নর্ত্তকীগণ তাঁহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, বন্ধুগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্ব্বাভাস যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনরূপে সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ব্যগ্র-কণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দূতগণ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উত্তরে বলিল—

"কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।"

কিন্তু গত রাত্রের দুঃস্বপ্ন ও দূতগণের ব্যগ্রতা তাঁহার নিকট একটা সমস্যার মত মনে হইল। এই দুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তার সূত্রে গাঁথিয়া একান্ত বিমর্ষ হইলেন।

* * * *

বহু দেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরশ্যামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিতকণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ যে অযোধ্যার মত বোধ হয় না, নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠধ্বনি ও কার্য্য-স্রোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলাশব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। যে প্রমোদোদ্যানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ পরিত্যক্ত। রাজপথ চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয় নাই। রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই। অসংযত-কবাট ও শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে, এ ত অযোধ্যা নহে, এ যেন অযোধ্যার অরণ্য।"

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তহিত হইয়াছে। চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেক-উৎসবে দীক্ষিত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন; বলয়কঙ্কণকেয়ূর সখাগণকে বিতরণ করিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; যাঁহার আয়ত এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্ব্বভূষণ ধারণের যোগ্য—"সেই সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের উৎস প্রবাহিত হইতেছে। পণ্যগৃহ বন্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত। সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীনা কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে উৎফুল্লা, পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেক-ব্যাপারের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া সুখী হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হৃষ্টা হইলেন। ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

"যা গতিঃ সর্ব্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।

সর্ব্বজীবের যে গতি, তোমার পিতা তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বনবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

"ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব?"—বলিয়া ভরত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজহীন রাজশয্যা তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মত বোধ হইল। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, "রাম কোথায় আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাঁহার দাস,—সেই রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।"

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রী-কামনায় কৈকেয়ী যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া পুত্রের প্রীতি-লাভের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই দুঃসহ সংবাদের মর্ম্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাকে যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহাদুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি। "তুমি ধার্ম্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তুমি আমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদের পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর।" যখন কাতর-কণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন—"ভরতের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" কৃশাঙ্গী সুমিত্রা ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, "তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করুন—তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।" এই কটূক্তিতে মর্ম্মবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন। তিনি এই ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না,—বহুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজস্র অভিসম্পাতবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং উত্তেজনায় ও দারুণ শোকে মুহ্যমান হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অম্বা কৌশল্যা ধর্ম্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাকে অঙ্কে স্থাপন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরতের শোক এবং ঔদাসীন্য ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। তিনি শ্মশান-ঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পিতঃ, আপনি প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন?"

অশ্রুপূর্ণ-কাতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য-সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোকবিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিলে, ভরত পাগলের ন্যায় ছুটিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "ইক্ষ্বাকুবংশের প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনাগীতি গাহিতেছ?" রাজমৃত্যুর চতুর্দ্দশ দিবসে বশিষ্ঠপ্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন—"রামচন্দ্র রাজা হইবেন, অযোধ্যার সমস্ত প্রজামণ্ডলী লইয়া আমি তাঁহার পা' ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমিও বনবাসী হইব।"

শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারিতে গেল এবং কৈকেয়ীকে তর্জ্জন করিয়া অনুসরণ করিল, ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল; শৃঙ্গবের-পুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম একটু জলপান করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। সেই তৃণশয্যা রামের বিশালবাহুপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল, সীতার উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,—গুহক কথা বলিতেছেন, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—রাণীগণ এবং সচিববৃন্দের শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুযত্নে ভরত জ্ঞান লাভ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "এই নাকি তাঁহার শয্যা,—যিনি আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত —যাঁহার গৃহ পুষ্পমালা, চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত,—যাঁহার গৃহশিখর নৃত্যশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি, গীতবাদিত্রশব্দে নিত্যমুখরিত ও যাঁহার

কারুকার্য্যের আদর্শ কাঞ্চন-ভিত্তিসমূহের দ্বারা সুরক্ষিত, সেই গৃহপতি ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া ইঙ্গুদীমূলে পড়িয়া ছিলেন, একথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য। আমি কোন্ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবল্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনযাপন করিব।"

এই জটাবল্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিলেন। এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমতঃ সন্দেহ করিয়া ভরতকে মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া মুনির নির্দ্দেশানুসারে রাজকুমার চিত্রকূটাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন। ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, "ভগবন্, ঐ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা দেবতার ন্যায় সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের মাতা, উঁহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া বিমনা অবস্থায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুষ্কপুষ্প কর্ণিকার-তরুর ন্যায় শীর্ণাঙ্গী—ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা,—আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথাপ্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা—এই দুর্ভাগার মাতা।" বলিতে বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল এবং তিনি ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অনশনকৃশ ও শোকের জীবন্ত-মূর্ত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের ন্যায় উচ্চ-কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—"হেমচ্ছত্র যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী-সমুজ্জল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মার্জ্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি ধূলিধূসর! যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে

বেড়াইতেছেন ;—আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্।"

এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলন-দৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও মাথায় জটাজুট, দেহে চীরবাস। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রজের পদতলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন ; বলিলেন—"বৎস, তোমার এ বেশ কেন? তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।"

ভরত জ্যেষ্ঠের পদতলে লুটাইয়া বলিলেন, "আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে ক্ষমা করুন ; আমি আপনার ভাই, আপনার শিষ্য, দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা বহু বিতণ্ডা চলিল,—ভরত বলিলেন, "আমি চতুর্দ্দশবৎসর বনবাসী হইব, প্রতিশ্রুতিপালন আমারই কর্ত্তব্য।" কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় তাঁহাকে সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা প্রদান করিলেন। জটাভারশোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল ; সহস্র ভূষণ যে শোভা দিতে অসমর্থ এই পাদুকা সেই অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন, "রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশবৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থকিব, সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জন করিব।"

অযোধ্যার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দীগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কলপরিহিত ফলমূলাহারী রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন? তাঁহারা সকলে কাষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন, সেই কাষায়বস্ত্র-পরিহিত সচিববৃন্দ-পরিবৃত, ব্রত-অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই পাদুকাদ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর।" চতুর্দ্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ দশগুণ বেশী হইয়াছে।

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার যোগ্য নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য্য সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেক সময়ে অতি রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, "কোন কোন জলজন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন—

"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।"

কৈকেয়ীর সহস্রদোষ আমরা ক্ষমাই মনে করি, যখন মনে হয় তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী।

বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার জীবনের প্রথমাংশ গবর্ণমেণ্ট অফিসে ও অধ্যাপনা-কার্য্যে অতিবাহিত হয়। পরে সংবাদপত্রের সম্পাদনা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ইনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চিন্তাশীল প্রবন্ধলেখক বলিয়াই ইনি সাহিত্যক্ষেত্রে সমাদৃত হইয়াছিলেন। "বঙ্গবাসী," "বসুমতী," "হিতবাদী," "নায়ক" প্রভৃতি সংবাদপত্রের ইনি সম্পাদক ছিলেন। "সাহিত্য," "বিজয়া," "সারথি," "বঙ্গবাণী" প্রভৃতি অধুনালুপ্ত মাসিকপত্রে ইঁহার লিখিত

নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। ইনি 'আইন-ই-আক্‌বরী'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন।]

বাঙালী যে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের জাতিসকল হইতে পৃথক্ এবং স্বতন্ত্র, বাঙালীর যে একটা নিজস্ব বিশিষ্টতা আছে, ইহা ঠিকমত বুঝিতে হইলে—

(১) বাংলার উপাসক-সম্প্রদায়ের পরিচয় লইতে হইবে। (২) বাংলা ভাষার ব্যাপ্তি, পুষ্টি ও প্রকৃতির পরিচয় লইতে হইবে। (৩) জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত প্রায় সাতশত বর্ষকাল কোন্ সিদ্ধান্তের উপর বাঙালীর স্মৃতি ও দায়শাস্ত্র বিস্তৃতি ও পুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহা জানিতে হইবে। (৪) বাঙ্গালীর জাতি এবং কুল-পরিচয় পূর্ণরূপে লইতে হইবে। এই কয়টা বিষয় ঠিকমত ব্যাখ্যাত হইলে তবে বাঙালীর বিশিষ্টতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য বাঙালীর বিশিষ্টতার মূল উপাদান। জয়দেব, উমাপতি-প্রমুখ সংস্কৃত কবিগণ, লুইপাদ, কাহ্নুপাদপ্রমুখ সিদ্ধাচার্য্যগণ, শঙ্কর এবং কৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ তান্ত্রিক আচার্য্যগণ বাঙালীকে এক অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়া গিয়াছেন। বাংলার উপাসনা-পদ্ধতি, কর্ম্মপদ্ধতি, সাহিত্য, ভাষা এবং জাতি ও কুল-পরিচয়-সম্বন্ধে, ইংরেজি-যুগে ইংরেজিনবীশ পণ্ডিতগণের দ্বারা যথারীতি আলোচনা হয় নাই, তাই ইংরেজিনবীশ বাঙালী স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় রাখেন না।

বৌদ্ধযুগে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শীল ও আচার লইয়া বাঙালী নালন্দার পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিল। বাঙালীর 'আগমনী' বাঙালীর নিজস্ব; 'আগমনী'-গান ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই, আর কোন জাতি অমন গান করে নাই, গান করিতে জানেও না। বাংলাদেশেই শ্যাম-শ্যামার সমন্বয়-সাধন অপূর্ব্বভাবে হইয়াছিল। এই সমন্বয়ের মহাকবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ; তাঁহার রচিত 'কালীকীর্ত্তন' এই সমন্বয়ের অপূর্ব্ব পরিচায়ক। বাঙালীই একত্র নরদেবতা এবং নারীদেবীকে পূজা করিতে শিখিয়াছিল। বাংলাদেশেই প্রেমের ধর্ম্মের প্রথম বিকাশ হয়। হিন্দুস্থানে একা সুরদাস তাঁহার সঙ্গীতরাশিতে নরাকারের দেবতা দ্বিভুজ-মুরলীধারীর পূজা ও বন্দনা প্রকাশ

করিয়া লিখিয়াছেন; পরন্তু এই তত্ত্বের পরাকাষ্ঠা বাংলাদেশে বাঙালী ভক্তগণের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল।

আসল কথা এই, বাঙালীর ব্যক্তিত্ব তাহার আবিষ্কৃত সকল ব্যাপারে যেন শতমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে কেবল মিথিলায় ন্যায়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত, মিথিলার পণ্ডিতগণ বাঙালী ছাত্রদের পুঁথি লিখিয়া আনিতে দিতেন না। তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রকে মিথিলার একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাংলার কাণাভট্ট শিরোমণি-রঘুনাথ মেধার এতই উন্নতিসাধন করিলেন যে, তিনি ক্রমে শ্রুতিধর হইয়া উঠিলেন। তিনি মিথিলায় যাইয়া ন্যায়শাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন, দেশে আসিয়া একচক্ষু রঘুনাথ তাবৎ ন্যায়গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব মনীষাপ্রভাবে নব্য-ন্যায়ের উদ্ভাবনা করিলেন। ফলে, মিথিলার একচেটিয়া অধিকার চূর্ণ হইল, নবদ্বীপ নব্য এবং পুরাতন ন্যায়ের পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্বরূপ হইল, ইহাই বাঙালীর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। বাঙালী ন্যায়ের এই অভ্যুদয়-ধারা চারিশত বর্ষকাল অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, নবদ্বীপকে নব্য-ন্যায়ের অদ্বিতীয় কেন্দ্র করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে, মথুরায়, নাথদ্বারায় হরিকীর্ত্তন শুনিয়াছি, ভজন শুনিয়াছি,—এই সকল হিন্দুস্থানী ভজনে ও কীর্ত্তনে অস্পৃশ্য জাতিসকল গণ্ডীর বাহিরে স্থান পাইয়া থাকে। বাংলায় হরিসঙ্কীর্ত্তনে সে বাধা নাই, উচ্চনীচ সকল জাতি সমানভাবে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে পারে; কীর্ত্তনের ক্ষেত্রে শ্বপচাদির স্পর্শে বাঙালীর জাতি যায় না। কেবল এইটুকুই নহে, সেই কীর্ত্তন-ক্ষেত্রে সকল জাতির কীর্ত্তনীয়ার পদরজের উপরে যোপবীত ব্রাহ্মণও ভাবাবেশে গড়াগড়ি দিয়া থাকেন; সেই কীর্ত্তনমণ্ডলীর উপরে হরির-লুটের বাতাসা ছড়াইয়া দিলে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সবাই তাহা কুড়াইয়া লইয়া মুখে দেয়। এতটা বাঙালী ছাড়া আর কেহ, কোন প্রদেশের বৈষ্ণব, করিতে পারে নাই। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তনেও এমন ব্যাপার হইয়া থাকে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙালীর ব্যক্তিত্বের একজন প্রধান নিদর্শন। দীপঙ্কর ভুটানে, তিব্বতে, চীনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বাংলার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নেপালে

বাঙালীর কীর্ত্তির অনেক পুঁথিপত্র আছে। ছিল এক দিন যখন বাঙালী বৈবাহিক সূত্রে তিব্বত, চীন, নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশের সহিত সংবদ্ধ ছিল; ছিল এক দিন যখন বাংলায় অসংখ্য বিদেশীয় পণ্ডিত আসিয়া বাস করিত এবং বাঙালী রমণীকে শৈব বিবাহের সাহায্যে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৃহস্থ হইয়া থাকিত।

বাংলার প্রথম ও মধ্যযুগের সাহিত্যেও একটা অপূর্ব্বত্ব আছে। কবিকঙ্কণ, ধনরাম প্রভৃতি সকল কবিই ব্রাহ্মণ; পরন্তু তাঁহাদের লিখিত সকল মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা—ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নহে। গন্ধবণিক, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা প্রভৃতি জাতীয় পুরুষসকলই এই সকল কাব্যের নায়ক। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-লিখিত সকল মহাকাব্যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের লেশমাত্র নাই। চণ্ডীর ঘটস্থাপন ফুল্লরা নিজেই করিত, তজ্জন্য ব্রাহ্মণ ডাকিতে হইত না। কালকেতু, পুষ্পকেতু, ইছাই ঘোষ, লাউসেন, ভীম, ধনপতিপ্রমুখ নায়কগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন? ইঁহারা যদি মহাকাব্যের নায়ক হইতে পারেন, তবে তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য বলি কোন্ হিসাবে?

এই সঙ্গে বাঙালীর ভাষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। বাংলা ভাষা বাঙালীকে অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দিয়াছে। সেই পরিচয় পাইতে হইলে প্রায় সহস্র বৎসরের বাংলা ভাষার উন্মেষ-পদ্ধতি বুঝিতে হয়; সিদ্ধাচার্য্যগণের গীত ও দোঁহাবলী হইতে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলাসাহিত্যের মন্থন প্রয়োজন। এই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী জাতির ইতিহাস লুকানো আছে। কুলজী-সাহিত্যও এই সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া, বাংলার সঙ্গীত-সাহিত্যও অপূর্ব্ব এবং অনন্যসাধারণ। কবির গান, পাঁচালীর গান, শ্যামা-বিষয়ক গান, কীর্ত্তন, গাথা প্রভৃতি কত রকমের সঙ্গীত-সাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই, অথচ বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় নিবদ্ধ আছে।

কত আর উল্লেখ করিয়া বলিব? বাঙালীর বিশিষ্টতা এবং ব্যক্তিত্ব সমাজ-শরীরের সর্ব্বাবয়বে, শিল্পকলায়, গানে-নাচে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, চিকিৎসা-পদ্ধতিতে, ঔষধ-নির্ম্মাণে, নৌকাপ্রস্তুতিতে, কথকতায়, ব্যাখ্যায়, বয়ন-শিল্পে,

তসর-গরদের বসন-প্রস্তুতিতে, গজদন্তের কারুকার্য্যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারে, সভ্যজাতির সকল ব্যসন-বিলাসে যেন সদাই স্পষ্টীকৃত হইয়া আছে।

মনীষী শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, বাংলার ভূগর্ভ হইতে যত প্রতিমা বাহির হইতেছে, যত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের technique ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। বাঙালীর ভাস্কর্য্য অপূর্ব্ব ও স্বতন্ত্র।

বাংলার বাদ্যভাণ্ডের মধ্যেও খুব বিশিষ্টতা প্রকট হইয়া আছে। বাংলার কবিওয়ালাদের ঢোলবাজানো অপূর্ব্ব ও অনন্যসাধারণ। এমনভাবে ঢোল বাজাইতে ভারতবর্ষের আর কোনও জাতি পারে না। বাঙালীর গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতিও স্বতন্ত্র; এমন ঘর ছাইতে ভারতবর্ষের, বুঝি বা পৃথিবীর, আর কোনও জাতিতে পারে না; বাংলার আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপসকল সত্যই বিদেশীয়ের বিস্ময় উৎপাদন করিত; তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না—নাইও।

বাংলার 'পত্থের কাজ' বাঙালীর নিজস্ব; উহা বাংলার বাহিরে ছিল না,—নাইও। এখন সে 'পত্থশিল্পের' নমুনা গভর্ণমেণ্ট-হাউসের গোটা কয়েক স্তম্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন কি, বাংলার জনার্দ্দন, বিশ্বম্ভর, জনমেজয় প্রভৃতি কর্ম্মকারগণ যেমন তোপ কামান তৈয়ার করিতে পারিত, দিল্লীর কারিকরে তেমনটি পারিত না; জাহানকোষা, দলমাদল, কালে-খাঁ প্রভৃতি কামান এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

বাঙালীর নৌ-শিল্প সত্যই অপরাজেয় ছিল। এমন নৌকা বানাইতে, জাল বুনিতে ভারতের আর কোন জাতি পারিত না। বাংলার "ঘাট বৈঠার ছিপে" চড়িয়া মীরকাসেম একরাত্রে গোদাগারি হইতে মুঙ্গেরে গিয়াছিলেন।

বাংলার আর একটা শিল্প ছিল—কুসুম-শিল্প। নানা পুষ্পের আভরণ ও অলঙ্কার বাঙালী যেমন তৈয়ার করিতে পারিত, এমন আর কোন জাতি পারিত না। আওরঙ্গজেব-পুত্র যুবরাজ মোহম্মদ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—"কি আর মণি-মুক্তা, চুনি-পান্নার লোভ দেখাও, পিতঃ, বাংলার কুসুমাভরণ দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কারসকলকে হেলায় পরাজয় করে। এমনটি তুমি দেখ নাই।" সে শিল্প লোপ পাইয়াছে।

আসল কথাটি কি জান? বাঙালী আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাংলায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্যসমাজ বিদ্যমান ছিল, প্রাচ্যের সে সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাংলায় বৈদিক ধর্ম্ম, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে যুগে, বারে বারে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদির আমদানি করিয়াও বাংলায় যাগ-যজ্ঞাদির তেমন প্রচলন হয় নাই। এত আক্রমণেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীজাতি স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল, উপরন্তু আগন্তুকগণকে বাংলার বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল।

স্বীকার করি বটে যে, বাঙালী আর্য্যাবর্ত্ত হইতে, আর্য্যগণের নিকট হইতে অনেক তথ্য, অনেক সিদ্ধান্ত, অনেক বিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু সে সকলকে বাঙালীর মনীষা যেন বাংলার কোমল পেলব পলিমাটির আবরণ দিয়া, এতই মধুর, এতই স্নিগ্ধ, এতই রসাল করিয়াছিল যে, পরে উহা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছিল। বাঙালী আর্য্যাবর্ত্তের অনুগামী হয় নাই বলিয়াই মনে হয়, আর্য্যাবর্ত্তের পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থ যাত্রা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাইয়া বাস করিলে, "পুনঃসংস্কারমর্হতি"; কেন না বাংলায় দীর্ঘকাল বাস করিলে সোমরসপায়ী, গোঘ্ন আর্য্যগণের জাতিনাশ ঘটিত, তাহাদের বিশিষ্টতা নষ্ট হইত।

বাংলায় জৈন-ধর্ম্মের প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মহাবীর রাজমহলের কাছে কোন গ্রামে ভূমিষ্ঠ হইয়া, জীবনের অর্দ্ধেকটা কাল বর্দ্ধমান বিভাগে বা রাঢ়দেশে কাটাইয়াছিলেন; এই জৈনধর্ম্ম বাঙালীর বিশিষ্টতার পুষ্টির পক্ষে অনেকটা সহায়তা করিয়াছিল। গোরক্ষনাথের "নাথী ধর্ম্ম" বাংলার উত্তররাঢ়ে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। এক পক্ষে জৈনতীর্থঙ্করগণ, অন্য পক্ষে গোরক্ষনাথের যোগী শিষ্যগণ, বাঙালীর বিশিষ্টতার পুষ্টির পক্ষে অনেক উপাদান যোগাইয়া গিয়াছেন। আবার বলিব, বাঙ্গালী যজ্ঞবিলাসী, পশু-বধে পটু, সোমপায়ী আর্য্য নহেন। কপিল-কণাদ বাংলারই; বাংলাই 'অহিংসা পরমধর্ম্মে'র বেদী; বাংলাই জৈনাচার্যগণের লীলাক্ষেত্র। বাংলার সিদ্ধাচার্য্য-গণের প্রভাব এখনও ধর্ম্মকর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে পরিস্ফুট।

চিনিতে পারি না, চিনিতে ভুলিয়াছি বলিয়া,—বাঙালীর ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাধনতন্ত্র, ভাবের ভাষা, রসের ভাষা প্রভৃতি সব ভুলিয়াছি। আমরা বাঙালী হইয়াও বাংলার শ্লাঘায় আর শ্লাঘাবোধ করি না। একবার তাকাও, মালঞ্চ-বেষ্টনী-পরিবৃত বাঙালীর নিজ নিকেতনের প্রতি সস্নেহে একবার তাকাও; জাতির অতীত ইতিহাসের মুকুরে স্বদেহের—স্বীয় সমাজশরীরের—প্রতিবিম্ব দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার বুঝিয়া লও। তাহা হইলে আবার যেমন ছিলে তেমনই হইবে, হারানিধি তোমাদের ফিরাইয়া পাইবে, শ্যামা জন্মভূমি তোমাদের হইবে।

মন্ত্রশক্তি

প্রমথ চৌধুরী

[প্রমথ চৌধুরী বা 'বীরবল' বঙ্গসাহিত্যের একজন অতিপ্রসিদ্ধ লেখক। পাবনা জেলার হরিপুরের প্রসিদ্ধ চৌধুরীবংশে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে কিছুকাল ব্যারিষ্টারী করেন; তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে অধ্যাপকতা করেন। 'সবুজ পত্র' নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকায় সম্পাদকরূপে ইনি কথ্যভাষায় নানা-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনব সরস রচনাশৈলীর প্রবর্ত্তক হিসাবে ইঁহার খ্যাতি আছে। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'বীরবলের খাতা,' 'চার ইয়ারী কথা,' 'সনেট্-পঞ্চাশৎ,' 'নীললোহিত' প্রভৃতি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি ১৯৪৬ সালে পরলোকগমন করেন।]

মন্ত্রশক্তিতে তোমরা বিশ্বাস কর না, কারণ আজকাল কেউ করে না;—কিন্তু আমি করি। এ বিশ্বাস আমার জন্মেছে, শাস্ত্র প'ড়ে নয়, মন্ত্রের শক্তি চোখে দেখে।

চোখে কি দেখেছি, বলছি।

দাঁড়িয়ে ছিলুন চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায়। জন দশ-বারো লেঠেল জমায়েত হয়েছিল পুব দিকে, ভোগের দালানের ভগ্নাবশেষের সুমুখে; পশ্চিমে শিবের মন্দির, যার পাশে বেলগাছে একটি ব্রহ্মদৈত্য বাস করতেন, যাঁর সাক্ষাৎ বাড়ীর দাসী-চাকরানীরা কখনো কখনো রাত দুপুরে পেত',—ধোঁয়ার মত যাঁর ধড়, আর কুয়াসার মত যাঁর জটা। আর দক্ষিণে পুজোর আঙ্গিনা—যে আঙ্গিনায় লক্ষ বলি হয়েছিল ব'লে একটি কবন্ধ জন্মেছিল। এঁকে কেউ দেখেননি, কিন্তু সকলেই ভয় করতেন।

লেঠেলদের খেলা দেখবার জন্য লোক জুটেছিল কম নয়। মনিরুদ্দি সর্দ্দার, তার সৈন্য-সামন্ত কে কোথায় দাঁড়াবে, তারই ব্যবস্থা করছিল। কি চেহারা তার! গৌরবর্ণ, মাথায় ছ-ফুটের উপর লম্বা, গালে লম্বা পাকা দাড়ি, গোঁপ-ছাঁটা। সে ছিল ওদিগের সব সেরা লকড়িওয়ালা।

এমন সময় নায়েববাবু আমাকে কানে কানে বললেন, "ঈশ্বর পাটনিকে এক হাত খেলা দেখাতে হুকুম করুন না। ঈশ্বর লেঠেল নয়, কিন্তু শুনেছি, কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কি—ও হাতে নিলে, কোন লেঠেলই ওর সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। আপনি হুকুম ক'রলে, ও না ব'লতে পারবে না, কারণ, ও আপনাদের বিশেষ অনুগত প্রজা।"

এর পর নায়েববাবু ঈশ্বরকে ডাকলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে একটি লম্বা ছিপছিপে লোক বেরিয়ে এল। তার শরীরে আছে শুধু হাড় আর মাস,—চর্ব্বি একবিন্দুও নেই। রঙ তার কালো, অথচ দেখতে সুপুরুষ।

আমি তাকে বললুম, "আজ তোমাকে এক-হাত খেলা দেখাতে হবে।"

লোকটা অতি ধীরভাবে উত্তর করলে, "হুজুর, লেঠেলি আমার জাত্-ব্যবসা নয়। বাপ-ঠাকুরদার মত—আমিও খেয়ার নৌকো পারাপার ক'রেই দু'-পয়সা কামাই। আমার কাজ লাঠিখেলা নয়, লগিঠেলা। তাই বলছি হুজুর, এ আদেশ আমাকে করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তা হ'লে তুমি লাঠি খেলতে জানো না?"

সে উত্তর করলে, "হুজুর, জানতুম ছোকরা বয়সে। তার পর আজ বিশ-পঁচিশ বছর, লাঠিও ধরিনি, লকড়িও ধরিনি, সড়কিও ধরিনি;—তা ছাড়া—

আর একটা কথা আছে। এদের কাছে আমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে, আমি আর লাঠি-সড়কি ছোঁব না। সে কথা ভাঙি কি ক'রে? হুজুরের হুকুম হ'লে, আমি না বলতে পারিনে, তবে—হুজুর যদি আমার কথাটা শোনেন, তবে হুজুর আমাকে আর এ আদেশ করবেন না।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "কেন এ রকম দিব্যি করেছিলে?"

ঈশ্বর বল্‌লে, "ছেলেবেলার এরা সব খেলা শিখতো। আমিও খেলার লোভে এদের দলে জুটে গিয়েছিলুম। আমার বয়েস যখন বছর কুড়িক, তখন কি লাঠি, কি লকড়ি, কি সড়কিতে—আমিই হ'য়ে উঠলুম সকলের সেরা। এরা ভাবলে যে, আমি কোনও মন্তর-তন্তর শিখেছি—তারি গুণে আমি সকলকে হঠিয়ে দিই। হুজুর, আমি তন্তর-মন্তর কিছুই জানিনে, তবে আমার যা ছিল, তা এদের কারও ছিল না। সে জিনিস হচেছ্ চোখ। আমি অন্যের চোখের ঘোরাফেরা দেখেই বুঝতুম যে, তার হাতের লাঠি, সড়কির মার কোন্ দিক্ থেকে আসবে। কিন্তু আমার চোখ দেখে এরা কিছুই বুঝতে পারতো না, আর শুধু মার খেতো। শেষটা এরা সকলে মিলে যুক্তি করলে যে, আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবে। তার পর, একদিন এরা রাত দুপুরে আমার বাড়ী চড়াও হ'য়ে, আমাকে বিছানা থেকে তুলে, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে আমাকে কালীবাড়ী নিয়ে গিয়ে হাড়কাঠে ফেলে বলি দেবার উদ্‌যোগ কর্‌লে। খাঁড়া ছিল ঐ গুলিখোর মিছু সর্দ্দারের হাতে। আমি প্রাণভয়ে অনেক কান্নাকাটি করবার পর এরা বল্‌লে,—তুমি ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি কর যে, আর কখনো লাঠি ছোঁবে না, তা হ'লে তোমাকে ছেড়ে দেব। হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি এই দিব্যি করেছি; আর তার পর থেকে একদিনও লাঠি-সড়কি ছুঁইনি। কথা সত্যি কি মিথ্যে—ঐ গুলিখোর মিছুকে জিজ্ঞেস করলেই টের পাবেন।"

মিছু আমাদের বাড়ীর লেঠেলের সর্দ্দার।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ঈশ্বরের কথা সত্যি না মিথ্যে?" সে 'হাঁ' 'না'—কিছুই উত্তর কর্‌লে না।

ঈশ্বর এর পর ব'লে উঠল, "হুজুর, আমি মিথ্যে কথা জীবনে বলিনি—আর, কখনো বল্‌বও না।"

তার পর, আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, "মিছু যদি গুলিখোর হয়, ত এমন পাকা লেঠেল হ'ল কি ক'রে?"

ঈশ্বর বল্‌লে, "হুজুর, নেশায় শরীরের শক্তি যায়, কিন্তু গুরুর কাছে শেখা বিদ্যে ত যায় না। বিদ্যে হচ্ছে আসল শক্তি। সেদিন দেখলেন না? ঠাকুরদাস কামার অত বড় মোষটার মাথা এককোপে বেমালুম কাটলে, আর ঠাকুরদাস দিনে-দুপুরে গুলি খায়। আমি নেশা করিনে বটে, কিন্তু বয়সে আমার শরীরের জোর এখন ত ক'মে এসেছে—যেমন সকলেরই হয়। যদি এরা অনুমতি দেয়—তা হ'লে দেখতে পাবেন যে, বুড়ো হাড়েও বিদ্যে সমান আছে।"

এর পর আমি লেঠেলদের জিজ্ঞেস করলুম—তারা ঈশ্বরকে খেলবার অনুমতি দেবে কি না। তারা পরস্পর পরামর্শ ক'রে বল্‌লে, "আমরা ওকে হুজুরের কথায় আজকের দিনের মত অনুমতি দিচি। দেখা যাক, ও কি ছেলে-খেলা করে।"

লেঠেলদের অনুমতি পাবার পর, ঈশ্বর কোমরের কাপড় তুলে বুকে বাঁধলে; আর তার ঝাঁকড়া চুল, একমুঠো ধুলো দিয়ে ঘ'সে ফুলিয়ে তুললে, তার পর মাটিতে যোড়াসন হ'য়ে ব'সে, পাঁচ মিনিট ধ'রে বিড় বিড় ক'রে কি ব'কতে লাগল। অমনি লেঠেলরা সব এই ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল, "দেখছেন, বেটা মন্তর আওড়াচেছ—আমাদের নজরবন্দী করবার জন্যে।" ঈশ্বর এসব চেঁচামেচিতে কর্ণপাতও করলে না। তার পর, যখন সে উঠে দাঁড়াল, তখন দেখি, সে আলাদা মানুষ। তার চোখে আগুন জ্বল্‌ছে ও শরীরটে হয়েছে ইস্পাতের মত।

ঈশ্বর বল্‌লে, "প্রথম এক হাত লকড়ি নিয়েই ছেলে-খেলা করা যাক। এদের ভিতর কে বাপের বেটা আছে, লকড়ি ধরুক।"

মনিরুদ্দি সর্দ্দার বল্‌লে, "আমার ছেলে কামালের সঙ্গেই এক হাত খেলে, তাকে যদি হারাতে পার, তা হ'লে আমি তোমাকে লকড়ি খেলা কাকে বলে, তা দেখাব।" তার পরে একটি বছর কুড়িকের ছোকরা এগিয়ে এল। সে তার বাপের মতই সুপুরুষ, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি; বাঁ হাতে ছোট্ট একটি বেতের ঢাল আর ডান হাতে পাকা বাঁশের লাল টুকটুকে একখানি লকড়ি। খেলা

সুরু হ'ল; তার পর, এক মিনিটের মধ্যেই দেখি—কামালের লকড়ি ঈশ্বরের বাঁ হাতে, আর কামাল নিরস্ত্র হ'য়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। তখন ঈশ্বর বল্‌লে, "যে লকড়ি হাতে ধ'রে রাখতে পারে না, সে আবার খেলবে কি?"

একথা শুনে—মনিরুদ্দি রেগে আগুন হ'য়ে লকড়ি-হাতে এগিয়ে এল। ঈশ্বর বল্‌লে, "তোমার হাতের লকড়ি কেড়ে নেব না, কিন্তু তোমার গায়ে আমার লকড়ির দাগ বসিয়ে দেব।" এর পরে পাঁচ মিনিট ধ'রে দু'জনের লকড়ি বিদ্যুদ্‌বেগে চলাফেরা করতে লাগল। শেষটা মনিরুদ্দির লকড়ি উড়ে শিবের মন্দিরের গায়ে গিয়ে পড়ল। আর দেখি—মনিরুদ্দির সর্ব্বাঙ্গে লাল লাল দাগ হ'য়ে গিয়েছে, যেন কেউ সিঁদুর দিয়ে তার গায়ে ডোরা কেটে দিয়েছে।

মনিরুদ্দি মার খেয়েছে দেখে হেদাৎউল্লা লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, "ধর বেটা সড়কি।" ঈশ্বর বল্‌লে, "ধরছি। কিন্তু সড়কি যেন আমার পেটে বসিয়ে দিও না। জানি তুমি খুনে। কিন্তু এ ত কাজিয়ে নয়—আপোসে খেলা। আর এই কথা মনে রেখ, রক্ত যেমন আমার গায়ে আছে, তোমার গায়েও আছে।" এর পর সড়কির খেলা সুরু হ'ল। সড়কির সাপের জিভের মত ছোট ছোট ইস্পাতের ফলাগুলো অতি ধীরে ধীরে একবার এগোয় আবার পিছোয়। এ খেলা দেখতে গা কি রকম করে, কারণ সড়কির ফলা ত সাপের জিভ নয়, দাঁত। সে যাই হোক, হেদাৎউল্লা হঠাৎ 'বাপ রে' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল।

তখন তাকিয়ে দেখি, তার কব্জি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে, আর তার সড়কিখানি রয়েছে মাটিতে প'ড়ে। ঈশ্বর বল্‌লে, "হুজুর, নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ওর কব্জি জখম করেছি, নইলে ও আমার পেটের নাড়ীভুঁড়ি বার ক'রে দিত। আমি যদি সড়কি ওর হাত থেকে খসিয়ে না দিতুম, তা-হ'লে তা আমার পেটে ঠিক ঢুকে যেত। এ খেলার আইন-কানুন ও বেটা মানে না, ও চায়—হয় জখম করতে, নয় খুন করতে।"

হেদাৎউল্লার রক্ত দেখে লেঠেলদের মাথায় খুন চ'ড়ে গেল, আর সমস্বরে—'মার বেটাকে' ব'লে চীৎকার ক'রে তারা বড় বড় লাঠি নিয়ে ঈশ্বরকে আক্রমণ

করলে। ঈশ্বর একখানা বড় লাঠি দু'হাতে ধ'রে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করতে লাগল। তখন আমি ও নায়েববাবু দু'জনে গিয়ে লেঠেলদের থামাতে চেষ্টা করতে লাগলুম। হুজুরের হুকুমে তারা সব তাদের রাগ সামলে নিলে, আর তা ছাড়া লাঠির ঘায়ে অনেকেই কাবু হ'য়েছিল। কারও কারও মাথাও কেটে গেছিল। শুধু ঈশ্বর এদের মধ্যে থেকে অক্ষত শরীরে বেরিয়ে এসে আমাকে বললে, "আমি শুধু এদের মার ঠেকিয়েছি। কাউকেও এক ঘা মারিনি। ওদের গায়ে-মাথায় যে দাগ দেখছেন—সে সব ওদের লাঠিরি দাগ। এলোমেলো লাঠি চালাতে গিয়ে—এর লাঠি ওর মাথায় প'ড়েছে, ওর লাঠি এর মাথায়। আমি যে এদের লাঠিবৃষ্টির মধ্যে থেকে মাথা বাঁচিয়ে এসেছি, সে শুধু হুজুরের—ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে।"

মিছু সর্দার বললে, "হুজুর, আগেই বলেছিলুম, ও বেটা যাদু জানে, এখন ত দেখলেন যে, আমাদের কথা ঠিক। মন্তরের সঙ্গে কে লড়তে পারবে?"

ঈশ্বর হাতযোড় ক'রে বললে, "হুজুর, আমি মন্তর-তন্তর কিছুই জানিনে। তবে লাঠি-সড়কি ধরামাত্র আমার শরীরে কি যেন ভর করে। শক্তি আমার কিছুই নেই; যিনি আমার দেহে ভর করেন, সব শক্তি তাঁরই।"

আমি বুঝলুম—লেঠেলদের কথা ঠিক। ঈশ্বরের গায়ে যিনি ভর করেন, তাঁরই নাম মন্ত্রশক্তি অর্থাৎ দেবতা। শুধু লাঠিখেলাতে নয়, পৃথিবীর সব খেলাতেই—যথা, সাহিত্যের খেলাতে, পলিটিক্সের খেলাতে—তিনিই দিগ্বিজয়ী হন, যাঁর শরীরে এই দৈবশক্তি ভর করে। এ শক্তি যে কি, যাঁদের শরীরে তা নেই, তারা তা জানেন না, আর যাঁদের শরীরে আছে, তাঁরাও জানেন না।

ভাগ্য-বিচার

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র গুণেন্দ্রনাথের পুত্র। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা—জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই ইঁহার চিত্রাঙ্কন-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতৃরূপে ইঁহার খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইনি কলিকাতার সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ ও কিছুকাল অধ্যক্ষ ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে ইঁহার দান সামান্য নয়। ইঁহার 'রাজকাহিনী,' 'ক্ষীরের পুতুল,' 'ভূতপত্রীর দেশ,' 'ঘরোয়া' ইত্যাদি পুস্তকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকালের জন্য কলাবিদ্যার বাগীশ্বরী অধ্যাপক এবং রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর ছয় বৎসর বিশ্বভারতীর আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে সি. আই. ই. এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর উপাধি দান করিয়াছেন।]

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরামুংরা। সেইখানে এক পাহাড়; তাকে বলে ব্যাঘ্রমেরু; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী যোগিনী। পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দেবীর দেউল। রাজপুত্রেরা দুরন্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যাপূজার যোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন; মন্দির খালি; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে আর গুহার সাম্‌নে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যাবেলার আলো পড়েছে—রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে। সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সুরজমল ব'লে উঠলেন, "কেমন, বলেছিলেম তো কপাল ফোঁপরা। মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি ক'রে প্রণাম দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চল।" পৃথ্বীরাজ ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, "তা হবে না, এইখানে বসতে হবে, আরতির পরে হাতগুণিয়ে তবে ছুটি।" একদিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল আর একদিকে সিদ্ধিকরীর খাটিয়া, তার উপরে ছেঁড়া কাঁথা। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসুল। বাঁশের খাটিয়া একবার

মচাৎ ক'রে শব্দ ক'রেই চুপ করলে। সঙ্গ গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপরে মাটিতে, আর সুরজমল বসলেন একটা হাঁটু বাঘছালে রেখে একেবারে আগুনের মতো তপ্ত পাথরের মেঝেয়।

ভর-সন্ধ্যায় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিয়ে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ-হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন, চার মূর্তি! সঙ্গ উঠে সিদ্ধিকরীকে নমস্কার ক'রে বসলেন। সুরজমলকে আর উঠতে হল না—তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম করলেন। পৃথ্বীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘাড়টা নোয়ালেন, হাতদুটো একটু কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল; আর জয়মলটা উঠলও না, নমস্কারও দিলে না, বসে-বসেই বল্‌লে, "মাতাজী, গণনা ক'রে বলুন তো আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের সিংহাসনটা র'য়েছে?"

সিদ্ধিকরী কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালেই হাত বোলাতে লাগলেন, আর গেরুয়াকাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে থাকলেন, দেখে পৃথ্বীরাজ ব'লে উঠলেন—"ভাবেন কি? বড় জরুরী কথা! বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে গণনা ক'রে উত্তর দেবেন।" সঙ্গ বল্‌লেন, "আগে চারণীর পুজোটা ওঁকে সেরে নিতে দাও, পরে ও-সব ক'য়ো।" "সেই ভালো" ব'লে সিদ্ধিকরী পুজোয় বসলেন; চারণীর সাম্‌নে একবার প্রদীপ নেড়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চার রাজপুত্রের মাথার পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বল্‌লেন, "রাজকুমারেরা, একটা ইতিহাস বলি শোন—

"পূর্বকালে উজ্জয়িনীনগরে একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজ-সভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ কর্‌তে বসবেন এমন সময় লক্ষ্মী-সরস্বতী বিবাদ কর্‌তে কর্‌তে সেখানে উপস্থিত। মহারাজ তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বল্‌লেন, 'দেবী, আপনাদের কি প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন।' দুজনেই রাজাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বল্‌লেন, 'বৎস বিক্রমাদিত্য, তুমি তো রাজা, বিচার কর দেখি আমাদের দুজনের মধ্যে কে বড়!' বীণা-হস্তে সরস্বতী ঝংকার দিয়ে বল্‌লেন, 'আমি বড়, না ও বড়?' লক্ষ্মী বীণাপাণির ঝংকারের উপর অলংকার দিয়ে বল্‌লেন, 'এই আমি, না ওই ওটা, কে বড়?' রাজা দেখেন বড় গোলযোগ—একে বড় করলে উনি চটেন, ওঁকে খাটো করলে তিনি চটেন!

"রাজা দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোচ্ছেন দেখে বিক্রমাদিত্যের ছোট রাণী ব'লে উঠলেন—'ঠাকরুণরা, রাজাকে কিছু খেয়ে নিতে দিন, সারাদিন বিচার ক'রে ওঁর এখন মাথার ঠিক নেই, সুবিচার করেন কি ক'রে? আজকের রাতটা ওঁকে ভেবে ঠিক করতে দিন, কাল রাজসভায় ঠিক বিচার হ'য়ে যাবে দেখবেন।' রাজা বল্‌লেন, 'এ পরামর্শ মন্দ নয়, কঠিন সমস্যা, একটু সময় পেলে ভালো হয়।' দেবীরা 'তথাস্তু' ব'লে বিদায় হলেন। রাজা জলযোগে ব'সে ছোটরাণীকে বল্‌লেন, 'দেবীদের আজকের মতো তো বিদায় করলে, কিন্তু কালকের বিচারটা কি হবে কিছু ঠাউরেছ কি?' রাণী ভিরকুটি ক'রে বল্‌লেন, 'বিচারের আমি কি জানি! তোমার সভায় নবরত্নের মধ্যে কেউ পণ্ডিত, কেউ কবি, কেউ মন্ত্রী, কেউ যন্ত্রী; তাঁদের শুধোও না।' রাজা মাথা চুল্‌কে সভায় প্রস্থান করলেন।

"সভার মধ্যে নবরত্ন হাজির—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতাল-ভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি রাজার প্রশ্ন শুনে ন'জনেই মাথা চুল্‌কতে আরম্ভ করলেন; রাত্রি দুইপ্রহর বাজ্‌ল কিছুই মীমাংসা হ'ল না, দুই দেবীর বিচার কি হিসেবে করা যায়? সরস্বতীকে বড় বল্‌লে চটেন লক্ষ্মী, রাজ-পাট সব যায়, নবরত্নেরও মাসহারা বন্ধ হয়। আবার যদি বলা যায় সরস্বতী ছোট, লক্ষ্মীই বড়, তবে বিদ্যে পালায়, বুদ্ধি পালায়, কালিদাসের কবিতা-লেখা বন্ধ, ধন্বন্তরির চরকসংহিতা, বরাহমিহিরের পাঁজি-পুথি খনার বচন সবই মাটি! রাজাই বা কি বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য চালান, হিসেব দেখেন, বিচার করেন? বিক্রমাদিত্য বিষম ভাবিত হ'য়ে অন্দরে এসে বিছানা নিলেন। রাণী দেখেন রাজার নিদ্রা নেই, কেবলি এপাশ-ওপাশ করছেন; যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে। তারপর"—এমন সময় পৃথ্বীরাজ ব'লে উঠলেন—"ও গল্পতো আমরা জানি। দুই দেবীর একজন এসে বসেছিলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে, অন্যে বসেছিলেন রূপোর খাটে; ছোটবড় বিচার আপনিই হয়েছিল। গল্প থাক, এখন দেখুন দেখি বিচার ক'রে আমাদের মধ্যে রাজা হবে কে?"

সিদ্ধিকরী একবার চার জনের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "রাজকুমার, তোমরা নিজেই নিজেদের বিচার শেষ ক'রে ব'সে আছ। সঙ্গ—যিনি ব'সে আছেন বাঘ-ছালে বীরাসনে, উনিই ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায় রয়েছেন, তিনিই রাজ্যেশ্বর।

সুরজমল ব'সেছেন মাটিতে—সঙ্গের কাছেই মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে ওঁর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি উনি থাকবেন—হয় মন্ত্রী, নয় সর্দ্দার, নয় বড় জমিদার। আর পৃথ্বীরাজ, জয়মল, তোমরা ব'সেছ—সন্ন্যাসিনী যে আমি, আমার আসনে ছেঁড়া কাঁথায়, কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের অদৃষ্টে আর কিছুই নেই।"

এই কথা ব'লেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের মধ্যে চ'লে গেলেন; চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মতো কটমট ক'রে এর ওর দিকে চাইতে থাকল। সর্ব-প্রথম সুরজমল কথা বল্‌লেন,—"তা-হ'লে?" "তা-হ'লে সিংহাসন কার এইখানেই স্থির হ'য়ে যাক আজই।" ব'লেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন। সঙ্গ ছুটে গুহার বাহিরে যাবেন, তলোয়ারের চোপ পড়ল তাঁর একটি চোখের উপরে। চারণী দেবীর সাম্‌নে ভায়ের হাতে ভায়ের রক্তপাত ঘট্‌ল! সঙ্গ প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। এক দিকে গেলেন সুরজমল; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর একদিকে—এর পিছনে উনি, তাঁর পিছনে তিনি! অন্ধকার ঢেকে নিলে চারজনকেই।

চারণীমন্দির থেকে প্রায় একরাতের পথে রাঠোরসর্দ্দার 'বিদা'র কেল্লার বুরুজের ধরণে কাঁচামাটির দেওয়ালঘেরা খামার বাড়ি। রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ "রক্ষা কর" ব'লে বিদার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন। তাঁর একটা চোখের উপরে তলোয়ারের চোট পড়েছে, শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত। বিদা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রাজপুত্রকে দেখেই ব'লে উঠলেন, "একি! এমন দশা আপনার কে করলে?" সঙ্গ দু-কথায় তাকে বুঝিয়ে দিলেন—প্রাণ সংশয়, পৃথ্বীরাজ আর সুরজমল দুইজনেই অজ্ঞান হ'য়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন, কিন্তু জয়মল এখনও পিছনে তাড়া ক'রে আসছেন তাঁকে মারতে। বিদা সঙ্গকে তাঁর নিজের ঘোড়া দিয়ে বল্‌লেন, "রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, পরে নতুন ঘোড়ায় অন্য গ্রামে রওনা হবেন।" ওদিকে জয়মল আসছেন, একটা ঝড়ের মতো—মাঠের উপর দিয়ে। সঙ্গের ইচ্ছে তখনি তিনি পলায়ন করেন, কিন্তু রাজভক্ত বিদা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না কিছু না খাইয়ে-দাইয়ে। ওদিকে বিপদ্‌ ক্রমে এগিয়ে আসছে। সঙ্গ ইতস্ততঃ করছেন

দেখে বিদা বল্‌লে, "কোনো ভয় নেই, আপনি ভিতরে যান। নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটু বিশ্রাম ক'রে যতক্ষণ না আপনি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ জয়মলকে এই দরজার চৌকাঠ পার হ'তে হবে না, আমি তাঁকে ঠেকিয়ে রাখব।" তাই হ'ল। সঙ্গের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পূবমুখে অনেক দূরে ছোট একটি কালো ফোঁটার মতো আস্তে আস্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, সেই সময় তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সঙ্গ চ'লে গেছেন, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠোনের মাঝে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো ঘাস চিবুচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুতবীরের রক্তে রাঙা হাতখানা দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রইলেন—তারপর ঘাড় নীচু ক'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সকাল হ'য়ে গেল, কোন অজানা গাঁয়ের কিষাণরা সকালে ক্ষেতে যেতে-যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা দুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথ্বীরাজ! সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এদিকে মহারাণার লোকজনও—তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে, ঘোড়া পাল্‌কি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে; কিন্তু কেবল পৃথ্বীরাজ সুরজমল দু-জনকে তারা সন্ধান ক'রে ফিরে পেলে, আর দু-জন যে কোথায়, তার আর খবরই হ'ল না! পৃথ্বীরাজ রাণীদের যত্নে আস্তে-আস্তে সেরে উঠলেন, সুরজমলের চোট বেশী, অনেক তদ্বিরে তিনি সুস্থ হ'লেন। মহারাণা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথ্বীরাজকে ডেকে বল্‌লেন, "এই যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্যে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে, কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না; বেঁচে থাকে তো তোমারই ভয়ে সে কোথাও লুকিয়ে আছে। মনে ক'রো না তোমাকে আমি চিতোরে বেশ আরামে বসিয়ে রাখব, আর আমি চোখ বুজলেই আস্তে-আস্তে সিংহাসনে তুমি উঠে বসবে! আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও। লড়তেই যদি চাও তো বড়-ভায়ের সঙ্গে না ল'ড়ে পার তো রাজ্যের শত্রুদের জব্দ করগে, তবে বুঝব তুমি বীর—যাও।"

ছেলের উপর এই হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রাণা ডেকে বল্‌লেন, "তুমি সঙ্ককে বাঁচাতে চেয়েছিলে সেই জন্যে তোমাকে বেশী শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাক, চিতোর-মুখো হ'য়ো না।" সুরজমল তো নির্বাসনে গেলেন। এখন পৃথ্বীরাজ বা'র হলেন চিতোর ছেড়ে দিগ্‌বিজয়ে। তিনি জানতেন মহারাণার কাছে যদি কখনো ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন ক'রে তবে। রাণা রাগলেও, প্রজারা পৃথ্বীরাজকে সত্যি ভালোই বাস্‌ত, কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হ'ল না। দু-একজন ক'রে ক্রমে একটি ছোটোখাটো দল তাঁর সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হ'ল এখানে-ওখানে লড়াই ক'রে বেড়ানো। * * *

রাজস্থানের মীনারা—জংলী, দুর্দ্ধান্ত জাত; লুটপাট করাই তাদের কাজ। এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন কর্‌ছে। মহা-রাণাকেও সে তুচ্ছ করে; নদালা ব'লে একটা গ্রামে তার আড্ডা। পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করার মতলব কর্‌লেন। আহেরিয়া-পরব রাজস্থানের একটা মস্ত আনন্দের দিন; সেইদিন চাকর-মনিব সব এক হ'য়ে শিকার, বনভোজন—এমনি নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে। সেই আনন্দের দিনে মীনারায় বড়-বড় মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ কর্‌ছে, সেই সময় নিজের দলবল সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ ক'রে তাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে ছারখার ক'রে দিলেন। রাজা কাটা পড়ল। মীনারা যারা বাকী রইল, বনে-জঙ্গলে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে।

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে-ঘুরতে, বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময়ে বেদনোরে টোডার রাজা রায় শূরতান সিং পাঠানদের উৎপাতে রাজ্য-সম্পদ্ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমসুন্দরী তারাবাইকে নিয়ে মহারাণার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে কর্‌তে চায়, কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার করবে, তাকেই বিয়ে করবেন।

জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর শুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন, ঘোড়ায় চ'ড়ে ধনুর্বাণ হাতে শিকারে চলেছেন—যেন দেবী দুর্গা। জয়মল

টোডা-রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন। শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির ক'রে নিজের বাড়ীতে স্থান দিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে লড়তে যাবার নামও করেন না ; উল্‌টে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে মেরে তারাবাইকে বন্দী ক'রে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন।

শেষে অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপি-চুপি শূরতানের অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হলেন—ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি মেখে। বেশী দূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা প'ড়ে গেলেন। কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা ; তাঁকে ধ'রে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হ'ল না। তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়ন-ঘর থেকে একেবারে হাত ধ'রে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো ছিলেন না ! এক ঝাপটায় জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে বাঘিনীর মতো তার উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, একটি ছুরির ঘায়ে তার সব আস্পর্ধা শেষ ক'রে দিলেন। শূরতান সিং ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ থেকে ভূঁয়ে নামিয়ে বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি দিলেন রীতিমত।

জয়মল মহারাণার ছেলে ; আর শূরতান রাজা হ'লেও এখন মহারাণার আশ্রিত ; কাজেই চিতোরে যখন এই খবর পৌঁছুল, তখন সবাই ভাবলে এইবার শূরতান গেলেন ! কিন্তু মহারাণা সমস্ত ব্যাপার শুনে দূতদের বল্‌লেন, "জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়, সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, নির্বোধ, গোঁয়ার ! কোন্ বাপ তার নিজের কন্যার অপমান সইতে পারে ? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমার কোনো আক্ষেপ নেই। যাও, শূরতানকে বল গিয়ে—আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।"

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠল। তিনি সেইদিনই বেদনোরের দিকে রওনা হলেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই—দুজনেই সমান সুন্দর। সমানে সমানে মিল্‌ল। ভালোবাসলেন দুজনেই দুজনকে ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ কর্‌তে পার্‌লে বিয়ে হবার উপায় নেই।

পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করলেন টোডারাজ্য তিনি উদ্ধার করবেনই; আর সেইদিনই তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হলেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী আর অনেক পিছনে চল্লেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত সেপাই নিয়ে। তখন আশ্বিন মাস, মহরমের দিন। টোডাশহরের মোগল-বাজারের প্রকাণ্ড চক—নিশেন আর ঘোড়া আর নানাবর্ণের কাগজের তাজিয়া, দুল্‌দুল্, পাঞ্জা, লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার আর লোকে-লোকে গিসগিস করছে। স্বয়ং সুলতান জুম্মা মস্‌জিদের ছাদে উঠে তামাসা দেখছেন, এমন সময় মস্ত একটা তাজিয়া সঙ্গে হাসন-হোসন করতে-করতে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে রয়েছেন সেখানে গিয়ে থামল। সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলেন দুজন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে। আর বেশী কিছু সুলতানকে দেখ্‌তে হল না; ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে সুলতানের বুকের মাঝ থেকে প্রাণটি শুষে নিয়ে সোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল—আকাশের দিকে। টোডার সুলতান উল্‌টে পড়লেন; সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত ফৌজ এসে সহরে হানা দিলে। রাজপুত যারা, তারা গিয়ে পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইকে ঘিরে লড়তে লাগল—মুসলমানদের সঙ্গে। সকাল বেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল ক'রে নিলেন।

পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারাণার কাছে পৌঁছুল। এইবার বাপের প্রাণ গল্‌ল। জয়মল নেই, সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানে না, একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বীরাজ—ছেলের মতো ছেলে। মহারাণা পৃথ্বীরাজের সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীরের কেল্লায় দুজনকে থাকবার হুকুম দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রাণার আত্মীয় সারংদেব আর সুরজমল দুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলেন। পৃথ্বীরাজ তখন অনেক দূরে—কমলমীরে; সওয়ার খবর নিয়ে সেদিকে ছুটল—মহারাণা দলবল নিয়ে চটপট লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন। চিতোরের খুব কাছে গাভিরী-নদীর ওপারে সুরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে। সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধ্‌ল। রাণার ফৌজ ক্রমেই হটতে লাগল। সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ঘা খেয়ে মহারাণা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছেন, সুরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল

করেছে, বিদ্রোহীদের আর ঠেকিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেদিনের মতো স্থগিত রইল। দুই দলেই লড়াই বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছে, মাঠের দিকে দিকে মশাল আর ধুনি জ্বলছে; সারাদিনের পর সুরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘা-গুলো ধুয়ে পুঁছে পটি বেঁধে একটু বিশ্রামের চেষ্টায় আছেন, এমন সময় হঠাৎ সাম্‌নে পৃথ্বীরাজকে দেখে সুরজমল খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের পটিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধ'রে খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "ভয় নেই; কেমন আছ তাই জানতে এলেম।" সুরজমল একটু হেসে বল্‌লেন, হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেম। যা হোক, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে খুশী হলেম। মহারাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি?" পৃথ্বীরাজও হেসে বল্‌লেন, "কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে আসছি, বাবার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।" এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির হ'ল। সুরজমল বললেন, "আরে দেখচিস্‌নে কে এসেছে। যা দৌড়ে আর এক থাল নিয়ে আয়।" দাসী এদিক-ওদিক চাইছে দেখে সুরজমল বল্‌লেন, "বুঝেছি, সারংদেব এই একখানা বই আর কিছু পাঠায়নি; খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাব।" শুনেই পৃথ্বীরাজ একটা মিষ্টি তুলে মুখে দিলেন। দিনের বেলার শত্রুতা গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার চোটে কোথায় পালিয়ে গেল! বিদায়ের সময় পৃথ্বীরাজ খুড়োকে বল্‌লেন, "আমাদের পুরানো ঝগড়াটা তা'-লে আজ তোলা থাক, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কি বল?" সুরজমল হেসে বল্‌লেন, "বেশ, আজকের মতো একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরি থাকব, জেন।"

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথ্বীরাজ হারিয়ে দিলেন। সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চল্‌লেন। পৃথ্বীরাজও তাদের পিছনে তাড়িয়ে চল্‌লেন—একটার পরে একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় কর্‌তে-করতে। শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না। সারং-দেবের রাজ্যটা পর্য্যন্ত পৃথ্বীরাজ দখল ক'রে নিলেন। সব রাজার রাজ্যের

সীমানার বাইরে দেউলগড়ে, সুরজমল নির্ভয়ে রইলেন, নিশ্চিন্ত হ'য়ে মরবার সময় পেলেন; তাঁর কপালের লিখন এমনি ক'রে ফল্‌ল।

জয়মল, সুরজমল, দুজনেই চিতোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ থেকে স'রে পড়লেন; রইলেন কেবল সঙ্গ; একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের চর এসে খবর দিলে—সঙ্গ বেঁচে আছেন; শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের উদ্‌যোগ হচ্ছে। পৃথ্বীরাজ তখনি নিজের দলবল নিয়ে সঙ্গকে জালে বাঁধার পরামর্শ কর্‌তে বসলেন; কিন্তু পৃথ্বীরাজের অদৃষ্টও ব'সে ছিল না, সে দিনে-রাতে আলোতে-অন্ধকারে সুখে-দুঃখে মিলিয়ে যে বেড়াজাল পৃথ্বীরাজকে ধর্‌বার জন্যে বুনে চলেছিল, এতদিনে সেটা শেষ হ'ল। সকালে পৃথ্বীরাজ সেজেগুঁজে সঙ্গকে ধর্‌বার জন্যে বা'র হবেন, এমন সময় শিরোহি থেকে তাঁর ছোটবোনের এক পত্র পেলেন। সে অনেক দুঃখের কাহিনী। বিয়ে হ'য়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান কর্‌ছে, লাথি মার্‌ছে, ঘরের বা'র ক'রে দিতে চাইছে। সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং একেবারে নির্দয়। বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না নিলে তাঁর ছোটবোন মারা যাবে। ছোটবোনের কান্না-ভরা সেই চিঠি প'ড়ে,—পৃথ্বীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে—কিন্তু যাওয়া হ'ল না, পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহির মুখে—বোনকে রক্ষা ক'রতে। অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চল্‌ল পৃথ্বীরাজকে সঙ্গের দিক্ থেকে ঠিক উল্‌টো মুখে—অনেক দূরে।

রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় প'ড়ে রাণার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলছেন, রাণার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহির রাজা ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাথিতে শিরোহির রাজাটাকে ভুঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন। রাণার মেয়ে পৃথ্বীরাজের তলোয়ার চেপে ধ'রে বল্‌লেন, "দাদা থাম, প্রাণে মের না।" পৃথ্বীরাজ রেগে বল্‌লেন, "এত বড় ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে। জানে না, তুই মহারাণার মেয়ে। ওকে কুকুরের মতো চাবুক মেরে সিধে কর্‌তে হয়।" শিরোহিরাজের তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথ্বীরাজের পা জড়িয়ে বল্‌লে, "এমন কাজ আর হবে না, ক্ষমা কর।" পৃথ্বীরাজ তার ঘাড় ধ'রে দাঁড় করিয়ে বল্‌লেন, "নে, আমার বোনের জুতোজোড়া মাথায় ক'রে ওর কাছে ক্ষমা চা—

তবে রক্ষে পাবি।" "একথা আগে বল্‌লেই হ'ত" ব'লে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় দেখে রাণী বল্‌লেন, "থাক, এবার এই পর্য্যন্ত। যাও এখন দাদাকে জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করগে, আমায় একটু ঘুমুতে দাও।"

রাণার জামাই খুব খাতির ক'রে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহির খাসা নাড়ু গুটিকতক জল-খেতে দিলেন। শিরোহির খাসা-নাড়ু—অমন নাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁর পৌঁছতে হল না; শিরোহির মতিচুর সেঁকোবিষ আর হীরেচুরে মেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল—জুতো-তোলার শোধ নিতে।

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন—রাস্তার ধুলোয়। কমলমীর—যেখানে তাঁর তারারাণী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল। আর ঠিক সেই সময় সঙ্গের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবৎখানায় ব'সে আশা-রাগিণীর সুর বাজিয়ে দিলে— "ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।"

সনাতনের সংসার-ত্যাগ

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

[অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র যশোহর জেলার সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃতিত্বের সহিত দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। পরে কিছুদিন বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য্য করিয়া সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হ'ন। বৈষ্ণব সাহিত্য ও কীর্ত্তন-সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ বলিয়া ইঁহার খ্যাতি আছে। ইঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে প্রবন্ধপুস্তক—মুদ্রাদোষ ও সুখদুঃখ, কথাসাহিত্যের পুস্তক—

নীলাম্বরী, বিবি বউ ও সম্পাদিত পুস্তক পদামৃত-মাধুরী চারি খণ্ড, (সটীক পদাবলী-সংগ্রহ) ও শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবসরগ্রহণ করার পরও ইনি বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নানা ভাবে সেবা করিতেছেন।]

১

শহরের উপকণ্ঠে বিস্তৃত প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বহুদূর পর্য্যন্ত নারিকেল সুপারির সারি চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে লহরী তুলিয়া গঙ্গা নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। নারিকেল-কুঞ্জে মর্ম্মরধ্বনি ও গঙ্গার মৃদু কুলু কুলু ধ্বনি ব্যতীত আর কোনও শব্দ নাই। সনাতন এই প্রাসাদের কক্ষে ভাগবত-পাঠ শুনিতেছেন নিবিষ্ট মনে। সন্ধ্যার আসন্ন আঁধারের পূর্ব্বেই কক্ষ আলোকিত হইয়াছে—কিন্তু সে আলোকও ক্ষীণ; মাত্র পাঠকের ভাগবত-পাঠ বাধা পাইতেছে না। এমন সময়ে সোপানে পদশব্দ হইল:

একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া বলিল, 'স্বয়ং বাদশা'।

'অ্যাঁ—বাদশা হোসেন শা আসছেন'?

সনাতন চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। পাঠ তখনও চলিতেছে—উদ্ধব-সংবাদ। ব্রজগোপীরা উদ্ধবকে দেখিয়া বলিতেছেন:

'আমরা কাঙ্গালিনী, তুমি রাজবেশ পরিয়া আমাদের নিকট আসিয়াছ, নিশ্চয়ই তোমার কোনও উদ্দেশ্য আছে, বল তোমার কি উপকার আমরা করিতে পারি?'

হোসেন শা শুনিলেন এবং সনাতনের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে কথককে ইঙ্গিতে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—

'শোনো, সাকর মল্লিক, তোমার কি হয়েছে, আমায় বলো? অসুখের অছিলা ক'রে রাজকার্য্য থেকে বিদায় নিয়েছ, অথচ আমার প্রেরিত বৈদ্য বলেছে, তুমি বেশ ভালই আছ। কি ব্যাপার?'

সনাতন এবারে স্বপ্নোত্থিতের মতো গাত্রোত্থান করিয়া যথাযোগ্য ভাবে নৃপতিকে অভিবাদন করিলেন। বলিলেন:—

'আমায় ক্ষমা করুন, রাজন্। বিষয়কর্ম্মে আর মন দিতে পারি না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—নিজের সঙ্গে রীতিমত সংগ্রাম করেছি—কিন্তু আমি

সে সংগ্রামে পরাজিত, ক্ষতবিক্ষত, লাঞ্ছিত। আমায় আপনি বিদায় দিন এবং যোগ্য লোককে আমার কর্ম্মে বাহাল করুন।'

'তা হয় না বন্ধু। তোমার মতো বিশ্বস্ত, পণ্ডিত, সুদক্ষ কর্ম্মচারী মুখের কথায় মেলে না। আমার এই সোনার রাজ্যে তোমরাই এমন সৌষ্ঠব এনে দিয়েছ, সে কথা আমি জানি আর খোদা জানেন। আমার দবির খাস চ'লে গেল আমায় দাগা দিয়ে। তুমি যেও না, মন্ত্রি!'

সনাতন চুপ করিয়া রহিলেন। কথক ও অন্য শ্রোতারা ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়াছিলেন। হোসেন শা একজনমাত্র পার্শ্বরক্ষী লইয়া আসিয়াছেন, সেও বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে। স্তিমিত আলোকে নবাব দেখিলেন, সনাতনের দৃষ্টি অন্ধকারের ফ্রেমে আঁটা অস্পষ্ট আলোকের মধ্য দিয়া বহু দূর প্রসারিত হইয়াছে। সনাতনের মন যেন সংসার ছাড়িয়া, বহুমান্য অতিথির সম্পর্ক ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। কোন সুদূর হইতে যেন তাঁহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল—

'ঐ-ঐ-ঐ শুনুন, আমায় ডাকে। ঐ গৌরবর্ণ বালক তাহার ব্যাকুল দৃষ্টি আমার এই কুৎসিত মুখের উপর স্থাপন ক'রে আমায় ডাকে।'

বাদশা দেখিলেন, তাঁহার মন্ত্রী বাতিকগ্রস্ত। তিনি খুসী করিবার অভিপ্রায়ে সনাতনের হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, 'আমিও যাবো। আমায় নেবে না, বন্ধু?'

সনাতন আবার বাস্তবে ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'তুমি যাবে রাজাধিরাজ? পারবে না। সে সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে তুমি যেতে পারবে? কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া বর্ণ, ভুবনভুলানো রূপ, তরুণ বয়স—কিন্তু সন্ন্যাসী। সর্ব্বস্বত্যাগ না ক'রলে তার কাছে যে যাওয়া যায় না, রাজন্।'

'আমি যাবো। দক্ষিণ দেশে যাবার জন্যে যে সমর-সজ্জার আয়োজন করা হয়েছে, তা ত বাতিল করা যাবে না। আমি ফিরে আসি; এসেই তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাবে; কেমন?'

প্রতিশ্রুতিরূপ বন্ধনের মধ্যে ধরা দিবার মতো মনের অবস্থা সনাতনের নয়। তিনি অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাদশাহ্ বিদায় লইয়া রাজভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। সনাতন দেখিলেন, তিনি তাঁহার

নিজের বাসভবনে বন্দী। অসংখ্য অস্ত্রধারী সৈনিক বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু মন যাহার বাহিরে ছুটিয়াছে, তাহাকে কি নিগড়ে বাঁধিয়া রাখা যায়? সৈন্যদলের মধ্যে প্রধান রক্ষককে তিনি চিনিতেন; একসময়ে তাহাকে তিনিই বাহাল করিয়াছিলেন। আজ তাহার নিকট মুক্তির জন্য সনাতন কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহার মন ঐ পাষাণকারারই মতো পাষাণ দিয়া গড়া।

সনাতন জানিতেন, যখন করুণায় মন গলে না, তখন টাকায় মন টলে। তখন তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব সেই রক্ষীকে সমর্পণ করিয়া সনাতন তাঁহার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। রক্ষী সেই হইতে কিছু শিথিলভাবে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিল।

এই অবসরে কারাকক্ষের উচচ প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সনাতন গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গে চলিল তাঁহার পুরাতন বিশ্বাসী অনুচর ঈশান। রক্ষীর দল নিশীথে আমোদ-আহ্লাদে রত, এমন সময়ে দুইজন বন্দী গঙ্গায় স্রোতের টানে বহুদূর ভাসিয়া গেলেন! সংসারের বিষম কারাগার হইতে মুক্ত জীবন স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিল।

২

সনাতন শুনিয়াছিলেন, চৈতন্যচন্দ্র বনপথে শ্রীবৃন্দাবন গিয়াছেন। সুতরাং সেই পথ অনুসরণ করিয়া ছুটিতে হইবে। দীনহীন কাঙ্গালের বেশে সনাতন বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া পশ্চিম দেশাভিমুখে চলিলেন। শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল কিরূপে প্রভুর দর্শন পাইব। কোনও দিন নির্ঝরের নির্ম্মল জলে তৃষ্ণা দূর করেন, কোনও দিন তাহাও জোটে না। স্বাধীন বঙ্গের প্রখ্যাত ভূপতি হোসেন শাহের মন্ত্রী আজ পথের ভিখারী—ভিখারীরও অধম। গাছতলায় সনাতন যখন চক্ষু নিমীলিত করেন, তখন প্রভুভক্ত ঈশান বিনিদ্রভাবে কাছে বসিয়া থাকে। কিছুক্ষণ বাদে সনাতন উঠিয়া বসেন, বলেন—

'ঈশান, ঘুমোও নাই? একটু ঘুমোও, আমি জেগে আছি।' ঈশানের চক্ষে জল আসে। হায় অদৃষ্ট! দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যাঁহার নিদ্রা হইত না,

আজ তিনি কঠোর কর্কশ বৃক্ষতলেও একটু বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন না। ঈশান শুধু অনুগত ভৃত্য নয়, শিক্ষিত দরদী সঙ্গী।

পথ চলিতে চলিতে উভয়ে এক পর্ব্বতমালার সন্নিকটে আসিয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা সমাগত। পর্ব্বত পার হইবার উপায় নাই। জঙ্গলে ঢাকা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া একটি মাত্র সরু পথ, তাহা এক ঘাটোয়াল রক্ষা করিতেছে। সে পার করিয়া না দিলে উপায় নাই।

অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারা ঘাটোয়ালের শরণাপন্ন হইলেন। ঘাটোয়াল বলিল 'রাত্রি-প্রভাতে এ পাহাড় পার করিয়া দেওয়া হইবে, আপাততঃ এ রাত্রিটা আমার বাড়ীতেই থাকিতে হইবে।'

সনাতনের জীর্ণ বেশ, শীর্ণ দেহ, মলিন বদন, ঈশানেরও ততোধিক। চিরদিন সুখবিলাসে অতিবাহিত করিয়া এ দারুণ ক্লেশ সহিবে কেন?

কিন্তু ঘাটোয়াল বড়ই যত্ন করিতে লাগিল। সে ত জানে না তাঁহারা কে? তথাপি এত যত্ন কেন? তাঁহাদিগকে ভাল একটি ঘরে শয্যা-আদি দিয়া রাখিবার এত আয়োজন কিসের জন্য? সনাতন চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্টনাম জপ করেন, আর মাঝে মাঝে সংশয়ের কণ্টক মনে বিদ্ধ হইতে থাকে। ঈশান তখন নিদ্রাগত। হঠাৎ তাহাকে ঈষৎ ধাক্কা দিয়া জাগাইলেন।

'ঈশান, এই ঘাটোয়াল এমনভাবে আমাদের এত খাতির-যত্ন করছে কেন, বল্‌তে পারো?'

'লোকটি বোধ হয় ভাল।' ঈশান উত্তর করিল।

সনাতন ভাবিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'দেখো, এরা অতিরিক্ত খাতির-যত্ন করে অর্থবিত্ত যাদের আছে, শুধু তাদের। আমাদের ত কিছুই নেই।'

ঈশানের চক্ষু বিস্ফারিত হইল; চুপি চুপি বলিল, 'প্রভু, আমার কাছে কিছু আছে।'

সনাতন বিস্মিত হইলেন। তখন ঈশানের নিকট হইতে সাতটি স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া তিনি ঘাটোয়ালের সন্ধানে চলিলেন। ঘাটোয়াল কপট নিদ্রায় ছিল।

'কি মনে ক'রে, ঠাকুর? এত রাত্রে?'

'বাবা, আমরা ফকির মানুষ, তীর্থযাত্রায় চলেছি। সঙ্গে কিছু অর্থও এনেছি সেইজন্যে। কিন্তু টাকা সঙ্গে থাকলেই বিপদ্। তুমি যদি দয়া ক'রে এই বিপদ্ থেকে আমাদের বাঁচাও।'

'কি রকম?' ঘাটোয়াল আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল।

সনাতন বলিলেন, 'আমি তোমার অতিথি। তুমি আমাদের যথেষ্ট সেবা করেছ। তার বিনিময়ে আমাদের এই অর্থ তুমি গ্রহণ করো।' এই বলিয়া সনাতন তাহার সম্মুখে সাতটি মোহর রক্ষা করিলেন।

ঘাটোয়াল উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, বলিল, 'ফকির সাহেব, তোমাদের কাছে যে টাকাকড়ি আছে, তা আমার জানতে বাকী নেই। আমি এই কাজ করতে করতে পেকে গেলাম, আমি আর বুঝিনে? যাক্, বড় বিপদ এড়ালে ঠাকুর! আজ এই কয়টি মোহরের জন্যে তোমাদের প্রাণ যেতো। কাল প্রভাত আর তোমাদের দেখতে হ'তো না।'

সনাতন শিহরিয়া উঠিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে সনাতন পাতড়া পাহাড় পার হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঈশানকে বলিলেন:

'ঈশান, বন্ধু, আর নয়! একাই ভালো, তুমি ফিরে যাও। ঐ যে একটি মোহর রইলো, তোমার যাবার খরচ ওতেই চ'লে যাবে; তুমি বনপথে যেও না, সোজা পথে যাত্রীদের সঙ্গে মিশে চ'লে যাও, ভাই। আমার ভাগ্য নিয়ে আমি প্রাণের ঠাকুরের সন্ধানে চলি।'

ঈশান অনেক কাকুতিমিনতি করিল। কিন্তু সনাতন অটল। ঈশান বুঝিল যে, ধর্ম্মের পথ আর সঞ্চয়ের পথ এক নয়।

৩

জীর্ণচীরধারী নিঃশব্দ পথচারী সনাতন বৃন্দাবনের পথ ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে যাত্রীর দলের সঙ্গে দেখা হয়;—জিজ্ঞাসা করেন, 'হাঁগো, তোমরা কি দেখেছ? গৌরবর্ণ এক সন্ন্যাসী? সে মুখে হরি বলে আর চ'লে চ'লে পড়ে। দেখনি, না? দেখলে ভুলতে পারে এমন মানুষ নেই।'

সনাতনের বিশ্বাস সেই গৌরবর্ণ নবীন সন্ন্যাসী যেখানে যাইবেন সেখানে স্থাবর-জঙ্গম সবার মধ্যে সাড়া পড়িয়া যাইবে। নরনারী সব মাতিয়া উঠিবে, তুমুল কোলাহল না হইয়া যায় না। কিন্তু কই, কিছু ত শোনা যায় না। জয়-ধ্বনি ওই শোনা যায়—ঐ ঐ! কান পাতিয়া শোনেন, কিন্তু এ ত জয়ধ্বনি নয়, হাটের কোলাহল।

শ্রান্তক্লান্ত কলেবর; অনভ্যস্ত পদচারণায় ধূলায় রক্তের চিহ্ন মুদ্রিত হইতেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় উদাসীন সনাতন পথ চলিতেছেন। কখনও মনে মনে, কখনও বা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতেছেন। আনন্দে হৃদয় ভরিয়া যাইতেছে। আবার পরক্ষণেই সন্দেহে আকুল হইতেছেন, প্রভু কি কৃপা করিবেন? দর্শনের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শরীর থাকিবে ত?

দীর্ঘদিনের পথ-ক্লেশে রৌদ্রবৃষ্টি-ঝঞ্ঝার দুঃসহ প্রকোপে সনাতনের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কালি-ঢালা হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ শ্মশ্রু সমস্ত মুখখানি ব্যাপিয়াছে। একখানি কম্বল কাঁধের উপর ফেলিয়া জীর্ণ বসনে নগ্নপদে তিনি একাকী তৃণগুল্ম-কঙ্করময় পথে অনির্দ্দিষ্ট যাত্রায় চলিয়াছেন। তাঁহার বয়স বেশী হয় নাই, কিন্তু উপবাসে, চিন্তায়, পরিশ্রমে তাঁহাকে বৃদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রান্ত পদযুগলকে অসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে চালনা করিয়া যষ্টির সাহায্যে তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতেছেন আর ভাবিতেছেন:

প্রভু আমাকে পাগল করেছেন। তাঁর সেই আয়ত চক্ষু দুটি কেবলই আমাকে ডাক্‌ছে; বল্‌ছে যেন, 'আর কতদিন আমায় ভুলে থাক্‌বে? আমি যে তোমারই পথ চেয়ে রয়েছি।'

প্রভু আমার পথ চেয়ে রয়েছেন? আমায় চিন্‌তে পারবেন ত? আমার মতো তাঁর কত আছে! কিন্তু আমার কেবলই তিনি—আমার কেবলই তিনি।

বারাণসীর পথে সনাতন শুনিলেন, প্রভু এই পথে গিয়াছেন। দেখিলেন, সমস্ত চিহ্নই বর্ত্তমান। পথের দু'ধারে কুসুমগুচ্ছ ম্লান হইয়া পড়িয়া আছে। বৃক্ষশাখায় শুষ্ক ফুলের মালা দুলিতেছে। গৃহে গৃহে পল্লবসারি, মঙ্গলঘটে মঞ্জরী। এই ত, এই ত, সেই প্রাণারাম, নয়নাভিরামের আগমনী। আর কি? আর কি? আমার জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি সার্থক করিয়া, প্রভু, এইবার দর্শন দাও।

প্রকাণ্ড শহর বারাণসী। কালভৈরবের গঞ্জ হইয়া সহরে ঢুকিতে হয়। সনাতন শুনিলেন, প্রভু তপনমিশ্রের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন—নিকটেই। কিন্তু পদ আর উঠে না। সনাতন সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সংসারাভিজ্ঞ, অভিজাত-কুলপ্রদীপ। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, 'আমি নীচ, অসৎসংসর্গদুষ্ট, বিষয়-বিষে জর্জর। আমার কর্ত্তব্য নয়, সেই সুকুমার, সর্ব্বত্যাগী, শুচি, উচচ ব্রাহ্মণকুলপাবন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করি। না, আমার অঙ্গের দূষিত বায়ু তাঁহার গায়ে লাগিতে দিব না। তার চেয়ে আমার প্রাণত্যাগ করা ভাল। যদি পরজন্ম থাকে প্রভুর পাদপদ্ম লাভ করিব।'

'ফকির'—

সনাতন চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্বপ্ন যেন হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। 'আমায় বলছেন!'

'হ্যাঁ, বাবা ফকির, তোমাকে প্রভু ডাকছেন। ভিতরে এস।'

সনাতন কাঁদিয়া উঠিলেন।

'বাবা, তুমি ভুল কর নি ত? আমায় প্রভু ডাকবেন কেন? আমি যে বড় পাপী, অপবিত্র, পতিত। প্রভুর নিকট যাবার যোগ্যতা নেই ত আমার! ঠিক বলছো, আমায় ডাকছেন? আর কাউকে নয়?'

'না, ফকির, তোমাকেই ডাকছেন, এস বন্ধু।'

সনাতন চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে উঠিয়া গেলেন।

'কই, কই আমার প্রভু? আমি ত চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।'

'এই যে আমি! সনাতন, তুমি আমারই বক্ষে আছ। নয়ন মেলে দেখ, বন্ধু। তোমারই জন্যে আমি এখানে এসে আজ কতদিন অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি। তুমি এসেছ? তুমি এসেছ, সনাতন?'

———

কৃত্তিবাস ও কাশী দাস

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৭৭ সালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বলেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র। 'বালক,' 'ভারতী,' 'সাহিত্য,' 'সাধনা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইনি বহু প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধ-রচনায় ইঁহার দক্ষতা ছিল অসামান্য। ইনি সনেট রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে, ১৩০৬ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।]

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যত গ্রন্থ দেখা যায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী কোন গ্রন্থেরই জুটে নাই। বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়ে রামায়ণের কাহিনী মুদ্রিত আছে, কৃত্তিবাসের দুই চারি ছত্র সকলেই আওড়াইতে পারে। ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত স্বর্ণসিংহাসনের পার্শ্বে দেখ, একখণ্ড কৃত্তিবাসের পুঁথি আছে; মধ্যবিত্তের বৈঠকখানার কোণে রামায়ণ একখান থাকা চাই; এমন কি সামান্য দোকানদারের চাল-ডালের হাঁড়ির মধ্য হইতেও রামায়ণ উঁকি মারে। বাঙ্গলা দেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা যে জানে না, তাহার জাতি ঠাহরাইয়া উঠিতে পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। রামায়ণ না জানিলে বাঙ্গালীত্বের অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়।

কিন্তু রামায়ণ লইয়া কৃত্তিবাসের গৌরব করিবার কি আছে? তিনি ত বাল্মীকির মত নূতন রচনা করেন নাই। রাঁধা ভাতে তিনি কেবল ঘৃত ঢালিয়াছেন, লবণ মিশাইয়াছেন বৈ ত নয়। বাল্মীকির সমান তাঁহাকে কেহ বলেও না—বাস্তবিক তিনি তাহা নহেনও। কিন্তু এই অপরাধে তাঁহার সকল যশ হরণ করা যায় না। তাঁহার গ্রন্থ বাল্মীকিগ্রন্থের অনুবাদ নহে—তাঁহাকে কতকটা নিজের মস্তিষ্ক খাটাইতে হইয়াছে। শুনা যায়, কথকতা হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ-সংগ্রহ। এইজন্য বঙ্গীয় কবি বাল্মীকি হইতে বিভিন্ন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে সকল সৌন্দর্য্য-বর্ণনা আছে, তাহা অবিকল বাল্মীকির অনুরূপ নহে। তাঁহার রামায়ণের ঘটনাবিশেষ ও বাল্মীকি-রামায়ণের ঘটনাবিশেষে অনেক তফাৎ। প্রথমতঃ উভয়ের আরম্ভ এক নহে। কত্তিবাসের

রত্নাকর-ব্যাপার প্রাচীন ঋষিকবির গ্রন্থে নাই। অন্যান্য পুরাণের সাহায্যে কৃত্তিবাস আরও অনেক ঘটনা অম্লানবদনে রামায়ণের মধ্যে গুঁজিয়াছেন। কথকের রসিকতাও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। এই সকল কারণে বাল্মীকির রামায়ণ অপেক্ষা কৃত্তিবাসে 'আষাঢ়ে'রও কতকটা প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডী বেড়িয়া রাখিয়া যান, মূল রামায়ণে বোধ করি একথা নাই। বাল্মীকি কপিপুঙ্গবকে ছদ্মবেশে রাবণের মৃত্যু-বাণ হরণ করিতে দেখেন নাই। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব আদিকবির অজ্ঞাত। এই সকলই কৃত্তিবাসের রচনা। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব পুরাণবিশেষে অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পুরাণ বাল্মীকিরচিত নহে।

কৃত্তিবাস যে সময়ের লোক, তাঁহার রচনায় সে সময়ের বিশেষ প্রভাব আছে। সময়ের প্রভাব হইতে তিনি একেবারে মুক্ত নহেন। বাল্মীকির গ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত ভারতের সম্পত্তি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুদ্ধ বাঙ্গলাদেশের। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালীত্ব যথেষ্ট। ইহা না থাকিলে তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ মুল্য থাকিত কিনা সন্দেহ। তাঁহার নাম তাহা হইলে হয়ত অনুবাদকের ফর্দ্দের একপ্রান্তে সাহিত্যানুসন্ধিৎসু কতিপয় ছাত্রের গুরুভার মস্তিক-পীড়নীস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিত। গ্রন্থের এরূপ বহুল প্রচার হইত বোধ হয় না।

কিন্তু বাঙ্গালীভাবে গ্রন্থের যে বিশেষ হানি হয় নাই তাহা নিশ্চিত বলা যায়। 'কৃত্তিবাস' বেশ স্বাভাবিক। তবে দশমুণ্ড রাবণ, ষাণ্মাসিক নিদ্রাগ্রস্ত কুম্ভকর্ণ, এ সকল অসম্ভব কল্পনার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। এগুলি তিনি বাল্মীকির নিকট হইতে শুনিয়াছেন। সেকালে জমকালো অসম্ভব বর্ণনার ফেশান ছিল—অদ্ভুত ব্যাপার নহিলে লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। যোজন হস্ত, দ্বিযোজন পদ তখনকার লোকের কল্পনায় অভ্যস্ত ছিল। সম্ভব অসম্ভবের প্রতি এখনকার মত লক্ষ্য থাকিলে অনেক কেতাবেরই যশঃসৌরভে চারিদিক আমোদিত হইতে পারিত না। মানব অপেক্ষা দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, ঘোটক-বদন, লম্বোদরবর্গের সেকালে প্রভুত্ব খাটিত। এখন কল্পনা সংযত হইয়া আসিয়াছে—অসংযত অসম্ভব কল্পনার দিনকাল গিয়াছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুকুন্দরামের প্রায় সমকালীন কবি। বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ণ পৌরাণিক প্রভাব মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস হইতেই একরূপ আরম্ভ বলা যায়।

কৃত্তিবাস কবির ভাষা পড়িয়া কিন্তু মুকুন্দরামের বাঙ্গলা অপেক্ষা অনেক সময় ভাল লাগে। * * * কৃত্তিবাসের খাঁটি ভাষা পাওয়া এখন বড় দুরূহ। সংশোধক পণ্ডিতদিগের জ্বালায় কৃত্তিবাসের শব্দচ্ছন্দ এখন অনেকটা অক্ষর-চ্ছন্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভালবাসার আতিশয্যে কৃত্তিবাসকে তাঁহারা মাজিয়া ঘষিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু নগ্ন সৌন্দর্য্য হারাইয়া কৃত্তিবাস কৃত্তিবাসত্ব হইতে যে কতটা বঞ্চিত হইলেন, তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখেন নাই। যাঁহারা কৃত্তিবাসের ভাষার নমুনা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে একথা বিশেষরূপে বুঝাইতে হইবে না। পরচুলায় মুখশ্রী বুঝিবার পক্ষে যে বিশেষ হানি করে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? * * *

কৃত্তিবাস-রামায়ণের চরিত্রগুলি মূল রামায়ণেরই অনুরূপ। না হইবেই বা কেন? কৃত্তিবাস ত আর বাল্মীকিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া আপনাকে খাড়া করিয়া তুলিতে চাহেন না। সহজভাবে সহজ ভাষায় দেশের সাধারণের নিকট বাল্মীকির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, কৃত্তি-বাসের আত্মপ্রকাশাভিলাষ তাহার তুলনায় নাই বলিলেও চলে। তবে ঘটনা-চক্রে অজ্ঞাতসারে দু'একটি চরিত্র অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলে বড় প্রভেদ হয় নাই। ঘটনাবিশেষের পরিবর্ত্তনে চরিত্রপরিবর্ত্তন বোধ হয় মাত্র। বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন তাহা নহে।

যাহা হউক, কৃত্তিবাসের কথা আর অধিক বলা অনাবশ্যক। তাঁহার রামায়ণ পড়িয়া যে সুগভীর তৃপ্তি তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যের মহাকাব্যের মুখ রক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই আমরা কৃত্তিবাসকে বড় বলিতেছি না, তাঁহার রামায়ণ আমাদের সাহিত্যের গৌরব-ত বটেই, তাহা ভিন্ন আমাদের ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবারও কারণ। সীতার নিষ্কাম পবিত্রতার কাহিনী দরিদ্র-স্বামি-পীড়নী অলঙ্কারগত-প্রাণা বঙ্গরমণীকে অনেক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছে। রামচন্দ্রের একপত্নী-নিষ্ঠা দারপরিগ্রহশীল পিতাকে অধীর পরিণয়াকাঙ্ক্ষা হইতে রক্ষা করিয়া অনেক সতী-সাধ্বীর মর্য্যাদা এবং মাতৃহীনের সান্ত্বনা রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহিষী-সমাচ্ছন্ন দশরথের শেষ দশা অনেক বঙ্গ-পরিবারের বিশেষ শিক্ষার স্থল। এ সকল শিক্ষা অবশ্য স্বপ্রদত্ত নহে, কিন্তু তাহাতে যায় আসে কি? বাল্মীকির উপদেশগুলি

বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছেন তিনিই ত বটে। সেজন্য কৃত্তিবাসের নিকট আমরা বিশেষ ঋণী। * * *

কৃত্তিবাসের পর বঙ্গীয় মহাকাব্যের মুখরক্ষা করিয়াছেন কাশীরাম দাস। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত সামসময়িক কবি ইঁহারা নহেন, সমাবিষয়িক কবিও নহেন। কিন্তু বিষয় এক না হইলেও ইঁহারা কাছাকাছি কতকটা বটে। একজনের রামায়ণ, আর একজনের মহাভারত। দুইখানি গ্রন্থই বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। সমাদৃত হইবার মতনও বটে। বিষয়ের মহত্ত্ব হিসাবেই দেখ, রচনার সৌন্দর্য্য হিসাবেই দেখ, আর প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মভাবের দিকেই দেখ, দুইখানি গ্রন্থেই নিন্দনীয় বিশেষ কিছু নাই। যথার্থই—

"কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃত সমান।
রাম নাম বিনা যার মুখে নাহি আন।।"

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।।"

রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত বৃহৎ ব্যাপার। বাল্মীকির রামায়ণের অনেক পরে ব্যাস মহাভারত রচনা করিতে বসেন। তখন সূর্য্যবংশের দিনকাল গিয়াছে, চন্দ্রবংশ ভারতের মধ্যে প্রভাবশালী। ব্যাস বাল্মীকির অনুকরণ করিয়াছেন কিনা, আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই। অনুকরণ হইলেও তাঁহার মৌলিকতা যথেষ্ট। কিন্তু মহাভারতের কাল যে রামায়ণের অনেক পরে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ বাল্মীকির রচনা ব্যাসের রচনাপেক্ষা সরল। তাহার পরে মহাভারতের সময়ে যেরূপ জটিল রাজনীতি, ও লেখাপড়ার চর্চ্চা, রামায়ণের সময়ে সেরূপ কিছুই নাই। বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যে লেখার কথা আছে এমন মনে পড়ে না ত। মহাভারতের প্রথমেই গণেশের লেখনীর কথা। রামায়ণে কৃষ্ণের মত নীতিবিদ্ই বা কোথায়? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মত ব্যূহ-রচনাদক্ষ সেনাপতিকুলই বা কোথায়? তখন সকল বিষয়েই অনেকটা সাদাসিধা ছিল। মহাভারতের আমলে উত্তরোত্তর সকল সমস্যাই জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বাঙ্গালাদেশেও প্রথমে রামায়ণ রচিত হয়, পরে মহাভারত। কিন্তু তাহা দেখিয়া কৃত্তিবাসের সমাজের অবস্থার সহিত কাশীরাম দাসের সমাজের

প্রভেদ ছিল কিনা বলা যায় না। কাশীরাম দাসও কৃত্তিবাসের মত মূল সংস্কৃত গন্থ হইতে অনুবাদ করেন নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস, কাশীরাম উভয়েরই চরিত্রগুলি মূল গ্রন্থের অনুরূপ। সেইজন্য কৃত্তিবাস, কাশীরাম পড়িয়াও বাল্মীকি-ব্যাসের সমাজের কথা বলিবার সুবিধা।

মহাভারতের প্রধান প্রধান স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা রামায়ণের প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি উচ্চদরের। কুন্তীই বল, আর দ্রৌপদীই বল, সীতার পার্শ্বে বসিবার মত কেহই নয়। কৌশল্যা কৈকেয়ীর পার্শ্বেও কুন্তী দাঁড়াইতে পারেন না। তবে দময়ন্তী, সাবিত্রী,—সীতার পার্শ্বে বসিতে পারেন বটে। কিন্তু এ দুইটি চরিত্র মহাভারতের মধ্যস্থ উপাখ্যান-মধ্যে স্থান পাইয়াছে। উঠাইয়া লইলেও মূলের বিশেষ কিছু যায় আসে না। সীতার মত শান্ত, সংযত অথচ স্বাভাবিক ভাব কিন্তু কোন চরিত্রেই নাই। সাবিত্রী-দময়ন্তীকে পতিব্রতা পতিপ্রাণা অস্বীকার করিবার যো নাই, তথাপি সীতার মত ইহাদের চরিত্র ফুটে নাই।

রামায়ণের সহিত মহাভারতের কতকগুলি চরিত্রে বেশ মিল বুঝা যায়। অর্জুনের সহিত লক্ষ্মণের চরিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দুইজনের প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম, দুইজনেরই বীরত্ব, দুইজনের জীবনেই প্রায় এক কারণে বনবাস। রাম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও সামান্য সাদৃশ্য অনুভূত হয়, তবে লক্ষ্মণ ও অর্জুনের মতন নয়। বিভীষণ আর বিদুর কতকটা এক রকম। ন্যায় লইয়াই ইহাদের কারবার। অন্যায় দেখিলে উভয়েই জ্বলিয়া উঠেন। দুর্য্যোধনে রাবণে তেমন সাদৃশ্য নাই। দুর্য্যোধন অপেক্ষা রাবণ লোক ভাল। রাবণ গুণী, মানী, বীর, দুর্য্যোধন অপেক্ষা শতগুণে উন্নত-প্রকৃতি। তবে দোষ কাহার নাই? রাবণেরও অনেক দোষ অবশ্য ছিল—প্রধানতঃ অহঙ্কার। রামায়ণে আর যাহাই থাকুক, রামায়ণে মহাভারতের একটি চরিত্রের অভাব আছে—সেটি ভীষ্মদেব। ভীষ্মকে মহাভারত বই আর কোথাও দেখা যায় না। ভীষ্ম মহাভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

ঘটনা-বিষয়েও রামায়ণে মহাভারতে সাদৃশ্য বিস্তর। সীতা-উদ্ধারের জন্যই রামের লঙ্কাজয়, রাবণবধ, কিন্তু সীতাকে পাইয়াও রাম তাঁহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না। পাণ্ডবেরাও রাজশ্রীর জন্যই কুরুকুল ধ্বংস করিলেন, কিন্তু রাজ্যলাভ করিয়া তাঁহাদের সকলই শূন্য মনে হইল—যাহার

জন্য জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিলেন, হাতে পাইয়া তাহা ভোগ করিতে মন উঠিল না।

ইহা ভিন্ন মধ্যে মধ্যে খুঁটিনাটি ঘটনার সাদৃশ্যও বড় অল্প নহে। হরধনুর্ভঙ্গে সীতালাভ, সুদর্শন-চক্রভেদ-ব্যাপারে দ্রৌপদী-লাভ। মৃগভ্রমে মুনিপুত্র বধ করিয়া দশরথ শাপাক্রান্ত; মৃগরূপী মুনির নিধনে পাণ্ডু শাপাক্রান্ত। উভয়েরই মৃত্যুকারণ মুনিশাপ। বিমাতার চাতুরী বুঝিয়াও রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে বনগমন করিলেন; যুধিষ্ঠিরাদিও কপট দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া সত্যপালনার্থে বনগমন করিলেন। কৈকেয়ী ভাবিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিতে হইলে রামচন্দ্রকে বুঝিবা ভববাস উঠাইতে হয়, ভরতের পক্ষে তাহা হইলে রাজ্যসুখ-ভোগের পথ নিষ্কণ্টক; কুরুকুলও ঠাহরাইয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে কাটাইতে হইলে পাণ্ডবেরা নাও টিঁকিতে পারেন, দুর্য্যোধন তাহা হইলে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। রাজ্যবঞ্চিত হইবার জন্যই উভয়ের বনবাস।

কপালগুণে উভয়পক্ষেরই নিকটে যম ঘেঁষিতে সাহস করে নাই। অরণ্যে রাবণ সীতাহরণ করেন; জয়দ্রথ দ্রৌপদীহরণ করেন। তবে জয়দ্রথকে ভীমার্জ্জুনের হস্তে পড়িয়া 'বাপ্ বাপ্' বলিতে হইয়াছিল, তাই আশানুরূপ ফল ফলে নাই। এইরূপে রামায়ণে ও মহাভারতে ঘটনা-সাদৃশ্য বড় অল্প নহে। কিন্তু তাহা লইয়া আর অধিক নাড়াচাড়ায় কাজ নাই—রামায়ণ, মহাভারতের কথায় কৃত্তিবাস, কাশী দাস চাপা পড়িয়া যান বুঝি।

কৃত্তিবাসের কথা যথেষ্ট বলা হইয়াছে, নূতন বলিবার আর বিশেষ কিছু নাই। কাশীরাম দাস সম্বন্ধেই বা আর বলিব কি? উভয় কবিরই রচনা পয়ার-ত্রিপদী-সমাচ্ছন্ন, ভাবপ্রবাহ তেমন নাই। আর ঘটনা ও চরিত্র তাহাও ত নিজের নূতন স্বষ্টি নহে। সেজন্য বাল্মীকি, ব্যাস পশ্চাতে আছেন। কাশী দাসের জীবনীসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আদিপর্ব্বের শেষভাগে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল তাঁহার বাসগ্রাম ও কুলসংবাদ জানা যায়।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর-দাসপুত্র সুধাকর নামে॥

অনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
কাশী দাস কহে কথা সাধুর চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥

কৃত্তিবাস যেমন ভাষা-রামায়ণ লিখিয়া সহজভাবে দেশের মধ্যে বাল্মীকির উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, কাশীরাম দাসও সেইরূপ বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া সহজে সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যাসের উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। কিরূপে জ্ঞাতিবিরোধ আরম্ভ হয় এবং তাহার ফল কিরূপ, মহাভারতের মত উজ্জ্বল বর্ণে বোধ করি তাহা কোনও পুস্তকে চিত্রিত হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায়, বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রতিদিন এই কুরুপাণ্ডব-দ্বন্দ্বাভিনয় চলিয়াছে। কুণ্ডলীকৃত জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে দুর্য্যোধন শকুনির প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইলেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। শকুনি-মন্ত্রী দুর্য্যোধন পিতৃহীন পাণ্ডবদিগকে যদি লাঞ্ছনা করিবার চেষ্টায় না ফিরিয়া মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মায়ায় অভিভূত হইয়া পুত্রের ক্রূরাচরণে যদি আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলি না দিতেন, তাহা হইলে ভারতের বীরকুল কি আর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত? কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? হিংসা-দৃপ্ত লোভ যখন জ্ঞাতিছদ্মবেশে দেখা দেয়, তখন সেখানে কি মঙ্গল থাকিতে পারে? ক্রূর-কর্ম্মা দুর্য্যোধনের উৎপীড়নে সহিষ্ণু যুধিষ্ঠিরও স্থির থাকিতে পারেন নাই। বনবাস দিয়াও দুর্য্যোধনের আশ মিটে নাই। পাণ্ডবদিগকে অপমানিত অভিশপ্ত দেখিবার জন্য সহস্র অনুষ্ঠান। কেবলই ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া পাণ্ডবেরা জয়শীল। শ্রীকৃষ্ণের মত বন্ধু না পাইলে তাঁহাদের যে কি দশা হইত কে বলিতে পারে? ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা চিরদিন আপনার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিয়াছেন, তাহার উপর যুদ্ধে ত পরাজয় হইলই। সিংহাসনে বসিয়াও তাঁহাদের মুহূর্ত্তের তরে শান্তি ছিল না, পাণ্ডবদিগকে হিংসা-জ্বালায় জ্বালাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে সাজ-সজ্জা করিয়া বাহির হইতে হইয়াছে। দুই একবার বিপদে পড়িয়া পাণ্ডবদিগের দ্বারাই তাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাহাতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বৈ হ্রাস পায় নাই।

কিন্তু অরণ্য-মধ্যেও পাণ্ডুপুত্রদিগের শান্তি ছিল। তাঁহারা ফলমূল যাহা পাইতেন পরিতৃপ্ত হৃদয়ে তাহা আহার করিতেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও যে তাঁহারা রাজ্যলোভ সংবরণ করিলেন, সে কেবল এই শান্তিটুকুর জন্য।

রামায়ণ-মহাভারত হইতে আমরা মানব-চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করি। বিশেষতঃ মহাভারতে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য দেখা যায়, এমন আর কোনও গ্রন্থে মিলে কিনা সন্দেহ। খুঁটিনাটি অঙ্গ বাদ দিয়া সাধারণ ভাবের দুই একটি বেশ শিক্ষা পাওয়া যায়। উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি :—রামায়ণ দেখাইয়াছে, রাজা দশরথ সসাগরা ধরিত্রীর সুশৃঙ্খল শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও অন্তঃপুরের সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, এইজন্য তাঁহার নিষ্কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক রটিয়াছে। তাঁহার রাজ্যেও বিশৃঙ্খলা ঘটিত, কেবল সুগভীর ভ্রাতৃপ্রেম তাহা ঘটিতে দেয় নাই। মহাভারত দেখাইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্র বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হইয়াও অতিরিক্ত মায়াবশতঃ পুত্রবর্গের কাল হইয়াছেন, পুত্রশাসনে অক্ষমতাই তাঁহার কুলনাশের প্রধান কারণ। ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে, বহিঃশাসনক্ষমতা সকল সময়ে অন্তঃশাসন-ক্ষমতার পরিচয় নহে। রাবণ ও দুর্য্যোধনের চরিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শাস্ত্রজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান, সংযম ও জ্ঞাতি-বন্ধন-বিদ্যা-বিহীনতার প্রমাণ নহে। একই হৃদয় একই বিষয়ে বিপরীত ব্যবহার করে। এইজন্য মানবচরিত্র বুঝা বড় দায়।

মহাভারতের অনেকগুলি উপাখ্যান অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে আমাদের আষাঢ়ে গল্পের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। সম্ভবতঃ কাশীরাম দাসই তাহার মূল কারণ। সেকালের কথক ঠাকুরেরাও তাহার কারণ হইতে পারেন। কিন্তু কারণ যাহাই হৌক, ইহাতে ফল অবশ্য ভাল বৈ মন্দ নহে। সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের হৃদয়গঠনে আষাঢ়ে গল্প যথেষ্ট সহায়তা করে। সেই আষাঢ়ে গল্পে যদি ধর্ম্মভাব মাখানো থাকে, তাহা হইলে শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবার কি কম সুবিধা ?

আদরিণী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

[১২৭৯ সালে (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্দ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃনিবাস হুগলী জেলার গুড়প গ্রামে। ইনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। দার্জিলিং, রঙ্গপুর ও গয়াতে কয়েক বৎসর প্র্যাক্‌টিস করিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় আসিয়া 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার অন্যতর সম্পাদকরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইঁহার প্রণীত গল্প-পুস্তকগুলির মধ্যে 'ষোড়শী,' 'দেশী ও বিলাতী,' 'নবকথা', 'পত্রপুষ্প' এবং উপন্যাসের মধ্যে 'রত্নদীপ,' 'রমাসুন্দরী,' 'সিন্দুরকৌটা' প্রভৃতি সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গল্প-রচনায় বঙ্গসাহিত্যে ইনি প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৩৩৮ সালের ২২এ চৈত্র ইনি পরলোক-গমন করেন।]

পাড়ার নগেন ডাক্তার ও জুনিয়ার উকীল কুঞ্জবিহারী বাবু বিকালে পান চিবাইতে চিবাইতে, হাতের ছড়ি দুলাইতে দুলাইতে জয়রাম মোক্তারের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"মুখুয্যে-মশায়, পীরগঞ্জের বাবুদের বাড়ী থেকে আমরা নিমন্ত্রণ পেয়েছি, এই সোমবার দিন মেজবাবুর মেয়ের বিয়ে। শুনছি নাকি ভারি ধুমধাম হবে। আপনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন কি?"

মোক্তার মহাশয় তাঁহার বৈঠকখানার বারান্দার বেঞ্চিতে বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আগন্তুকগণের এই প্রশ্ন শুনিয়া, হুঁকাটি নামাইয়া ধরিয়া, একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—কি রকম? আমি নিমন্ত্রণ পাব না কি রকম? জান, আমি আজ বিশ বচ্ছর ধ'রে তাদের এষ্টেটের বাঁধা মোক্তার?—আমাকে বাদ দিয়ে তারা তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে, এইটে কি সম্ভব মনে কর?"

জয়রাম মুখোপাধ্যায়কে ইঁহারা বেশ চিনিতেন—সকলেই চিনে। অতি অল্প কারণে তাঁহার তীব্র অভিমান উপস্থিত হয়—অথচ হৃদয়খানি স্নেহে বন্ধু-বাৎসল্যে কুসুমের মত কোমল; ইহা, যে তাঁহার সঙ্গে কিছু দিনও ব্যবহার

করিয়াছে, সে-ই জানিয়াছে। উকীল বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"না—না—সে কথা নয়—সে কথা নয়। আপনি রাগ কর্‌লেন মুখুয্যে-মশায়? আমরা কি সে ভাবে বলছি?—জেলার মধ্যে এমন কে বিষয়ী লোক আছে, যে আপনার কাছে উপকৃত নয়—আপনার খাতির না করে? আমাদের জিজ্ঞাসা করবার তাৎপর্য্য এই ছিল যে, আপনি সে দিন পীরগঞ্জ যাবেন কি?"

মুখোপাধ্যায় নরম হইলেন, বলিলেন,—"ভায়ারা ব'স।"—বলিয়া সম্মুখস্থ আর একখানি বেঞ্চ দেখাইয়া দিলেন।—উভয়ে উপবেশন করিলে বলিলেন,—"পীরগঞ্জে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমার পক্ষে একটু কঠিন বটে। সোম মঙ্গল দুটো দিন কাছারী কামাই হয়। অথচ না গেলে তারা ভারি মনে দুঃখিত হবে। তোমরা যাচ্ছ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে—কিন্তু অত দূর যাওয়া ত সোজা নয়। ঘোড়ার গাড়ীর পথ নেই। গোরুর গাড়ী ক'রে যেতে হ'লে যেতে দু'দিন, আসতে দু'দিন। পাল্কী ক'রে যাওয়া—সে-ও যোগাড় হওয়া মুস্কিল। আমরা দু'জনে তাই পরামর্শ করলাম, যাই, মুখুয্যে-মশায়কে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি যান, নিশ্চয়ই রাজবাড়ী থেকে একটা হাতীটাতী আনিয়ে নেবেন এখন, আমরা দু'জনেও তাঁর সঙ্গে সেই হাতীতে দিব্যি আরামে যেতে পারব।"

মোক্তার মহাশয় স্মিতমুখে বলিলেন,—"এই কথা? তার জন্যে আর ভাবনা কি ভাই?—মহারাজ নরেশচন্দ্র ত আমার আজকের মক্কেল নয়—ওঁর বাপের আমল থেকে আমি ওঁদের মোক্তার। আমি কাল সকালেই রাজ-বাড়ীতে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি—সন্ধ্যে নাগাদ হাতী এসে যাবে এখন।"

পরদিন রবিবার। এ দিন প্রভাতের আহ্নিক পূজাটা মুখুয্যে মহাশয় একটু ঘটা করিয়াই করিতেন। বেলা ৯টার সময় পূজা সমাপন করিয়া, জল-যোগান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। অনেকগুলি মক্কেল উপস্থিত ছিল, তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হঠাৎ সেই হাতীর কথা মনে পড়িয়া গেল। তখন কাগজ-কলম লইয়া, চশমাটি পরিয়া, "প্রবল-প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ শ্রীনরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী বাহাদুর আশ্রিত-জনপ্রতিপালকেষু" পাঠ লিখিয়া, দুই তিন দিনের জন্য একটি সুশীল ও সুবোধ

হস্তী প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। পূর্ব্বেও আবশ্যক হইলে তিনি কত বার এইরূপে মহারাজের হস্তী আনাইয়া লইয়াছেন। একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি লইয়া যাইতে আজ্ঞা দিয়া, মোক্তার মহাশয় আবার মক্কেলগণের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত জয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বয়স এখন পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে। ইঁহার হৃদয়খানি অত্যন্ত কোমল ও স্নেহপ্রবণ হইলেও, মেজাজটা কিছু রুক্ষ। যৌবনকালে ইনি রীতিমত বদরাগী ছিলেন—এখন রক্ত অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিয়াছে। মুখোপাধ্যায় যেমন অনেক টাকা উপার্জন করিতেন, তেমনি তাঁহার ব্যয়ও যথেষ্ট ছিল। তিনি অকাতরে অন্নদান করিতেন। অত্যাচারিত, উৎপীড়িত গরীবলোকের মোকদ্দমা তিনি কত সময় বিনা 'ফিস্'-এ, এমন কি, নিজে অর্থব্যয় পর্য্যন্ত করিয়া চালাইয়া দিয়াছেন।

প্রতি রবিবার অপরাহ্ণকালে পাড়ার যুবক-বৃদ্ধগণ মোক্তার মহাশয়ের বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া থাকেন। অদ্যও সেইরূপ অনেকে আগমন করিয়াছে—পূর্ব্বোক্ত ডাক্তারবাবু ও উকীলবাবুও আছেন। হাতীকে বাঁধিবার জন্য বাগানে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করা হইতেছে, হাতী রাত্রে খাইবে বলিয়া বড় বড় পাতাশুদ্ধ কয়েকটা কলাগাছ ও অন্যান্য বৃক্ষের ডাল কাটাইয়া রাখা হইতেছে—মোক্তার মহাশয় সেই সমস্ত তদারক করিতেছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেই পত্রবাহক ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"হাতী পাওয়া গেল না।" কুঞ্জবাবু নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"অ্যাঁ!—পাওয়া গেল না?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"তাই ত! সব মাটী?"

মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"কেন রে, হাতী পাওয়া গেল না কেন? চিঠির জবাব এনেছিস্?"

ভৃত্য বলিল,—"আজ্ঞে না। দেওয়ানজীকে গিয়ে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে ফিরে এসে বল্লেন, বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছে, তার জন্যে হাতী কেন? গোরুর গাড়ীতে যেতে বোলো।"

এই কথা শুনিবামাত্র জয়রাম ক্ষোভে, লজ্জায়, রোষে যেন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দুই চক্ষু দিয়া যেন রক্ত ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হইয়া উঠিল। কম্পিতস্বরে ঘাড় বাঁকাইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, —"হাতী দিলে না! হাতী দিলে না!"

সমবেত ভদ্রলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন,—"তার আর কি করবেন, মুখুয্যে-মশায়। পরের জিনিস, জোর ত নেই। একখানা ভাল দেখে গোরুর গাড়ী ভাড়া ক'রে নিয়ে, রাত্রি দশটা-এগারটার সময় বেরিয়ে পড়ুন, ঠিক সময় পৌছে যাবেন।"

জয়রাম বক্তার দিকে দৃষ্টিমাত্র না করিয়া বলিলেন,—"না। গোরুর গাড়ীতে চ'ড়ে আমি যাব না। যদি হাতী চ'ড়ে যেতে পারি, তবেই যাব, নইলে এ বিবাহে আমার যাওয়াই হবে না।"

শহর হইতে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে দুই তিন জন জমিদারের হস্তী ছিল। সেই রাত্রেই জয়রাম তত্তৎ স্থানে লোক পাঠাইয়া দিলেন, যদি কেহ হস্তী বিক্রয় করে, তবে কিনিবেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর একটি মাদী হাতী আছে,—এখনও বাচ্চা। বিক্রয় করবে, কিন্তু বিস্তর দাম চায়।"

"কত?"

"দু' হাজার টাকা।"

"খুব বাচ্ছা?"

"না, সওয়ারি দিতে পারবে।"

"কুচ পরওয়া নেই। তাই কিন্‌ব। এখনই তুমি যাও। কাল সকালেই যেন হাতী আসে। লাহিড়ী-মশায়কে আমার নমস্কার জানিয়ে বোলো, হাতীর সঙ্গে যেন কোন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দেন, হাতী দিয়ে টাকা নিয়ে যাবে।"

পরদিন বেলা সাতটার সময় হস্তিনী আসিল। তাহার নাম—আদরিণী। লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ম্মচারী রীতিমত ষ্ট্যাম্পকাগজে রসিদ লিখিয়া দিয়া দুই হাজার টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

বাড়ীতে হাতী আসিবামাত্র পাড়ার তাবৎ বালক-বালিকা আসিয়া বৈঠক-খানার উঠানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। দুই এক জন অশিষ্ট বালক সুর করিয়া বলিতে লাগিল,—"হাতী, তোর গোদা পায়ে নাতি।" বাড়ীর বালকেরা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং অপমান করিয়া তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

হস্তিনী গিয়া অন্তঃপুরদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মুখুয্যে মহাশয় বিপত্নীক —তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ একটি ঘটীতে জল লইয়া সভয়-পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন। কম্পিতহস্তে তাহার পদচতুষ্টয়ে সেই জল একটু একটু করিয়া ঢালিয়া দিলেন। মাহুতের ইঙ্গিতানুসারে আদরিণী তখন জানু পাতিয়া বসিল। বড়বধূ তৈল ও সিন্দূরে তাহার ললাট রঞ্জিত করিয়া দিলেন। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। আবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, একটা ধামায় করিয়া আলো-চাল, কলা ও অন্যান্য মাঙ্গল্যদ্রব্য তাহার সম্মুখে রক্ষিত হইল—শুঁড় দিয়া তুলিয়া তুলিয়া কতক সে খাইল, অধিকাংশ ছিটাইয়া দিল। এইরূপে বরণ সম্পন্ন হইলে রাজহস্তীর জন্য সংগৃহীত সেই কদলীকাণ্ড ও বৃক্ষশাখা আদরিণী ভোজন করিতে লাগিল।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া পীরগঞ্জ হইতে ফিরিবার পরদিন বিকালেই মহারাজ নরেশচন্দ্রের সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য, হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াই গেলেন।

মহারাজের দ্বিতল বৈঠকখানার নিম্নে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে প্রবেশের সিংহদ্বার। বৈঠকখানায় বসিয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বারের বাহিরের অনেক দূর অবধি মহারাজের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

রাজসমীপে উপস্থিত হইলে মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোকদ্দমা ও বিষয়সংক্রান্ত দুইচারি কথার পর মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মুখুজ্যে মশায়, এ হাতীটি কার?"

মুখুজ্যে মহাশয় বিনীতভাবে বলিলেন,—"আজ্ঞে, হুজুর বাহাদুরেরই হাতী।"

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"আমার হাতী! কৈ, ও হাতী ত কোনও দিন আমি দেখিনি। কোথা থেকে এল?"

"আজ্ঞে, বীরপুরের উমাচরণ লাহিড়ীর কাছ থেকে কিনেছি।"

অধিকতর বিস্মিত হইয়া রাজা বলিলেন,—"আপনি কিনেছেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তবে যে বল্লেন, আমার হাতী?"

বিনয়ব্যঞ্জক কিংবা শ্লেষসূচক—ঠিক বোঝা গেল না—একটু মৃদু হাস্য করিয়া জয়রাম বলিলেন,—"যখন হুজুর বাহাদুরের দ্বারাই প্রতিপালন হচ্ছি, আমিই যখন আপনার—তখন ও হাতী আপনার বৈ আর কার?"

সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, বৈঠকখানায় বসিয়া সমবেত বন্ধুমণ্ডলীর নিকট মুখোপাধ্যায় এই কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন। হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষোভ ও লজ্জা আজ তাঁহার মুছিয়া গেল। কয়েক দিন পরে আজ তাঁহার সুনিদ্রা হইল।

উল্লিখিত ঘটনার পর সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ বৎসরে মোক্তার মহাশয়ের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি এখন আর কাছারী যান না। ব্যবসায় ছাড়ায় কায়ক্লেশে মুখোপাধ্যায়ের সংসার চলিতে লাগিল। যে পরিমাণে ব্যয় সঙ্কোচ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা শত চেষ্টাতেও হইয়া উঠে না। সুদে সঙ্কুলান হয় না, মুলধনে হাত পাড়তে লাগিল। কোম্পানীর কাগজের সংখ্যা কমিতে লাগিল।

একদিন প্রভাতে মোক্তার মহাশয় বৈঠকখানায় বসিয়া নিজের অবস্থার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মাহুত আদরিণীকে লইয়া নদীতে স্নান করাইতে গেল। অনেক দিন হইতেই লোকে ইঁহাকে বলিতেছিল, "হাতীটি আর কেন, ওকে বিক্রী ক'রে ফেলুন। মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা বেঁচে যাবে।" কিন্তু মুখুজ্যে মহাশয় উত্তর দিয়া থাকেন,—"তার চেয়ে বল না, তোমার এই ছেলেপিলে নাতিপুতিদের খাওয়াতে অনেক টাকা ব্যয় হ'য়ে যাচ্ছে—ওদের একে একে বিক্রী ক'রে ফেল।"—এরূপ উক্তির পর আর কথা চলে না।

হাতীটিকে দেখিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনে হইল, ইহাকে যদি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ত কিঞ্চিৎ অর্থাগম হইতে পারে। তখনই কাগজ কলম লইয়া নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি মুসাবিদা করিলেন :—

হস্তীভাড়ার বিজ্ঞাপন

বিবাহের শোভাযাত্রা, দূরদূরান্তে গমনাগমন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর আদরিণী নাম্নী হস্তিনী ভাড়া দেওয়া হইবে। ভাড়া প্রতি রোজ ৩ টাকা মাত্র, হস্তিনীর খোরাকী ১ টাকা এবং মাহুতের খোরাকী ।।০, একুনে ৪।।০ ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহার আবশ্যক হইবে, নিম্ন ঠিকানায় তত্ত্ব লইবেন।

শ্রীজয়রাম মুখোপাধ্যায় (মোক্তার)
চৌধুরীপাড়া।

এই বিজ্ঞাপনটি ছাপাইয়া, সহরের প্রত্যেক ল্যাম্পপোষ্টে, পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষকাণ্ডে এবং অন্যান্য প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দেওয়া হইল। বিজ্ঞাপনের ফলে, মাঝে মাঝে লোকে হস্তী ভাড়া লইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহাতে ১৫।২০ টাকার বেশী আয় হইল না।

মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পৌত্রটি পীড়িত হইয়া পড়িল। তাহার জন্য ডাক্তার-খরচ, ঔষধ-পথ্যাদির খরচ প্রতিদিন ৫।৭ টাকার কমে নির্ব্বাহ হয় না। মাসখানেক পরে বালকটি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিল। এদিকে জ্যেষ্ঠা পৌত্রী কল্যাণী দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে যেরূপ ডাগর হইয়া উঠিতেছে, শীঘ্রই তাহার বিবাহ না দিলে নয়। যত দায় এই ষাট বৎসরের বুড়ারই ঘাড়ে। অবশেষে এক স্থানে বিবাহ স্থির হইল। আড়াই হাজার টাকা হইলেই বিবাহটি হয়। কোম্পানীর কাগজের বাণ্ডিল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে—তাহা হইতে আড়াই হাজার বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। আর, শুধু ত একটি নহে—আরও নাতিনীরা রহিয়াছে। তাহাদের বেলায় কি উপায় হইবে? এই সকল ভাবনা-চিন্তার মধ্যে পড়িয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শরীর ক্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। এক দিন সংবাদ আসিল, কনিষ্ঠ পুত্রটি বি.এ. পরীক্ষা দিয়াছিল, সে-ও ফেল হইয়াছে।

চৈত্র-সংক্রান্তিতে বামুন-হাটে একটি বড় মেলা হয়। সেখানে বিস্তর গোরু, বাছুর, ঘোড়া, হাতী, উট বিক্রয়ার্থ আসে। বন্ধুগণ বলিলেন,—"হাতীটিকে মেলায় পাঠিয়ে দিন, বিক্রী হ'য়ে যাবে এখন। দু'হাজারে কিনে-ছিলেন, এখন হাতী বড় হয়েছে—তিন হাজার টাকা অনায়াসে পেতে পারবেন।"

কোঁচার খুঁটে চক্ষু মুছিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"কি ক'রে তোমরা এমন কথা বল্‌ছ?"

বন্ধুরা বুঝাইলেন,—আপনি বলেন, ও আমার মেয়ের মত। তা মেয়েকেই কি চিরদিন ঘরে রাখা যায়? মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে যায়, তার আর উপায় কি? তবে পোষা জানোয়ার, অনেক দিন ঘরে রয়েছে, মায়া হ'য়ে গেছে, একটু দেখে শুনে কোনও ভাল লোকের হাতে বিক্রী করলেই হয়। যে বেশ আদরযত্নে রাখবে, কোনও কষ্ট দেবে না—এমন লোককে বিক্রী করবেন।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া জয়রাম বলিলেন,—"তোমরা সবাই যখন বলছ, তখন তাই হোক। দাও, মেলায় পাঠিয়ে দাও। একজন ভাল খদ্দের ঠিক কর,—তাতে দামে যদি দু-পাঁচশো টাকা কমও হয়, সেও স্বীকার।"

মেলাটি চৈত্র-সংক্রান্তির প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। তবে শেষের চারি পাঁচ দিনই জমজমাট বেশী। সংক্রান্তির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যাত্রা স্থির হইয়াছে। মাহুত ত যাইবেই—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যম পুত্রটিও সঙ্গে যাইবে।

যাত্রার দিন অতি প্রত্যুষে মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে হস্তিনী ভোজন করিতেছে। বাড়ীর মেয়েরা বালকবালিকাগণ সজল নেত্রে বাগানে হাতীর কাছে দাঁড়াইয়া। খড়ম পায়ে দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বদিন দুই টাকার রসগোল্লা আনাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, ভৃত্য সেই হাঁড়ী হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ডালপালা প্রভৃতি মামুলি খাদ্য শেষ হইলে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বহস্তে মুঠা মুঠা করিয়া সেই রসগোল্লা হস্তিনীকে খাওয়াইলেন। শেষে তাহার গলার নিম্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন,—"আদর, যাও মা, বামুন-হাটের মেলা দেখে

এস।" প্রাণ ধরিয়া বিদায়বাণী উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। উদ্বেল-দুঃখে এই ছলনাটুকুর আশ্রয় লইলেন।

হাতী চলিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শূন্যমনে বৈঠকখানার ফরাস-বিছানার উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অনেক বেলা হইলে, অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া বধূরা তাঁহাকে স্নান করাইলেন—স্নানান্তে আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু পাতের অন্নব্যঞ্জন অধিকাংশই অভুক্ত পড়িয়া রহিল।

কল্যাণীর বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। ১০ই জ্যৈষ্ঠ শুভ কার্য্যের দিন স্থির হইয়াছে। বৈশাখ পড়িলেই উভয়পক্ষের আশীর্ব্বাদ হইবে। হস্তি-বিক্রয়ের টাকাটা আসিলেই গহনা গড়াইতে দেওয়া হয়। কিন্তু ১লা বৈশাখ সন্ধ্যাবেলা মস্‌মস্‌ করিয়া আদরিণী ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিক্রয় হয় নাই—উপযুক্ত মূল্য দিবার খরিদ্দার জোটে নাই।

আদরিণীকে ফিরিতে দেখিয়া বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল। বিক্রয় হয় নাই বলিয়া কাহারও কোনও খেদের চিহ্ন সে সময় দেখা গেল না। যেন হারাধন ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—সকলের আচরণে এইরূপই মনে হইতে লাগিল। আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস অপনীত হইলে, পরদিন সকলের মনে হইল—কল্যাণীর বিবাহের এখন কি উপায় হইবে?

প্রতিবেশী বন্ধুগণ আবার বৈঠকখানায় সমবেত হইলেন। অত বড় মেলায় এমন ভাল হাতীর খরিদ্দার কেন জুটিল না, তাহা লইয়া আলোচনা হইতে লাগিল। বামুন-হাটের মেলা ভাঙ্গিয়া সেখান হইতে আরও দশ ক্রোশ উত্তরে রসুলগঞ্জে সপ্তাহব্যাপী আর এক মেলা হয়। যে সকল গো-মহিষাদি বামুন-হাটে বিক্রীত হয় নাই—সে সব রসুলগঞ্জে গিয়া জমে। সেই খানেই আদরিণীকে পাঠাইবার পরামর্শ হইল।

আজ আবার আদরিণী মেলায় যাইবে। আজ আর বৃদ্ধ তাহার কাছে গিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। রীতিমত আহারাদির পর আদরিণী বাহির হইয়া গেল। কল্যাণী আসিয়া বলিল,—"দাদামশায়, আদর যাবার সময় কাঁদছিল।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন,—"কি বল্লি? কাঁদছিল?"

"হ্যাঁ, দাদামশায়। যাবার সময় চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়তে লাগ্‌ল।"

বৃদ্ধ আবার ভূমিতে পাড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিতে লাগিলেন,— "জানতে পেরেছে। এ বাড়ীতে যে আর ফিরে আসবে না, তা জানতে পেরেছে।"

নাতিনী চলিয়া গেলে বৃদ্ধ সাশ্রু নয়নে আপন মনে বলিতে লাগিলেন,— "যাবার সময় আমি তোর সঙ্গে দেখাও করলাম না—সে কি তোকে অনাদর ক'রে? না, না, তা নয়। তুই কি আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পারিসনি?— খুকীর বিয়েটা হ'য়ে যাক। তারপর তুই যার ঘরে যাবি, তাদের বাড়ী গিয়ে আমি তোকে দেখে আসব। তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে যাব, রসগোল্লা নিয়ে যাব, যতদিন বেঁচে থাকব, তোকে কি ভুলতে পারব? মাঝে মাঝে গিয়ে তোকে দেখে আসব। তুই মনে কোনও অভিমান করিসনে মা।"

পরদিন বিকালে একটি চাষী লোক একখানি পত্র আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে দিল। পত্র পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মধ্যম পুত্র লিখিয়াছে, "বাটী হইতে সাত ক্রোশ দূরে আসিয়া কল্য বিকালে আদরিণী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। সে আর পথ চলিতে পারে না। রাস্তার পার্শ্বে একটা আমবাগানে শুইয়া পড়িয়াছে। তাহার পেটে বোধ হয় কোনও বেদনা হইয়াছে—শুঁড়টি উঠাইয়া মাঝে মাঝে কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। মাহুত যথাবিদ্যা সমস্ত রাত্রি তাহার চিকিৎসা করিয়াছে —কিন্তু কোনও ফল হয় নাই—বোধ হয় আদরিণী আর বাঁচিবে না। যদি মরিয়া যায়, তবে তাহার শব-দেহ প্রোথিত করিবার জন্য নিকটেই একটি জমি বন্দোবস্ত লইতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তা মহাশয়ের অবিলম্বে আসা আবশ্যক।"

বাড়ীর মধ্যে গিয়া উঠানে পাগলের মত পায়চারি করিতে করিতে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন,—"আমার গাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে দাও। আমি এখনি বেরুব। আদরের অসুখ—যাতনায় সে ছট্‌ফট্ করছে। আমাকে না দেখতে পেলে সে সুস্থ হ'বে না। আমি আর দেরী করতে পারব না।"— তখনই ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিতে লোক ছুটিল। বধূরা অনেক কষ্টে বৃদ্ধকে একটু দুগ্ধ মাত্র পান করাইতে সমর্থ হইলেন। রাত্রি দশটার সময়

গাড়ী ছাড়িল। জ্যেষ্ঠ পুত্রও সঙ্গে গেলেন। পত্র-বাহক সেই চাষী লোকটি কোচবাক্সে বসিল।

পরদিন প্রভাতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া বৃদ্ধ দেখিলেন, সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আদরিণীর সেই নবজলধরবর্ণ বিশাল দেহখানি আম্রবণের ভিতরে পতিত রহিয়াছে—তাহা আজ নিশ্চল—নিস্পন্দ! বৃদ্ধ ছুটিয়া গিয়া হস্তিনীর শব-দেহের নিকট লুটাইয়া পড়িয়া তাহার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন,—"অভিমান ক'রে চ'লে গেলি মা? তোকে বিক্রী করতে পাঠিয়েছিলাম ব'লে—তুই অভিমান ক'রে চ'লে গেলি?"

ইহার পর দুইটি মাস মাত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন।

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[কথাসাহিত্য-রথী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান যুগের উপন্যাস-লেখকদিগের অগ্রণী। ইনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি 'কাশীনাথ' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি লেখেন। তাহার পর যৌবনে ইনি 'বড়দিদি,' 'চন্দ্রনাথ,' 'দেবদাস', 'পথনির্দ্দেশ,' 'বিন্দুর ছেলে' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রৌঢ়ত্বের প্রারম্ভে ইনি চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন এবং ক্রমে 'চরিত্রহীন,' 'পরিণীতা,' 'বিরাজ বৌ,' 'পণ্ডিত মশাই,' 'মেজদিদি,' 'দর্পচূর্ণ,' 'আঁধারে আলো,' 'পল্লীসমাজ,' 'শ্রীকান্ত,' 'অরক্ষণীয়া,' 'নিষ্কৃতি,' 'গৃহদাহ,' 'দেনা পাওনা,' 'বামুনের মেয়ে,' 'নববিধান,' 'দত্তা,' 'শেষ প্রশ্ন,' 'পথের দাবী,' 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। ইঁহার যৌবনকাল ব্রহ্মদেশেই অতিবাহিত হয়। ব্রহ্মদেশে ইনি সরকারী আফিসে কেরানীর কাজ করিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে সম্মানাত্মক ডি.লিট. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ইনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পরলোক-গমন করেন।]

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল

ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কহিল—"কিরে শ্রীকান্ত, ভয় করে?"

আমি বলিলাম, "নাঃ—"

ইন্দ্র খুশী হইয়া কহিল, "এই ত চাই—সাঁতার জান্‌লে আবার ভয় কিসের। প্রত্যুত্তরে আমি শুধু একটি ছোট নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের মধ্যে সাঁতার জানা এবং না জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সে-ও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এইভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এমনি শ্রান্ত অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না, বাড়েও না—থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক একবার ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শুনা যায়?" সে নৌকার মুখটা সোজা করিয়া দিয়া কহিল, "জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড়ভাঙার শব্দ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?"

"সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাইত কা'ল জল হ'য়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙে পড়লে ডিঙিশুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টান্‌তে পারিস্‌?"

"পারি।"

"তবে টান।"

আমি টানিতে সুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, "উই—উই যে কালো মত বাঁ দিকে যা দেখা যায়, ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে—কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আস্‌তে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুতে রাখবে।"

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, "তবে, ওর ভিতরে দিয়ে না-ই গেলে।" ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, "আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁ-দিকে রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি ক'রে? ফিরে আস্‌তে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।"

"তবে মাছ্‌ চুরি ক'রে কাজ নেই, ভাই", বলিয়া আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছ্‌লাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল, "তবে এলি কেন? চল্‌—তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ!"

তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনেরয় পড়িয়াছি—আমাকে বলে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুশী হইয়া বলিল, "এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারি পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে এমনি বা'র ক'রে নিয়ে যাব যে ওরা টেরও পাবে না।" একটু হাসিয়া কহিল, "আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! দ্যাখ্‌ শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে—কিন্তু যদি দেখিস্‌ ঘিরে ফেললে ব'লে—আর পালাবার যো নেই, তখন ঝুপ্‌ ক'রে লাফিয়ে প'ড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস্‌ গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার যোটি নেই—তারপর মজা ক'রে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোর বেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধারে ধারে বাড়ী ফিরে গেলেই বাস্‌। কি করবে ব্যাটারা?"

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, "সতুয়ার চড়া ত ঘোর নালার সম্মুখে, সে ত অনেক দূর। ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, "কোথায় অনেক দূর? ৬।৭ ক্রোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরিয়ে গেলে চিৎ হ'য়ে থাক্‌লেই হ'ল—তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।"

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছুই রহিল না। এই দিক্‌-চিহ্নহীন নিশীথে আবর্ত্তসঙ্কুল গভীর তীব্র জল-প্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার

মধ্যে একদিকে তীরে উঠিবার যো নাই। দশ পনের হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙ্গন ধরিয়া জলস্রোত অর্দ্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বস্তুটা উপলব্ধি করিয়াই আমার বীর-হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, "কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?"

ইন্দ্র কহিল, "সেদিন ত আমি ঠিক এমনি ক'রেই পালিয়েছিলাম। তার পর দিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম—বল্‌লাম নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।"

তবে, এ সকল-ত এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতে-নাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে। মিট্ মিট্ আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্ত্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

সে স্থানটায় জলের বেগ অনেকগুলা মোহানার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছ একটা হইতে অপরটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলি অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিক অগ্রসর হইয়া গন্তব্যস্থানে পেঁছানো গেল।

ধীবর-প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এস্থানটায় পাহারা রাখে নাই। খালে যখন জল থাকে না, তখন এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দ্দিকে জাল টাঙাইয়া রাখে। ইহাকে মায়াজাল বলে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই কাতলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া এদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনের, বিশ সের রুই-কাত্‌লা গোটা পাঁচ ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছ-তাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল; এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

"এত মাছ কি হবে ভাই?"

"কাজ আছে। আর না, পালাই চল।" বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেম্‌নি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ এক স্থানে একটা দমক্ মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টাক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতি-পরিবর্ত্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি? কি হ'ল?" ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, "চুপ! ব্যাটারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আস্‌ছে—ঐ দ্যাখ্।" তাইত বটে! প্রবল জল-তাড়নার ছপাছপ্ শব্দ করিয়া তিনখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা—পালাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টাক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

"কি হবে ভাই?" বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্ব্বে পাঁচ ছয়দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এত দিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, "ভয় নেই।" কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না। প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলমগ্ন। তাহারই উপর ৮।১০ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে আমরা দুইটি চোর। জল কোথাও এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর এক হাতও অগ্রসর হয় না। পিছন

হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকা একটু কাঁত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, "ইন্দ্র।" হাত পাঁচ ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, "আমি নীচে।"

"নীচে কেন?"

"ডিঙি টেনে বার করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।"

"টেনে কোথায় বার কর্‌বে?"

"ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।"

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে কেনেস্ত্রা পিটানো ও চেরাবাঁশের কটাকট্ শব্দে চম্‌কাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ওকি ভাই?" সে উত্তর দিল, "চাষীরা মাচার উপর ব'সে বুনো শূয়ার তাড়াচ্ছে।"

"বুনো শূয়ার! কোথায় সে?" ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্য-ভরে কহিল, "আমি কি দেখতে পাচ্ছি, যে বল্‌ব! আছেই কোথাও এইখানে।" জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম কা'র মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি এক বুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা নড়িবার উপায় পর্য্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনের এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক একটা জনার বা ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ছপাৎ করিয়া শব্দ হইতেছে। এক একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। শঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শূয়ার না হইলেও বাচচা-টাচচা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, "ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।"

কিছু না—সাপ। শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম; অস্ফুটে কহিলাম, "কি সাপ ভাই?"

ইন্দ্র কহিল, "সব রকম আছে! ঢোঁড়া, বোড়া, গোখ্‌রা, করেত—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙ্গা নেই দেখ্‌ছিস্ নে?"

সে ত দেখ্‌ছি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মর্‌চে—দুটো তিনটে ত আমার গা-ঘেঁসে পালাল। এক-একটা মস্ত বড়—সেগুলো বোড়া-ঢোঁড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়াইলেই বা কি কর্‌বো। মর্‌তে একদিন ত হবেই ভাই।"—এম্‌নি আর কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কাণে কতক পৌঁছিল কতক পৌঁছিল না। আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিঃশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাৎ করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে।

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কা'র সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি! যদি মানুষই হয় তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়ে তৈরী? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্ব্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ সমস্ত বিপদের বার্ত্তা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল; একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—"শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা।" সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানিতে পারিত। এ ত শুধু খেলা নয়। জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে? ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্য ভাবে বলিয়াছিল, "মরিতে একদিন ত হবেই", এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু, সে যাই হোক, তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ

আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া ? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত-বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না দুটো চোখে পড়িয়াছে—কিন্তু, এত বড় মহাপ্রাণ আর কখনও দেখিতে পাই নাই!

কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এই অদ্ভুত পার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলেন! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান্! টাকা-কড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যা-বুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি; কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্য্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে? যাক সে কথা!

ক্রমশঃ ঘোর জলকল্লোল নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিলাম; অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ—যাহাকে অতিক্রম করিয়া ষ্টীমার যাইতে পারে না—তাহা প্রবাহিত হইতেছে।

বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং ধূসর ফেন-পুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বৈঠা হাতে করিয়া সম্মুখবর্ত্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, "আর ভয় নেই; বড় গাঙে এসে পড়েছি।" মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল। কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্য্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বনঝাউ এবং ভুট্টা জনারের চড়া ডানদিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজাই চলিতে লাগিল।

বৃন্দাবনের পাঠশালা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন হইতে বৃন্দাবনের পাঠশালায় পূর্ব্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পণ্ডিত-মহাশয়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে সুরু করিয়াছিল এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল, শুধু আরতিশেষে প্রসাদভক্ষণে। এটা বোধ করি অকৃত্রিম ভক্তিবশতই; ছাত্রেরা এসময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতায়ের অমর্য্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ একদিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পনের মিনিট করিল, এবং সারাদিন অদশনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরাঙ্গ-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে, সে দিকেও খরদৃষ্টি রাখিল।

দিন দশেক পরে একদিন বৈকালবেলায় যখন বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া, তারস্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে-ছিল, তখন একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তাহারই সমবয়সী। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি ভায়া চিন্‌তে পার্‌লে?"

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, "কৈ, না।" তিনি বলিলেন, "আমার যে কাজ আছে তা' পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্ব্বে একবার দেখতে এলাম—আমি কেশব।"

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্য-সুহৃদ্‌কে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব্ব ইংরাজি-শিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর ভাগিনেয় ইনি। ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এখানে পাঁচ ছয় মাস ছিলেন, সেই সময়ে উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। বৃন্দাবন তাহার শিক্ষকের মুখে প্রায়ই এই বাল্য-বন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব ৫।৬ বৎসর হইল, এম.এ. পাশ করিয়া কলেজে শিক্ষকতা করিতে-ছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, "আমার মামা মিথ্যে কথা ত' দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবার তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন, কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েছে কিনা তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।"

কথাগুলা বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এত বড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ এই স্তুতি, তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, "যাক, যাতে লজ্জা পাও, আর তা ব'লব না, শুধু মামার মতটা জানিয়ে দিলাম। এখন কাজের কথা বলি। পাঠশালা খুলেচ, শুনি মাইনে নাও না, পোড়োদের বইটই কাপড়চোপড় পর্য্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজী ছিলাম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে জোগাড় ক'রলে কি ক'রে বলত' ভায়া?"

বৃন্দাবন সে কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, "খুলে বল্‌চি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েছি যদি দেশের কোন কাজ থাকে ত ইতর সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ, আমারও এই মত যে, লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাব্‌বে। ইঞ্জিনে ষ্টিম হ'লে তবে গাড়ী চলে, নইলে, এত বড় জড়পদার্থটাকে জনকতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি ক'রে একচুলও নড়াতে পারবে না। যাক, তুমি এ সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে পাঠশালা খুল্‌তে না। আমি এই জন্যে বিয়ে পর্য্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখাবার বালাই নেই; তাই, প্রথমে একটা পাঠশালা খুলি—শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে ক'রে—তা আমার পাঠশালাই চল্‌ল না—ছেলেই জুট্‌ল না। আমাদের গাঁয়ের ছোট লোকগুলো এমনি সয়তান যে, কোন মতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মান-সম্ভ্রম নষ্ট ক'রে দিন কতক ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী পর্য্যন্ত ঘুরেছিলাম, —না, তবুও না।"

বৃন্দাবনের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, "ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায়নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে মান ইজ্জৎ নষ্ট করা উচিত হয় নি।"

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারী অপ্রস্তুত হইয়া বলিয়া উঠিল—"না হে, না—তোমাকে—তোমাদের সেকি কথা! ছি ছি! তা' আমি বলিনি, সে কথা নয়—কি জানো—"

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতী, কামার, গয়লা, চাষা—তাঁত বুনি, লাঙ্গল ঠেলি, গোরু চরাই—জামাজোড়া প'রতে পাইনে, সরকারী আফিসের দোরগোড়ায় যেতে পারিনে; কাজেই তোমরা আমাদের ছোটলোক ব'লে ডাকো—ভাল কাজেও আমাদের বাড়ীতে ঢুকলে তোমার মত সদাশয় উচ্চশিক্ষিত লোকেরও সম্ভ্রম নষ্ট হ'য়ে যায়।"

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, "বৃন্দাবন, সত্যি বল্‌চি ভাই, তোমাকে আমি চাষা-ভুষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ মনে ক'রেই অমন কথা ব'লে ফেলেচি। যদি জানতাম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ কর্‌বে, কখন' এ কথা মুখ দিয়ে বা'র ক'রতাম না।"

বৃন্দাবন কহিল, "তা-ত জানি। কিন্তু আলাদা ক'রে দিলেই ত আলাদা হ'তে পারি নে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গেই মিশে রয়েছে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এই জন্যই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার পাঠশালায় জুটেছে। আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেছে,—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত, দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ কর্‌তে পারিনে, তোমরা ছোটোলোক ব'লে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না,—তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।"

কেশব লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনতমুখে শুনিতে লাগিল। বৃন্দাবন কহিল, "জানি এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী ব'লে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখ্‌তে পাওনা ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বৈদ্য, হাতুড়ে পণ্ডিত প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে—যেমন আমি করেছি—কিন্তু তোমাদের মত বড় বড় ডাক্তার-প্রফেসারও আমল পায় না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন। তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে ব'সে নীচে শিক্ষা দেওয়া তাঁর গায় বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।"

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভাল হয় না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশ বুঝি, তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্ছ, আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্ত্তব্য আমাদের কথা শোনা।"

বৃন্দাবন কহিল, "দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান তা' দেবতাই জানেন। সে কথা যাক। কিন্তু তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা

কর না, মনিবের মত কর। তাই, তোমাদের পনের আনা লোকেই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, যাতে চাষা-ভূষোর ছেলেরা অধঃপাতে যায়। তোমাদের সংস্রবে লেখাপড়া শিখ্‌লে চাষার ছেলে যে বাবু হ'য়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপদাদাকেও মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ দেশের এই ছোটলোকের আত্মীয় হ'তে শেখো, তারপর তাদের মঙ্গল কামনা ক'রো, তাদের ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শিখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচারব্যবহারে দেখাও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভূষোকে নেহাৎ ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই আমাদের ভয় ভাঙ্‌বে যে, আমাদের লেখাপড়াশেখা ছেলেরা আমাদের অশ্রদ্ধা কর্‌বে না এবং দল ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসাবাণিজ্য, কাজ-কর্ম্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক্ হ'বার জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠবে না। এ যতক্ষণ না কর্‌ছ, ভাই, ততক্ষণ জন্মজন্ম হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালায় ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় কর্‌বে, মান্য কর্‌বে, কিন্তু বিশ্বাস কর্‌বে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচ্‌বে না যে, তোমাদের ভাল এবং তাদের ভাল এক নয়।"

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "বৃন্দাবন, বোধ করি তোমার কথাই সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তা-হ'লে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাজে লাগ্‌বে না। বিশ্বাস না কর্‌লে আমরা কি ক'রে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর, তার উপায় কি?"

বৃন্দাবন বলিল, "ঐ যে বল্লুম, আচার-ব্যবহার ও আমাদের ষোল আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার ব'লে বর্জ্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা-হ'লে কোন দিনই আমরা বুঝ্‌তে পারব না তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থ ই আমাদের কল্যাণ হ'বে। আচ্ছা, কেশব, পৈতে হ'বার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর?"

"না।"

"জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?"

"খাই।"

"মুসলমানের হাতের রান্না?"

"প্রেজুডিস্ নেই। খেতে পারি।"

"তা-হ'লে আমিও বল্‌তে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা, কিংবা আরও কিছু বেশী—সেটা বল্‌লে তুমি রাগ কর্‌বে।"

"ধৃষ্টতা?"

"ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের ভালো কর্‌বে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারা চাই। বুদ্ধি-বিবেচনায় ধর্ম্মে কর্ম্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালের কাজ করি।"

"কর, কাল সকালেই আবার আস্‌ব" বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ী হইলেও কেশব শহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই, পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্যবন্ধুকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল—"তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেছি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেছি, বুঝ্‌লে ত?"

কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেছি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, "বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থই একটা মানুষ, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, "আমারও নেই। তারপরে?" কেশব কহিল, "তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙে গেছে, শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞাসা কচ্চি,—এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট ক'রে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু, আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েছে,

যেখানে 'ক' 'খ' শেখাবার পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, একাজ কি গভর্ণমেণ্টের করা উচিত নয়?"

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, "তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মতো হ'লো। দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি সে তক্ষণি দুই হাত তুলে বল্‌বে—পণ্ডিত মশাই, মাধুও করেচে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পার্‌লে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে করি ভাই, তারপরে, দেখা যাবে গভর্ণমেণ্ট তাঁর কর্ত্তব্য করেন কিনা। নিজের কর্ত্তব্য করার আগে, পরের কর্ত্তব্য আলোচনা কর্‌লে পাপ হয়।"

"কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?"

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কথাটা ঠিক হ'লো না ভাই। আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়ত', এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হ'য়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরী হয় না কেশব, বরং আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই অতি ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্ব্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালার একটি সর্ত্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাক্‌তে ত দেখতে পেতে, প্রত্যহ বাড়ী যাবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হ'য়ে তারা অন্ততঃ দুটি একটি ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবে। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হ'য়ে তাদের ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা-হ'লে আমি হিসেব ক'রে দেখেছি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাংলাদেশে একটি লোকও মূর্খ থাক্‌বে না।"

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "উঃ কি ভয়ানক আশা।" বৃন্দাবন বলিল, "সে বল্‌তে পার বটে। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমারও মনে হয় দুরাশা, কিন্তু, সবল মুহূর্ত্তে মনে হয়, ভগবান্‌ মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হ'তে কতক্ষণ।"

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

ছোট ছেলের জন্মতিথি-পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর-বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল ঊর্দ্ধগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে—যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে; এবং অন্তঃপুরের লজ্জা-সম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ওরে, ও গফ্‌রা, বলি, ঘরে আছিস্?

তাহার বছর-দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর!

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাব্‌লা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁঝে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়া তপ্ত

খরবাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফের্‌বার পথে দেখ্‌চি তেম্‌নি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হ'লে যে কত্তা তোকে জ্যান্তে কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়!

কি কর্‌ব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে প'ড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধ'রে যে দুখুঁটো খাইয়ে আন্‌ব—তা মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপ্‌নি চরাই ক'রে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয় নি—খামারে প'ড়ে; খড় এখনো গাদি দেওয়া হয় নি, মাঠের আলগুলো সব জ্ব'লে গেল—কোথাও এক মুঠো ঘাস নেই, কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ ত ঠাণ্ডায় কোথাও বেঁধে দিয়ে দুআঁটি বিচুলি ফেলে দে না ততক্ষণ চিবোক্। তোর মেয়ে ভাত রাঁধে নি? ফ্যানে-জলে দে না এক গামলা খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গোরুটার জন্যে এক আঁটি ফেলে রাখ্‌তে নেই? ব্যাটা কসাই!

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া ব'লে কত্তামশায় সব ধ'রে রাখ্‌লেন। কেঁদে কেটে হাতে পায়ে প'ড়ে বল্‌লাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলি না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটীতে থাকি, তাও না হয় তালপাতার গোঁজাগাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ ম'রে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্। সাধ ক'রে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ। হেসে বাঁচি নে।

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল, কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস-দুয়ের খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হ'য়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না; কহিলেন, আচ্ছা মানুষ ত তুই—খেয়ে রেখেছিস্, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা ত রামরাজত্বে বাস করিস্—ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে ক'রে মরিস্।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কর্‌ব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করি নে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল ত? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপ্‌রি উপ্‌রি দুসন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটীতে দুবেলা দুটো পেট ভ'রে খেতে পর্য্যন্ত পাই নে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ বিষ্টি-বাদলে মেয়েটিকে নিয়ে কোণে ব'সে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজ্‌রা গোণা যাচেচ—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহণ-দুই ধার, গোরুটাকে দুদিন পেট পুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতেই সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু-পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্—ছুঁয়ে ফেল্‌বি না কি?

না বাবাঠাকুর, ছোঁব কেন, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহণ-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবোলা জীব—কথা বল্‌তে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধ্‌বি কি ক'রে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন ক'রে পারি শুধ্‌বো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া গফুরের ব্যাকুল কণ্ঠের অনুকরণ করিয়া কহিলেন, ফাঁকি দেব না। যেমন ক'রে পারি শুধ্‌বো! রসিক নাগর! যা যা সর্, পথ ছাড়্। ঘরে যাই, বেলা হ'য়ে গেল! এই বলিয়া তিনি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া পা বাড়াইয়াই সহসা সভয়ে পিছাইয়া গিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি?

গফুর উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইয়া কহিল, গন্ধ পেয়েচে এক মুঠো খেতে চায়—

খেতে চায়? তা বটে! যেমন চাষা তার তেম্‌নি বলদ। খড় জোটে না, চাল-কলা খাওয়া চাই! নে-নে, পথ থেকে সরিয়ে বাঁধ্। যে শিঙ্ কোন্ দিন দেখ্‌চি কাকে খুন কর্‌বে। এই বলিয়া তর্করত্ন পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে, তবু দেয় না। না দিক্ গে—তাহার গলা বুজিয়া আসিল, তার পরে চোখ দিয়া টপ্ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, মহেশ, তুই আমার ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন ক'রে বুড়ো হয়েছিস্, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নে—কিন্তু তুই ত জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল। গফুর চোখের জল গরুটার পিঠের উপর রগ্‌ড়াইয়া মুছিয়া ফেলিয়া তেম্‌নি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশানের ধারে গাঁয়ের যে গো-চরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি ক'রে দিলে, এই দুর্বচ্ছরে তোকে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে রাখি বল্? ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা ফেড়ে খাবি, লোকের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি। গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌তে—কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার

দু'চোখ বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া গফুর একবার এদিকে ওদিকে চাহিল, তার পরে ভাঙা ঘরের পিছন হইতে কতকটা পুরাণো বিবর্ণ খড় আনিয়া মহেশের মুখের কাছে রাখিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, নে, শিগ্‌গির ক'রে একটু খেয়ে নে বাবা, দেরি হ'লে আবার—

বাবা ?

কেন মা ?

ভাত খাবে এসো, বলিয়া আমিনা ঘর থেকে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মহেশকে আবার চাল ফেড়ে খড় দিয়েচ বাবা ?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইয়া বলিল, পুরোণো পচা খড় মা আপনিই ঝ'রে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতর থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার করচ ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেওয়ালটা যে প'ড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিয়াছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না এ কথা, তাহার নিজের চেয়ে আর কে বেশি জানে ? অথচ এ উপায়েই বা কটা দিন চলে।

মেয়ে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুর কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবারে খাইয়ে দিয়ে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই ম'রে গেছে।

নেই ? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখের দিনে এটুকুও যে নষ্ট করা যায় না এই দশ বছরের মেয়েটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। একটা পিতলের থালায় পিতার শাকান্ন সাজাইয়া দিয়া কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটির সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা—জ্বর গায়ে খাওয়া কি ভাল ?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বল্‌লে বড় ক্ষিধে পেয়েচে ?

তখন? তখন হয় ত জ্বর ছিল না মা।

তা হ'লে তুলে রেখে দি, সাঁঝের-বেলা খেয়ো?

গফুর মাথা নাড়িয়া বলিল, কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়্‌বে, আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুর কত কি যেন চিন্তা করিয়া হঠাৎ এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল; কহিল, এক কাজ কর্ না মা, মহেশকে না হয় ধ'রে দিয়ে আয়। তখন রাতের-বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা? প্রত্যুত্তরে আমিনা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পার্‌ব বাবা।

গফুরের মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

২

পাঁচ-সাত দিন পরে একদিন পীড়িত গফুর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসিয়া ছিল, তাহার মহেশ কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ঘরে ফিরে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই আমিনা সকাল হইতে সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায় সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মাণিক ঘোষেরা আমাদের মহেশকে থানায় দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূর পাগ্‌লি।

হাঁ বাবা, সত্যি! তাদের চাকর বল্‌লে, তোর বাপ্‌কে বল্ গে যা দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেছে, বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহুপ্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গরীব, সুতরাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড় শাস্তি দিতে পারে এ ভয়

তাহার নাই। বিশেষতঃ মাণিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে প'ড়ে এল বাবা, মহেশকে আন্‌তে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু তারা যে বল্‌লে তিন দিন হ'লেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায় বেচে ফেল্‌বে?

গফুর কহিল, ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না, কিন্তু মহেশের সম্পর্কে ইহার উল্লেখমাত্রেই তাহার পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইয়া উঠিত ইহা সে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু আজ সে আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

রাত্রের অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিয়া কহিল, খুড়ো একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিয়া সে তাহার পিতলের থালাটি বসিবার মাচার নীচে রাখিয়া দিল। এই বস্তুটির ওজন ইত্যাদি বংশীর সুপরিচিত। বছর-দুয়েক মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধক রাখিয়া একটি করিয়া টাকা দিয়াছে। অতএব আজও আপত্তি করিল না।

পরদিন যথাস্থানে আবার মহেশকে দেখা গেল। সেই বাব্‌লাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধার, সেই ক্ষুধাতুর কালো চোখের সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়াগোছের মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। অদূরে একধারে দুই হাঁটু জড়ো করিয়া গফুর মিঞা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, পরীক্ষা শেষ করিয়া বুড়া চাদরের খুঁট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহার ভাঁজ খুলিয়া বার বার মসৃণ করিয়া লইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল, আর ভাঙ্‌ব না, এই পুরোপুরিই দিলাম—নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া তেম্‌নি নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা গোরুর দড়ি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দড়িতে হাত দিয়ো না বল্‌চি—খবরদার বল্‌চি, ভাল হবে না।

তাহারা চমকিয়া গেল। বুড়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কেন?

গফুর তেম্‌নি রাগিয়া জবাব দিল, কেন আবার কি। আমার জিনিস আমি বেচ্‌ব না—আমার খুসী। বলিয়া সে নোটখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আস্‌তে বায়না নিয়ে এলে যে?

এই নাও না তোমাদের বায়না ফিরিয়ে? বলিয়া সে ট্যাঁক হইতে দুটা টাকা বাহির করিয়া ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। একটা কলহ বাধিবার উপক্রম হয় দেখিয়া বুড়া হাসিয়া ধীরভাবে কহিল, চাপ দিয়ে আর দুটাকা বেশি নেবে, এই ত? দাও হে, পানি খেতে ওর মেয়ের হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধ্‌লা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়া বিরক্ত হইল, কহিল, না ত কি? চাম্‌ড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ একটা বিশ্রী কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, এ কথা কর্ত্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়া ছিল, শিবুবাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস ক'রে আছিস্‌, জানিস্‌?

গফুর হাত জোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদী এবং বদ-মেজাজী বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনো কর্‌ব না কর্ত্তা! বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত নাকখত্‌ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবুবাবু সদয়কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েচে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস্ নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক যে শুধু কর্ত্তার পুণ্যপ্রভাবে ও শাসনভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যে জন্য এই ধর্ম্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রি-সীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্নচিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তাহার গায়ে মাথায় ও শিঙ্গে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

৩

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্ত্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্য্যন্ত নাই। কখনো এ-রূপের লেশমাত্র পরিবর্ত্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, এ কথা আজ ভাবিতেই পারা যায় না। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহঃ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এম্নি দিনে দ্বিপ্রহর-বেলায় গফুর ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরের দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহার অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্ব্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল মাথার উপর দিয়া গিয়াছে,

আর কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায়, পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায় অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, আমিনা, ভাত হয়েছে রে?

মেয়ে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিরুত্তরে খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেঁচাইয়া কহিল, হয়েছে ভাত? কি বল্লি—হয় নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিস্ নি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।

গফুর মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, রাত্তিরে যে বলেছিলুম! রাত্তিরে বল্‌লে কারু মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। মুখ অধিকতর বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিল, চাল থাক্‌বে কি ক'রে? রোগা বাপ খাক্ আর না খাক্, বুড়োমেয়ে চারবার পাঁচবার ক'রে ভাত গিল্‌বি। এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ ক'রে বাইরে যাবো। দে, এক ঘটি জল দে তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। বল্, তাও নেই।

আমিনা তেম্‌নি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া গফুর যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণার জল পর্য্যন্ত নাই, তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস্ করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস্ কি? এত লোকে মরে তুই মরিস্ নে।

মেয়ে কথাটি কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে চোখের আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে। তাহার মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীলা কর্ম্মপরায়ণা শান্ত মেয়েটির কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কয়টি ফুরানো অবধি তাহাদের পেট ভরিয়া দুবেলা অন্ন জুটে না। কোন দিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয়। দিনে পাঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমন অসম্ভব তেম্‌নি মিথ্যা এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্করিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর

খিড়কীর পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেম্‌নি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁসিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে।. এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না, কিংবা কাড়া-কাড়ির মাঝখানে কেহ তাহার মেয়েকে কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এম্‌নিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিয়া আসিল। এমনি সময়ে জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস্?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাক্‌চেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয় নি, পরে যাবো।

এত বড় স্পর্দ্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্ব্বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। রক্ষা এই যে অত ক্ষীণকণ্ঠ অত বড় কানে গিয়া পৌঁছায় না— না হইলে তাঁহার মুখের অন্ন ও চোখের নিদ্রা দুই-ই ঘুচিয়া যাইত। তাহার পরে কি ঘটিল বিস্তারিত করিয়া বলার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে জমিদারের সদর হইতে ফিরিয়া ঘরে গিয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল তখন তাহার চোখমুখ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তাহার এত বড় শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটি হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিয়া ফুলগাছ খাইয়াছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়াছে, পরিশেষে ধরিবার উপক্রম করায় বাবুর ছোটমেয়েকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয়—ইতিপূর্ব্বেও ঘটিয়াছে, শুধু গরিব বলিয়াই তাহাকে মাপ করা হইয়াছে। পূর্ব্বের মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে হয় ত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস করে বলিয়া কাহারও গোলাম নয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্দ্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেখানে সে প্রহার ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেম্‌নি নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল।

এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁস ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্ত্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিরে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপর সজোরে আঘাত করিল।

একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বহিয়া ফোঁটা-কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার-দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যত দূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি কর্‌লে বাবা, আমাদের মহেশ যে ম'রে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালোচক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।

ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহারা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদের হাতে ধারালো চক্‌চকে ছুরি দেখিয়া গফুর শিহরিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়ার লোকে কহিল, তর্করত্নের কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয়।

গফুর এ সকল কথারও উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপর মুখ রাখিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিয়া কহিল, আমিনা, চল্ আমরা যাই—

সে দাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায় বাবা?

গফুর কহিল, ফুলবেড়ের চট্‌কলে কাজ কর্‌তে।

মেয়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহার কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই—সেখানে ধর্ম্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আব্রু থাকে না, এ কথা সে বহু বার শুনিয়াছে।

গফুর কহিল, দেরি করিস্ নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁট্‌তে হবে।

আমিনা জল খাইবার ঘটী ও পিতার ভাত খাইবার পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুর নিষেধ করিল, ওসব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার-গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুসি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ ক'রো না।

প্রবাসী

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

[ইনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মালদহ জেলার চাঁচলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করার পর হইতে ইনি সাহিত্যসেবা স্থরু করেন এবং সাহিত্য, ভারতী, প্রদীপ প্রভৃতি তৎকালীন বিখ্যাত মাসিকপত্রসমূহে ইঁহার গল্প-প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে থাকে। ইনি কিছুকাল 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। পরে বহুকাল 'প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকতা করেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তৎপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। ইনি একজন বিখ্যাত টীকাকার, সমালোচক ও প্রবন্ধকার হইলেও প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক বলিয়াই ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। ইঁহার অনেকগুলি উপন্যাস ও ছোট গল্পের পুস্তক আছে। ইঁহার রচিত 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর টীকা' একখানি মহামূল্য পুস্তক এবং 'রবিরশ্মি' নামক রবীন্দ্রকাব্য-নাটকের টীকাগ্রন্থ বিদ্বৎ-সমাজে বিশেষ সমাদৃত।]

আমি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম। ঘুরিতে ঘুরিতে দেশভক্তির পুণ্যতীর্থ রাজপুতনা দেখিয়া তুল্যপবিত্র পঞ্জাব দেখিবার সাধ হইল। পঞ্জাবের রাজতীর্থ দিল্লী ও লাহোর, ধর্ম্মতীর্থ কুরুক্ষেত্র ও অমৃতসর দেখিয়া রণতীর্থ চিলিয়ানওয়ালা, সোবরাঁও, পাণিপথ দেখিলাম। তারপর সেই

> "গুরুদাসপুর গড়ে
> বান্দা যেখানে হইল বন্দী তুরানী সেনার করে,"

সেইখানে গেলাম। গুরুদাসপুর দেখিয়া মনে হইল এইসঙ্গে একবার শিখ-বীরত্বের অন্যতম তীর্থ স্থহিদগঞ্জও দেখিয়া যাইতে হইবে। স্থহিদগঞ্জের নিকটে রেল বা ষ্টেশন নাই, পথ পর্ব্বতবন্ধুর, অরণ্যজটিল। তথাপি মনে হইতে লাগিল—

> "পাঠানেরা যবে ধরিয়া আনিল বন্দী শিখের দল,
> স্থহিদগঞ্জে রক্তবরণ হইল ধরণীতল।"

সে জায়গা আমায় দেখিতেই হইবে।

অনেক কষ্টে অশ্বপৃষ্ঠে তিন দিন চলিয়া, সুহিদগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলাম। সুহিদগঞ্জ একটি অতি ছোট শহর, শিখজাতির আবাসভূমি বলিয়া সেখানে একটি পল্টনের ছাউনি আছে ;——সেইজন্য শহরটি বেশ পরিকারপরিচ্ছন্ন। শহরে পৌঁছিয়া শুনিলাম সেখানকার কমিসেরিয়েট বিভাগের কর্ত্তা একজন বাঙালী বাবু। তাঁহার নাম মাখনলাল শেঠ। এই সুদূর দুর্গম প্রদেশে একজন বাঙালীর অপ্রত্যাশিত দর্শন-সম্ভাবনা আমাকে নিতান্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। আমি প্রথমেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম।

একজন লোক মাখন-বাবুকে চিনাইয়া দিল। তাঁহার অতি দীর্ঘ বিপুল বলিষ্ঠ চেহারা, গালপাট্টা দাড়ি, মাথায় প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ি ; কাহার সাধ্য তাঁহাকে বাঙালী বলিয়া চেনে। আমি প্রথমতঃ তাঁহাকে পাঞ্জাবী মনে করিয়াছিলাম। তার পর যখন জানিলাম যে তিনিই মাখনবাবু, তখন আমি তাঁহার নিকটে গিয়া নমস্কার করিয়া বলিলাম, "আমি পর্য্যটক, দেশ দেখ্‌তে বেরিয়েছি। এখানে এসে শুন্‌লাম যে এখানে আপনি বাঙালী আছেন, তাই আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছি।"

মাখন-বাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "হাঁ সে ত আপনে ঠিক করেসেন, আপনে বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর কাছে না আস্‌বেন ত কোথা যাবেন——গোরা-বারিকে যাবেন নাকি? আপনি বসেন। বাবুর নামটি কি হচেছ?"

আমি দেখিলাম মাখন-বাবু একেবারে খাঁটি পশ্চিমে বাঙালী। বাঙালী-সঙ্গের যে সরস আনন্দ আমি আশা করিয়া আসিয়াছিলাম তাহার কোনোই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া আমি অপ্রসন্ন মুখে বলিলাম "আমার নাম বনমালী সেন।"

মাখন-বাবু আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া বিনা প্রশ্নেই বলিলেন, "হামার নামটি হচেছ মখ্‌খনলাল শেঠ। হামার ঠাকুরবাবা পাঞ্জাবে কমিসেরিয়েটে নোক্‌রি কর্‌তে এসেছিল। এসেছিল ত এসেছিল, এইখানেই রহে গেল। হামাদের বাড়ী শিয়ালকোটে আছে। বাবুর বাড়ীটি কুন্‌খানে হচেছ?"

"আমার বাড়ী কল্‌কাতার কাছে।"

"একবার হামি কল্‌কত্তা দেখিয়েসি——ওঃ বড় ভারী শহর——হামাদের লাহোরসে ভি ভারী! হামি আর কখ্‌খনো দেখি না——একবার দেখ্‌লো,

হামি বাংলা দেশে সাদি কর্‌তে গিয়েসিল। হামার সাদি আঠ বরষ হয়েসে।"

মাখন-বাবু নিজের পরিচয় অনর্গল দিয়া যাইতেন বোধ হয়, হঠাৎ একটি ৫।৬ বছরের মেয়ে পাশের দরজার চিক ঠেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া মাখন-বাবুর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, "বাবা, বাবা, চুপ কর বল্‌ছি। মা বাবুকে মুখ-হাত ধুয়ে জল খেতে বল্‌লে।"

মাখন-বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, হামি ভুলে গিয়ে-সিলো। বাবু বহুত দূরসে আস্‌ছে। তেঘা সিং, বাবুজিকো গুসলখানামে লে যাও।"

আনন্দমূর্ত্তি পুলকচঞ্চল সেই মেয়েটিকে দেখিয়া আমার মন আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া মাখন-বাবুর মেয়েটিকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "তোমার নাম কি লক্ষ্মী?"

মেয়েটি দিব্য সপ্রতিভভাবে বলিল, "বা রে! লক্ষ্মী কেন? আমার নাম কুন্দকলি।"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, "আচ্ছা কুন্দ, তোমার বাবা ত ভালো বাংলা বল্‌তে পারেন না, তুমি ত দিব্যি বাংলা বল।"

কুন্দ বলিল, "বাবা যে হিন্দুস্থানী, আর আমি আর মা যে বাঙালী।"

মাখন-বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমিও হাসিলাম, চিকের আড়ালেও একটু মৃদু হাস্যগুঞ্জন শুনিলাম। কুন্দ অপ্রতিভ হইয়া আমার বাহুবেষ্টন ছাড়াইয়া চিকের অন্তরালে ছুটিয়া পলাইল। কুন্দ যখন চিক তুলিল তখন দেখিলাম একটি তরুণী চিকের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখ-মুখ হইতে আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে।

আমি স্নান সমাপন করিয়া আহারে বসিলাম। মাখন-বাবুর স্ত্রী স্বয়ং পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলাম পঞ্জাবে থাকিয়া বাংলা দেশের পর্দ্দাপ্রথা ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট শিথিল হইয়া উঠিয়াছে। গৃহকর্ত্রীকে স্বহস্তে অতিথিসেবা করিতে দেখিয়া আমার চিত্ত এক অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমি আহার করিতে করিতে মাখন-বাবুকে বলিলাম, "এখানে দেখ্‌বার কি আছে?"

"এখানে পল্টন-বারিক সেওয়ায় দেখ্‌বার লায়েক কুচ্ছু নাই," বলিয়া মাখন-বাবু তাঁহার প্রকাণ্ড পাগড়ি-বাঁধা মাথা নাড়িতে লাগিলেন।

মাখন-বাবুর পত্নী অতি নম্র স্বরে বলিলেন, "কেন? চন্দ্রা আর সীতার মাঝের জায়গাটা?"

"হাঁ, উয়ার আর বাবু কি দেখ্‌বে? দুটা নদীর বিচখানে একটা জগাহ্‌, উ রকম বাবু বহুত দেখেসে।" বলিয়া মাখন-বাবু হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার স্ত্রী নীরব হইয়া রহিলেন।

আমি তাঁহার নীরবতার ভাষা বুঝিলাম—চন্দ্রা ও সীতার মাঝখানকার জায়গাটি তাঁহার মনোরম লাগিয়াছে তাই অতিথিকেও দেখাইবার ইচ্ছা। আমি বুঝিয়া বলিলাম, "আমি আজকের দিনটা যখন আছি, তখন বিকেলে একবার সেইদিকে বেড়াতে যাব। কাল কখন এখান থেকে যাওয়ার সুবিধা হবে?"

মাখন-বাবু বলিলেন, "কাল যাবেন? সেটি হোবে না। আপনাকে এখানে আঠ রোজ রহতে হোবে। কি বোলো কুন্দ?"

কুন্দ হসিত মুখে পিতার প্রকাণ্ড পা জড়াইয়া তাঁহার আড়ালে থাকিয়া কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কুন্দর মা অতি ধীরে জনান্তিকে বলিলেন, "এখন শিগ্‌গির যাওয়া হবে না।"

আমি বলিলাম, "আমি দেশ ছেড়ে অনেক দিন এসেছি। এখানে অনর্থক বিলম্ব করায় আপনাদের অন্নধ্বংস করা ছাড়া আর ত কোনো লাভ দেখ্‌ছি না।"

মাখন-বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "অন্‌ধ্বংস! আপ্‌নেত কুন্দসে ভি কম খান!" পুনরায় সেই বিরাট্‌ সরল হাস্য।

কুন্দর মা বলিলেন, "আপনার লাভ নেই, আমাদের আছে। আপনি একমাস দেশ ছেড়ে এসে উতলা হ'য়ে উঠেছেন, আমি আট বচ্ছর দেশ-ছাড়া, আমাদের কাছে একজন বাঙালী যে পরমাত্মীয়।"

মাখন-বাবুর পত্নী সাক্ষাৎভাবে আমার সহিত কথা কহিলেন দেখিয়া আমিও তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে বলিলাম, "আপনি আট বচ্ছর দেশছাড়া! তবু ত এখনো বেশ বাংলা বল্‌তে পারচেন।"

আমার এই বাক্য তাঁহার স্বামীর অসম্পূর্ণ বাংলাজ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত বলিয়া তিনি লজ্জিতা হইয়া মুখ নত করিয়া একটু হাসিলেন।

মাখন-বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ হাস্য দ্বারা সরল প্রাণের পরিচয় দিয়া বলিলেন, "বাঙ্গালা ভুলবে কেইসে? কেৎনা কেতাব পঢ়ে। হররোজ ত কল্‌কত্তাসে কেতাব মাঙ্গাচেছ্। চলেন আপনাকে সব দেখ্‌লাবো।"

আমি আহার করিয়া উঠিলাম। সেই পার্ব্বত্যদেশে পান পাওয়া যায় না, কুন্দ আমাকে মসলা দিল। আমি মসলা চিবাইতে চিবাইতে মাখন-বাবুর সঙ্গে তাঁহার পত্নীর পুস্তকভাণ্ডার দেখিতে গেলাম, কুন্দ ও তাহার মাতাও আমাদের সঙ্গে আসিলেন। একটি ঘরে দেয়ালের গায়ে, দরজার মাথায়, তাকে, আল্‌মারিতে অনেক বাংলা বই এবং খানকতক ইংরেজি বই সাজানো রহিয়াছে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ পুস্তকই সেখানে সংগৃহীত দেখিলাম; পুস্তকগুলি প্রায়ই কবিতা, গল্প বা ইতিহাসবিষয়ক। তাহাতেই বুঝিলাম এগুলি নারীর সংগ্রহ এবং সে-নারী সাহিত্যরসজ্ঞা। ইংরেজি বইগুলি প্রায় শিকারের, নয় ভ্রমণকাহিনী; বুঝিলাম এইগুলি মাখন-বাবুর সম্পত্তি। বাংলার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্র প্রায় সবগুলিই এবং বাংলা সাপ্তাহিকও দু তিন খানি একটি টেবিলের উপর সুশৃঙ্খলায় সাজানো রহিয়াছে।

আমি বুঝিলাম একটি নির্ব্বাসিতা প্রবাসিনী বঙ্গকন্যা কেমন সচেতন ভাবে ও সযত্নে আপনার দেশের ভাষা ও চিন্তার সহিত আপনার হৃদয়ের যোগ রাখিতেছেন। আমি শ্রদ্ধানন্দময় দৃষ্টিতে তাঁহাকে নীরবে অভিনন্দন করিলাম।

মাখন-বাবু উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "এ এৎনা সব কেতাব পঢ়িয়ে লিয়েসে।" বলিয়া পত্নীগুণগর্ব্বিত দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের দিকে আরবার পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। মাখন-বাবুর স্ত্রী চকিতে আমার দিকে একবার চাহিয়া মুখ নত করিলেন। আমি মাখন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কিছু পড়েন না?"

কুন্দ খিল খিল করিয়া হাসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমার মুখের প্রতি সকৌতুক ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হানিয়া বলিল, "আপনি বুঝি মনে করেছেন বাবা বাংলা পড়্‌তে পারে! কিচ্ছু পারে না, একটুও পারে না! মা বাবাকে আর আমাকে পেরথম ভাগ পড়ায়! আমি বাবার চেয়ে এগিয়ে গেছি!"

মাখন-বাবুর পত্নী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেন, মস্তক নত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি হাসিলাম। মাখন-বাবুর হাসিতে ঘর ফাটিয়া যাইবার

উপক্রম হইল। হাসিতে হাসিতে মাখন-বাবু বলিলেন, "হাঁ হাঁ, হামি কুছু বাংলা জানে না। বেলা হামাকে বাংলা কেতাব শুনায়। ও হামি কুছ বুঝে উঝে না। বহুত বাংলা বাত হামি সমঝে না। এক কোউন বাঙ্গালী মহারাজার শিকার-কাহিনী আউর দো একঠো ভ্রমণ-কাহিনী কুছ কুছ সমঝে ছিলো।"

আমি মাখন-বাবুর সরলতা, তাঁহার স্ত্রী বেলার সৌকুমার্য্য ও কুন্দর মাধুর্য্য হৃদয়ে অনুভব করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। দেখিলাম মাখন মাখনের মতোই কোমল, বেলা বেলার মতোই স্নিগ্ধ, কুন্দ কুন্দর মতোই উজ্জ্বল! মাখনের বিশাল বক্ষঃপঞ্জরের অভ্যন্তরে একখানি সরল প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া হাসির হিল্লোলে বাহির হইয়া আসিতেছিল; বেলার আঁখিপথে একটি ব্রীড়ামাধুরী তরুপল্লবে সন্ধ্যার অরুণিমার মতো ঝলিতেছিল; নদীবক্ষে প্রভাতরবির আলোকলীলার মতো একটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা কুন্দকলির চোখমুখ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বইগুলি দেখিতে লাগিলাম। তখন মাখন-বাবু বলিলেন, "বাবু, আপনে এইখানে পড়বেন, শুবেন, যো খুসি করবেন; হামি এখন একবার আপিসমে চল্‌লো; বিকালে এক সাথ বেড়াতে যাব।" মাখন-বাবু চলিয়া গেলেন।

তাঁহার পত্নীও আহার করিতে গেলেন। আমি কুন্দর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলাম।

"কুন্দ, তুমি আমার সঙ্গে দেশে যাবে?"

"আপনাকে ত আমি চিনি না; আপনার সঙ্গে যাব কেন? মা যখন যাবে তখন যাব; আমি আর মা শিগ্‌গির বাংলা দেশে আমার মামার বাড়ী যাব। বাবা যাবে না। দেখুন দেখুন, বাবা যাবে না কেন জানেন? হি হিঃ সে বড্ড মজা! বাবা বলে বাংলা দেশের কথা বাবা বুঝ্‌তে পারে না; বাবাটা ভারি বোকা! আমরা ত বাঙালী? কিন্তু তবু আমরা ত হিন্দী কথা বুঝ্‌তেও পারি বল্‌তেও পারি! বাবা হিন্দুস্থানী কি না, বাংলা কিচ্ছু বোঝে না।"

কুন্দ এইরূপে অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিল; আমি মাঝে মাঝে এক-আধটা কথার যোগান দিয়া তাহার বাক্যস্রোতটাকে অবাধ রাখিতেছিলাম। আঙুরটির

মতো সেই নিটোল টুলটুলে মেয়েটির কথা হইতে যে রসধারা ক্ষরিত হইতেছিল আমি মুগ্ধচিত্তে তাহাই পান করিতেছিলাম। এমন সময়ে কুন্দর মা ঘরে আসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি বক্‌ছিস্ কুন্দ, বনমালী-বাবু পথে কষ্ট পেয়ে এসেছেন, ওঁকে একটু ঘুমুতে দে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঘুম ত আমার নিত্যই আছে, কুন্দকে ত আর আমি নিত্য পাব না। আমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি আপনি কেমন ক'রে এই নিঃসঙ্গ প্রবাস যাপন কর্‌ছেন।"

বেলা হাসিয়া বলিলেন, "তা সত্যি, কুন্দ আমার মস্ত সঙ্গী। তার সঙ্গে আর এই বইগুলির সঙ্গে কথা ক'য়েই আমি বেঁচে আছি।"

এই কথার মধ্যে তাঁহার যে প্রচ্ছন্ন মর্ম্মবেদনা ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম, "মাখন-বাবু লেখাপড়ার চর্চ্চা করেন না, তবে তিনি করেন কি?"

কুন্দ অমনি বলিয়া উঠিল, "বাবা খালি খালি শিকার ক'রে বেড়ায়। দেখুন, বাবা একদিন একটা মস্ত বড় বাঘ মেরে এনেছিল—সেটা মস্ত বড়! বাবা রোজই হরিণ পাখী শিকার ক'রে আনে আর খায়।"

"তুমি খাও না কুন্দ?"

"হুঁ খাই, কিন্তু বড্ড মায়া করে, আহা পাখী আর হরিণগুলি কেমন সুন্দর। ওরা ত মানুষের কিছু ক্ষতি করে না। তবু বাবা ওদের মারে! বাবা ভারী নিষ্ঠুর।"

আমি বুঝিলাম এই বাক্যগুলি তাহার মাতৃ-হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, নহিলে শিশু কুন্দ এত কথা বলিতে জানিত না।

এইরূপে আমরা প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে বিচরণ করিতে করিতে সাহিত্য-প্রসঙ্গে উপনীত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিষয় পড়্‌তে বেশী ভালোবাসেন?"

বেলা স্মিত হাস্যে উত্তর করিলেন, "কবিতা।"

তখন আমি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কবিদিগের কাব্য-আলোচনা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম সকল কবির মর্ম্মস্থানটিতে তিনি দৃষ্টি ফেলিয়া তাঁহাদের নিগূঢ় পরিচয় জানিয়া লইয়াছেন।

বিকাল-বেলা মাখন-বাবু আপিস হইতে আসিলেন। আমরা কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া টমটমে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম, বেলা ও কুন্দও সঙ্গে চলিলেন। আমরা সমস্ত শহরটা প্রদক্ষিণ করিয়া শহরের বাহিরে গিয়া পড়িলাম। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও বা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঠিয়াছে; মধ্যে মধ্যে এক-একটা সরল দেবদারু বৃক্ষ কুঞ্চিতপ্রান্ত পত্রমন্দির মাথায় করিয়া মেঘ স্পর্শ করিবার আয়োজন করিতেছে; কোথাও বা আখ্‌রোটবৃক্ষের ঘন-নিবিড় পত্রকুঞ্জের মধ্যে দ্রাক্ষালতা বেড়িয়া উঠিয়াছে; গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ঝুলি-তেছে; দূরে মেঘের গায়ে মিশিয়া শ্যামধূসর গিরিশ্রেণী স্তরে স্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে স্তব্ধ নিস্পন্দ সমুদ্রের মতো দেখা যাইতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "বাঃ, কি চমৎকার! প্রকৃতিলক্ষ্মীর আজ অপরূপ ঐশ্বর্য্যলীলা দেখ্‌লাম!"

মাখন-বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বনমালী-বাবু, আপনে কেতাবের জবানে যে বাত বোলেন ও হামি কুছ সম্‌ঝে না। বেলা সম্‌ঝে, উয় ভি কভি কভি এইসি কেতাবী বাত বোলে!" আবার সমস্ত প্রান্তর প্রকম্পিত করিয়া মাখন-বাবু হাসিয়া উঠিলেন।

কুন্দ অনর্গল বকিতে বকিতে চলিয়াছিল। সে আমাকে ডাকিয়া ডাকিয়া কখনো একটা খর্‌গোশ কখনো বা একটা শেয়াল ছুটিয়া যাইতেছে দেখাইতে-ছিল। ক্রমে আমরা নদীর তীরে গিয়া পৌছিলাম। সুহিদগঞ্জের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ দিয়া দুইটি নদী প্রবাহিত—পূর্ব্বদিকে সীতা ও পশ্চিমদিকে চন্দ্রা। শহর হইতে একটু দূরে এক জায়গায় এই দুটি নদী নিতান্ত সন্নিহিত হইয়া একমাইল আন্দাজ পথ সমান্তরালে বহিয়া গিয়াছে। এই দুই সমান্তরাল নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান স্থানটি একটা বেশ চওড়া পথের মত, তাহার দুই ধারে পুষ্প-স্তবকনম্র দীর্ঘ সরল কেলুগাছের শ্রেণী, নদীর পরপারে পর্ব্বত, নদীর তীরে অসংখ্য জলচর পক্ষীর সজীবতা ও কাকলী স্থানটিকে বিচিত্র সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিয়াছে, শুক্লপক্ষের চাঁদের আলো নির্ম্মল প্রমুক্ত আকাশ হইতে পর্ব্বতে জলে গাছে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; নদীতীরের কেলুতরুবীথির মধ্যে মধ্যে আলো-আঁধারের লুকাচুরি চলিতেছে; ঘন-পত্রান্তরালের অন্ধকারও চাঁদের শুভ্র স্বচ্ছ আলোকে ভিজিয়া তরল হইয়া

উঠিয়াছে; জলচর পক্ষিগণ থাকিয়া থাকিয়া কলরব করিয়া ডানা ঝাড়িতেছে, ডানাঝাড়া জলশীকর মুক্তাচূর্ণের মতো ঝরিয়া পড়িতেছে, চিক্কণ মসৃণ সিক্ত ডানাগুলি চাঁদের আলোতে রূপার পাতের মতো জ্বলিয়া উঠিতেছে, জলের খরস্রোতে যেন দ্রবরজতধারা আলোড়িত হইতেছে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ ও অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। বেলা আমার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন—সেই নীরব হাসির অর্থ 'কেমন, আমি যেমন বলিয়াছিলাম তেমনি সুন্দর কি না!' আমার মুখেচোখে যে পুলক জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা দেখিয়াই বেলা বুঝিতে পারিলেন আমার মনের অবস্থা তখন কিরূপ। আমি মাখন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি এখানে এমন জায়গায় বেড়াতে আসেন না?"

মাখন-বাবু বলিলেন, "হাঁ আসে, শিকার খেল্‌তে আসে। দেখ্‌ছেন না কেতো চিড়িয়া!"

হায় মূঢ়! আমি কি আজকার এই জ্যোৎস্নাপুলকিত রজনীতে জীবহিংসার বা উদরের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি! আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনের যে আনন্দ তাহার সন্ধান কি তুমি কিছুই পাও নাই?

আমি পুনরায় বলিলাম, "আপনি এম্‌নি জ্যোৎস্না-রাত্রে বেড়াতে আসেন না?"

মাখন-বাবু বলিলেন, "হাঁ, সে ভি আসে। চাঁদ্‌নি রাতে হরিণ বাঘ নদীমে জল পিতে আসে, তখন শিকার খেলি।"

আমি হতাশ হইয়া চুপ করিলাম। এই ব্যক্তিটি অনাবশ্যকের যে আনন্দ তাহার সন্ধান কিছুই জানে না দেখিয়া আমি বেলার অবস্থা স্মরণ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইলাম।

খানিকক্ষণ বেড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। ফিরিয়া প্রস্তাব করিলাম যে আমি পরদিন প্রাতঃকালেই যাইব। মাখন-বাবু, বেলা, কুন্দ সকলেই প্রতিবাদী হইয়া পড়িলেন। অনেক যুক্তিতর্কের পর অবশেষে আমি জয়ী হইলাম বটে, কিন্তু এই একদিনের পরিচিত পরিবারটির আসন্ন-বিচ্ছেদবেদনা বুকে লইয়া আমি শয়ন করিলাম। রাত্রে ভালো ঘুম হইল না।

প্রাতে উঠিয়া স্নান করিয়া বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া কুন্দকে বলিলাম তাহার মাকে ডাকিয়া দিতে। বেলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহজনম্র মুখখানির উপর একটা বিষাদের তরল ছায়া পড়িয়া মুখখানিকে করুণ করিয়াছে। আমি বলিলাম, "আমি তবে বিদায় হই ?"

বেলা—না খেয়ে কি যাওয়া হয় ? খেয়ে নিন।

আমি—এত সকালে আর কি খাব, কিছু খাবার যদি থাকে ত আমার সঙ্গে দেবেন, পথে খাব।

বেলা—পথের পাথেয় ত দেবোই, এখান থেকেও কিঞ্চিৎ খেয়ে যেতে হবে। দেরি হবে না। খাবার তৈরি আছে, আপনি আসুন।

আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, গরম পোলাও ও মাংস আমার আহারের অপেক্ষা করিতেছে। মাখন-বাবু ও কুন্দ সেই ঘরে বসিয়া আছেন।

আমি বলিলাম, "এত কখন রাঁধ্‌লেন ?"

বেলা একটু শুধু হাসিলেন।

মাখন-বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তিনটা রাতে উঠে উ এই সব করেসে।"

আমি কৃতজ্ঞ ভাবে বলিলাম, "এত করা কেন ?"

মাখন-বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনি এত পথ যাবেন, কেতো কষ্ট হোবে, আপনার জন্যে আমরা বেশি কি করেসে ?"

এই আতিথেয় দম্পতির সদাশয়তায় মুগ্ধ হইয়া ভাবাবিষ্ট চিত্তে আমি আহারে বসিলাম। বেলা কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "আপনি এত শিগ্‌গির আমাদের ছেড়ে যাবেন তা ত আগে ভাবিনি, তাই খাবার বিশেষ কিছুই আয়োজন কর্‌তে পারিনি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "পোলাওএর চেয়েও বেশি আর কি আয়োজন কর্‌তেন ?"

বেলা বলিলেন, "পোলাও ত ভারী। বাড়ীতে যথেষ্ট ঘিও ছিল না ; ছাউনির বাজার রাত্রে বন্ধ, আনিয়ে নিতেও পারিনি। ঘৃতহীন পোলাও খেয়ে যান।"

এই কথায় মাখন-বাবু ভারী সন্তুষ্ট হইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ, ঘিউ বিন্ পোলাও! বন্‌মালী-বাবু, বেলা পাক্কা রসুইয়া, ঘিউ বিন্ পোলাও আপনাকে খিলাচেছ।"

আমি বলিলাম, "না, এতে স্নেহ পদার্থের কিছু কমি নেই, আপনারা যে স্নেহদান করেছেন তাতেই পোলাও সরস স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে, আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়েছে, কোথাও কিছু অভাব নেই।"

আহার সমাপন করিয়া আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একদিনের পরিচিতকে বিদায় দিতে সমস্ত পরিবার আজ বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একদিনের আতিথ্যের পর বিদায় লইতে আমারও চিত্তে ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছিল। আজ কুন্দ পর্য্যন্ত মুখ বন্ধ করিয়াছে; মাখন-বাবুর উজ্জ্বল প্রফুল্ল চক্ষু দুটিও নিষ্প্রভ হইয়াছে, বেলার স্নিগ্ধ দৃষ্টি প্রতিক্ষণে আর্দ্র হইয়া উঠিতেছে। আমি কুন্দকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "যাই মা।" কুন্দ করুণনেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আবার কবে আসবেন?" এ প্রশ্নের কি উত্তর দিব? এ জন্মে কখনো দেখা হইবে কি না কে জানে?

শিক্ষায় শিল্পের স্থান

নন্দলাল বসু

[ইনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে মুঙ্গের জেলার খড়্গপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে ইনি সরকারী আর্ট স্কুলে প্রবেশ করেন। আর্ট স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিয়াও ইনি অবনীন্দ্রনাথের সহায়তায় দীর্ঘকাল শিক্ষার্থিরূপে শিল্পসাধনায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯২০ হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতায় 'সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট'-এর শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করেন। অতঃপর ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত আছেন। আধুনিক কালে ভারতীয় চিত্রকলার সাধকদের মধ্যে ইঁহার নামই সর্ব্বাগ্রগণ্য।]

মানুষ আনন্দ পাবার জন্য এবং জ্ঞান অনুশীলনের জন্য যত রকম উপায় উদ্ভাবন করেছে, তার মধ্যে ভাষা একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা চল্‌ছে ভাষাকেই বাহন ক'রে। সাহিত্য মানুষকে আনন্দ দেয়, কিন্তু তার প্রকাশের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ; তার সেই অভাব পূরণ কর্‌ছে শিল্প, সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি কলা। সাহিত্যের যেমন একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে, তেমনি শিল্প, সংগীত, নৃত্যেরও আছে। মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে, মন দিয়ে বহির্জগতের সকল বস্তুর তত্ত্ববোধ ও রসবোধ করে এবং শিল্পে তা অপরের কাছে প্রকাশ করে; শিক্ষার ক্ষেত্রে কলাশিল্পের চর্চার দ্বারা মানুষের তত্ত্ববোধ ও রসবোধের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং শিল্পের প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত হয়। চোখের কাজ যেমন কানের দ্বারা হয় না, তেমনি ছবি, গান ও নাচের শিক্ষা কেবল লেখাপড়ার দ্বারা সম্ভব নয়।

আমাদের শিক্ষাদানের আদর্শ যদি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদান হয়, তবে কলাচর্চার স্থান এবং মান বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে সমান থাকা উচিত। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দিক্ দিয়ে এ পর্যন্ত যা ব্যবস্থা হ'য়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এর কারণ আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, শিল্পচর্চা একদল পেশাদার শিল্পীরই একচেটিয়া কারবার, সাধারণের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। শিল্প না বোঝার জন্য অনেক শিক্ষিত লোকও অগৌরব বোধ করেন না—আর জনসাধারণের তো কথাই নেই, তারা ফোটো ও ছবির তফাতটাও বোঝে না; জাপানী খোকা-পুতুলকে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে ক'রে অবাক্ হ'য়ে থাকে; বিশ্রী-রঙ-করা লাল নীল বেগুনি জর্মান র‍্যাপার দেখতে চোখের পীড়া-বোধ তো করেই না, বরঞ্চ উপভোগ ক'রেই থাকে; সহজপ্রাপ্য সস্তা মাটির কলসীর বদলে প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে টিনের ক্যানেস্ত্রা ব্যবহার করে। এর জন্য দায়ী দেশের শিক্ষিতসমাজ এবং প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়। আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যার ক্ষেত্রে দেশবাসীর সংস্কৃতি যেমন বাড়ছে ব'লে মনে হয়, রস-বোধের দৈন্যও তেমনি ক্রমশঃ পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছে। এর প্রতিকারের উপায় তথাকথিত শিক্ষিতসমাজে কলাশিক্ষার ব্যাপকভাবে প্রচলন করা; কারণ, এই শিক্ষিতসমাজই জনসাধারণের আদর্শস্বরূপ।

সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যে কেবল রসের ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয় তা নয়, তার মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়েও সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌন্দর্য-জ্ঞানের অভাবে যাঁরা বাড়ীর উঠানে ও ঘরের মধ্যে জঞ্জাল জড়ো ক'রে রাখেন,

নিজের দেহের এবং পরিচ্ছদের ময়লা সাফ করেন না, ঘরের দেয়ালে পথে ঘাটে রেলগাড়িতে পানের পিক ও থুথু ফেলেন, তাঁরা যে কেবল নিজেদেরই স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেন তা নয়—জাতির স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করেন। তাঁদের দ্বারা যেমন সমাজদেহে নানা রোগ সংক্রামিত হয়, তেমনি তাঁদের কুৎসিত আচরণের কু-আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের মধ্যে এক দল আছেন যাঁরা কলাচর্চায় বিলাসী ও ধনী ব্যক্তিরাই একমাত্র অধিকারী ব'লে মনে ক'রে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে অবজ্ঞাভরে তা নির্বাসিত ক'রে রাখতে চান। তাঁরা ভুলে যান যে, সুষমাই শিল্পের প্রাণ, অর্থমূল্যে শিল্পবস্তুর বিচার চলে না। গরিব সাঁওতাল তার মাটির ঘরটি নিকিয়ে মুছে মাটির বাসন ও ছেঁড়া কাঁথা গুছিয়ে রাখে। আবার, কলেজে-পড়া অনেক শিক্ষিত ছেলে প্রাসাদোপম হোস্টেলের বা মেসের ঘরে দামী কাপড়জামা তৈজসপত্র এলোমেলো ছড়িয়ে জবরজঙ্গ ক'রে রাখে। এখানে দেখা যাচ্ছে দরিদ্র সাঁওতালের সৌন্দর্যবোধ তার জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত ও প্রাণবন্ত, ধনিসন্তানের সৌন্দর্যবোধ পোশাকি এবং প্রাণহীন। ক্যালেণ্ডারের মেমসাহেবের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো হ'য়ে শিক্ষিত লোকের ঘরে সত্যকার ভালো ছবির পাশে স্থান পেয়েছে, দেখতে পাই। ছাত্রমহলে দেখি, ছবির ফ্রেম থেকে জামা ঝুলছে, পড়ার টেবিলে চায়ের কাপ, আর্শি, চিরুনি ও কোকোর টিনে কাগজের ফুল সাজানো। প্রসাধনে কাপড়ের উপর বুকখোলা কোট, শাড়ীর সঙ্গে মেমসাহেবি ক্ষুরওলা জুতো—এরূপ সর্বত্রই সুষমার অভাব, আমাদের বিত্ত থাক আর না-থাক, সৌন্দর্যবোধের দৈন্য সূচিত করে।

আবার আর একদল লোক আছেন যাঁরা বলেন, "আর্ট ক'রে কি পেট ভর্‌বে?" এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। ভাষাচর্চার যেমন দুটো দিক্ আছে—একটা আনন্দ ও জ্ঞানের দিক্, আর-একটা অর্থলাভের দিক্, তেমনি শিল্পচর্চারও দুটো দিক্ আছে—একটা আনন্দ দেয়, আর-একটা অর্থ দেয়। এই দুটি ভাগের নাম চারুশিল্প ও কারুশিল্প। চারুশিল্পের চর্চা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারুশিল্প আমাদের নিত্য-প্রয়োজনের জিনিসগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর ক'রে তোলে তাই নয়,

অর্থাগমেরও পথ ক'রে দেয়। কারুশিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক দুর্গতির আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং, প্রয়োজনের ক্ষেত্র থেকে শিল্পকে বাদ দেওয়া জাতির পক্ষে অর্থাগমের দিক্ দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর।

শিল্পশিক্ষার অভাব যে শুধু আমাদের বর্তমান জীবনযাত্রা অসুন্দর ক'রে তুলেছে তাই নয়, আমাদের অতীত যুগের রসস্রষ্টাদের সৃষ্ট সম্পদ্ থেকেও আমাদের বঞ্চিত ক'রেছে। আমাদের চোখ তৈরি হয় নি, তাই দেশের অতীত গৌরব যে চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তা এতদিন আমাদের কাছে অবোধ্য ও অবজ্ঞাত ছিল, বিদেশ থেকে সমঝদার আসবার প্রয়োজন হ'ল সেগুলি আবার আমাদের বুঝিয়ে দিতে। আধুনিক যুগের শিল্পসৃষ্টিও বিদেশের বাজারে যাচাই না হ'লে আমাদের দেশে আদৃত হয় না, এ আমাদের লজ্জার কথা।

এর প্রতিকারের সম্বন্ধে এইবার মোটামুটি ভাবে আলোচনা করা যাক। শিল্পশিক্ষার গোড়ার কথা হচ্ছে—প্রকৃতিকে এবং ভালো ভালো শিল্পবস্তুকে শ্রদ্ধার সহিত দেখা, সে-সবের সঙ্গ করা এবং সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়েছে এমন লোকের সঙ্গে আলোচনা ক'রে শিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য—প্রত্যেক স্কুলে ও কলেজে অন্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষার স্থান রাখা, শিল্পকে পরীক্ষাগ্রহণকালে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণ্য করা এবং প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যাতে পরিচয় ঘটতে পারে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও অবকাশ রাখা। অঙ্কনপদ্ধতি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বাড়বে; ফলে, তারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সত্য-দৃষ্টি লাভ করবে। বিদ্যালয়ে কাব্যচর্চার ব্যবস্থা আছে কিন্তু কাব্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করলেই কেউ বড় কবি হন না, তেমনি বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার আয়োজন থাকলেই যে সকল ছেলে শিল্পী হবে এবং ভালো শিল্প সৃষ্টি ক'রতে পারবে, এমন আশা করা অবশ্য ভুল হবে।

প্রথমতঃ, ছেলেদের বিদ্যালয়ে, গ্রন্থাগারে, পড়ার ঘরে এবং বাসগৃহে কিছু কিছু ভালো ছবি, মূর্তি এবং অন্যান্য চারুশিল্প ও কারুশিল্পের নিদর্শন (অভাবে ঐ-সকলের ভালো ফোটো বা প্রতিচ্ছবি) সাজিয়ে রাখতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, ভালো ভালো শিল্পনিদর্শনের ছবি ও ইতিহাস-দেওয়া সহজ-বোধ্য ছেলেদের বই উপযুক্ত লোক দিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখাতে হবে।

তৃতীয়তঃ, ছায়াচিত্রের সাহায্যে মাঝে মাঝে স্বদেশের ও বিদেশের বাছাই-করা ভালো ভালো শিল্পবস্তুর সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

চতুর্থতঃ, মাঝে মাঝে উপযুক্ত শিক্ষকের সঙ্গে গিয়ে ছেলেরা নিকটস্থ যাদুঘর বা চিত্রশালায় অতীত শিল্পকীর্তির নিদর্শন দেখে আসবে। বিদ্যালয় থেকে ফুটবল ম্যাচ খেলতে যাওয়ার ব্যবস্থা যখন হ'তে পারে, তখন চিত্রশালা বা যাদুঘর দেখে আসাও অসম্ভব হবে না। এ কথা মনে রাখতে হবে—একটা ভালো শিল্পবস্তু নিজের চোখে দেখলে এবং বুঝলে শিল্পদৃষ্টি যতটা উন্মীলিত হয়, একশোটা বক্তৃতা শুনলে তা হয় না। ভালো ছবি, ভালো মূর্তি ছোটো-বেলা থেকে দেখতে দেখতে কিছু বুঝে কিছু না-বুঝে ছেলেদের চোখ তৈরি হবে, পরে আপনা থেকেই তাদের শিল্পের ভালোমন্দ বিচার করবার শক্তি জন্মাবে এবং ক্রমশই সৌন্দর্যবোধ জাগরিত হবে।

পঞ্চমতঃ, প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের যোগসাধন করবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করতে হবে। সেই আয়োজনের মধ্যে থাকবে সেই সেই ঋতুর ফুলফলের সংগ্রহ এবং শিল্পে ও কাব্যে সেই সেই ঋতু সম্বন্ধে যে-সমস্ত সুন্দর সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে ছেলেদের যত দূর সম্ভব পরিচয় ঘটাবার ব্যবস্থা।

ষষ্ঠতঃ, প্রকৃতিতে যে ঋতু-উৎসব চলছে তার সঙ্গে ছেলেদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শরতের ধানক্ষেত ও পদ্মবন, বসন্তে পলাশ-শিমুলের মেলা তারা যাতে নিজের চোখে দেখে আনন্দ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ ক'রে শহরবাসী ছেলেদের জন্য এ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক; গ্রামের ছেলেদের এ দিকে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলেই চলবে। এই-সব ঋতু-উৎসবের জন্য বিশেষভাবে ছুটি দিয়ে বনভোজনের এবং ঋতু-উপযোগী বেশ-ভূষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে যোগসাধন একবার হ'লে, প্রকৃতিকে সত্যকার ভালোবাসতে শিখলে, ছেলেদের অন্তরে রসের উৎস আর কখনও শুকোবে না; কারণ, প্রকৃতিই যুগে যুগে শিল্পীকে শিল্পসৃষ্টির উপাদান জুগিয়ে এসেছে।

শেষ কথা এই যে, বৎসরের কোনো-এক সময়ে বিদ্যালয়ে একটি শিল্পসৃষ্টির উৎসব করতে হবে। তাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কিছু না কিছু শিল্পবস্তু নিজের

হাতে তৈরি ক'রে এনে শ্রদ্ধার সঙ্গে যোগ দেবে—তা সে শিল্পবস্তু যতই সামান্য হোক। ছেলেদের সৃষ্ট শিল্পবস্তুগুলি উৎসবের অর্ঘ্যরূপে সংগৃহীত হ'য়ে সাজানো থাকবে। নৃত্যগীত, শোভাযাত্রা প্রভৃতির দ্বারা উৎসবটিকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর ক'রে তোলবার চেষ্টা করা দরকার। উৎসবের নির্দিষ্ট একটা কাল-নির্দ্ধারণ করা শক্ত। দেশভেদে সেটা বদ্‌লাবে। বাংলাদেশে এ বিষয়ে শরৎকালই প্রশস্ত ব'লে মনে হয়।

প্রদীপ ও পতঙ্গ

এস. ওয়াজেদ আলি

[এস. ওয়াজেদ আলি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আলিগড় হইতে বি.এ. পরীক্ষা পাস করিয়া য়ুরোপে গমন করেন এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বি.এ. অনার্স পরীক্ষা পাস করেন। পরে ইনি ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রসমূহে ইনি নিয়মিতভাবে প্রবন্ধাদি লিখিয়া সাহিত্য-সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইঁহার গল্প-পুস্তক 'গুলদস্তা,' 'মাশুকের দরবার,' 'দরবেশের দোয়া' প্রভৃতি পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে।]

তখন অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিল। বাড়ীর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আমি একা পাঠাগারে ব'সে লিখছিলুম। টেবিলে বড় একটি মোমবাতি জ্বল্‌ছিল। তার শিখা জলন্ত আগুনের ফোয়ারার মত কেঁপে কেঁপে আকাশের দিকে উঠ্‌ছিল।

হঠাৎ আমার লেখার কাগজের উপর ছোট একখণ্ড মেঘের মত কালো একটা ছায়া এসে উড়ে বেড়াতে লাগ্‌লো। মনে বড় কৌতূহল হ'লো—আমি চোখ তুলে চাইলুম।

দেখলুম একটি পতঙ্গ বাতির চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাল ক'রে একবার ঝাঁপ দিয়ে পড়ে---এই যেন তার ইচ্ছে।

ভাবলুম এই অসহায় প্রাণীটি কি নির্ব্বোধ। কোথায় পৈতৃক প্রাণ নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে ঘুরে-ফিরে বেড়াবে, তা নয় জলন্ত এই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেবার জন্যেই যেন ও পাগল। আগুনে একবার পড়লে কিন্তু আর ওকে ফিরতে হবে না, ঘোরা-ফেরা সবই শেষ হ'য়ে যাবে।

বেচারার জন্যে প্রাণে আমার বড় মমতা হ'লো। ভাবলুম, নির্ব্বোধ ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ মাত্র, ভালমন্দবিচারের ক্ষমতা নেই। জোর ক'রেই ওকে আগুন থেকে বাঁচানো দরকার।

অতি সাবধানে আমি পতঙ্গটিকে নিজের হাতের মধ্যে নিলুম। সে যে পালাবার চেষ্টা করছিল ব'লে আমার এই সাবধানতা তা নয়—সে তো তখন আগুনের পিছনেই পাগল। কেউ তাকে ধরতে যাচ্ছে কি না—সেদিকে তার লক্ষ্যমাত্র ছিল না। সাবধান আমাকে হ'তে হ'লো তাকে কোন আঘাত যেন না লাগে এইজন্যে; অন্য কোন কারণে নয়।

বাতি থেকে দূরে নিয়ে তাকে জান্‌লার চৌকাঠের ওপর বসিয়ে দিলুম। ভাবলুম প্রলোভন থেকে দূরে সরিয়েছি, এবার তার সুবুদ্ধি আস্‌বে, এবার সে বাইরের বাগানে চ'লে যাবে, নির্ব্বিঘ্নে সেখানে তার ক্ষুদ্র জীবনটি কাটাবে; আর কিছু হোক না হোক আগুনে পুড়ে মরার যাতনা থেকে তো অন্ততঃ অব্যাহতি পাবে। টেবিলে ফিরে আবার নিশ্চিন্ত মনে লেখায় মনোনিবেশ করলুম।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই কিন্তু সেই কালো ছায়াটা পুনরায় আমার লেখার কাগজের ওপর ছুটোছুটি করতে লাগলো। চোখ তুলে চাইলুম। সেই বোকা পতঙ্গটি ফিরে এসেছে।

মনে বড় রাগ হ'লো। কি নিরেট বোকা। আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে কত চেষ্টা ক'রে দূরে ওকে জান্‌লার চৌকাঠে রেখে এলুম—আবার ফিরে এসেছে হতভাগা এই আগুনে পুড়ে ম'রতে। তারপর ভাবলুম, যাক রাগ ক'রে আর কি হবে? কতটুকুই বা ওর বুদ্ধি। যাই এবার ঘরের বাইরে বাগানে ওকে রেখে আসি। সেখান থেকে হয়তো আর ফির্‌বে না।

তাই করলুম। সাবধানে হাতের মধ্যে নিয়ে ঘরের বাইরে বাগানে পতঙ্গটি ছেড়ে দিয়ে এলুম। ভাবলুম, ইচ্ছে থাকলেও এবার আর ফিরতে পারবে না। পুনরায় নিজের কাজে মনোনিবেশ করলুম।

কি আপদ্‌। আবার সেই কালো ছায়াটা এসে আমার লেখার ওপর উড়তে লাগলো। এবার মেজাজ আমার ভয়ানক চ'টে গেল। বাঁচার পথ খোলা থাক্‌তেও জোর ক'রে এসে আগুনে পুড়ে মরতে চায় এমন জীব তো কোথাও দেখিনি। একবার ভাবলুম মরুক গে যাক, ওর জন্যে ভেবে আর কি হবে? তারপর কিন্তু মনে হ'লো অবোলা প্রাণীটির ওপর রাগ করা শোভা পায় না। একটা গেলাস চাপা দিয়ে রাতের মত বেচারাকে বন্ধ ক'রে রাখি, সকালে ছেড়ে দিলে নির্বিঘ্নে কোথাও চ'লে যাবে।

এবার পতঙ্গটি ধ'রে তার ওপর একটি কাচের গেলাস উপুড় ক'রে রাখলুম। মনে মনে বেশ একটু আত্মতুষ্টি অনুভব করলুম—যা হোক্‌ একটা সৎকাজ করা গেল, একটা অবোলা প্রাণীর জীবন রক্ষা করা হ'লো।

নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মনে এবার লেখায় মনোনিবেশ করলম। দু'চার ছত্র লিখেছি মাত্র, এমন সময়ে একটা করুণ অথচ অস্পষ্ট ক্রন্দনের ধ্বনি আমার কর্ণপটে এসে আঘাত করতে লাগলো। চম্‌কে চোখ তুলে চাইলুম। কি অদ্ভুত মোহাবেশ। সেই পাগল পতঙ্গটি গেলাসের দুর্ভেদ্য কারাগারের গায়ে তার ছোট ছোট পাখ্‌না দিয়ে অবিরাম আঘাত করছিল; আর ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে করুণ সুরে কাঁদছিল।

সমবেদনায় মনটা আমার ভ'রে গেল। যত্নে গেলাসের কারাগার থেকে বের ক'রে পতঙ্গটিকে আবার হাতে তুলে নিলুম। স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "ওরে অবুঝ পতঙ্গ, তোকে বাঁচাবার জন্য আমি এত ফন্দী-ফিকির করছি, তোর আগুনে পুড়বার জন্য এত আগ্রহ কেন বল্‌ দেখি? পোড়ার যন্ত্রণা যে অতি ভীষণ, ওরে হতভাগা। একবার ছেলেবেলায় আমার হাত আগুনে পুড়ে গিয়েছিল, সেই থেকে আগুন দেখ্‌লেই গা আমার কাঁটা দিয়ে ওঠে। তোর ক্ষুদ্র প্রাণে কি একটুও ভয়ডর নেই যে, তুই সেই আগুনে পুড়বার জন্য ছটফট করছিস্‌?"

মানুষের ভাষায় একান্ত মিনতির স্বরে পতঙ্গ বল্‌লে—ওগো দয়ার সাগর, আমায় বাঁচাবার চেষ্টা আর ক'রো না। আমি পাগল, আগুনে পুড়েই আমায় ম'রতে দাও। আমার মনের কথা ঠিক বোঝ না ব'লেই আমায় তুমি আট্‌কে রেখেছ। আগুনে পুড়বার জন্যেই আমি জন্মেছি, কেবল বেঁচে থাক্‌বার জন্যে আমার জন্ম হয়নি। আগুনে না পুড়লে আমার এই পতঙ্গ-জীবনই বৃথা যাবে।

তুমি মনে কর আগুনে পুড়লে ভারী আমার কষ্ট হবে। এ তোমার মস্ত ভুল। এত বড় বিদ্বান্ তুমি, আর এই সোজা কথাটা বুঝ্‌লে না, পুড়তে যদি সত্যই আমার দুঃখ হ'তো, তা-হ'লে পুড়তে আমি যেতুম কেন?

তুমি মনে কর, আগুন থেকে বাঁচিয়ে তুমি আমার মস্ত উপকার ক'রেছ। পণ্ডিতমশাই, এও তোমার ভুল। যত দিন আগুন থেকে দূরে থাক্‌ব, ততদিন প্রাণ আমার যাতনায় কেবল ছট্‌ফট্ করবে, আর ততদিন আমাকে দিয়ে প্রকৃত কোন কাজও হবে না। আমারও না, অন্যেরও না। তুমিই বল দেখি, অমন বেঁচে থাকায় আমার লাভ কি? জীবনধারণ করলেই তো আর বাঁচা হয় না।

ওগো দরদী বন্ধু, দয়া ক'রে আমায় ছেড়ে দাও। আগুনের ঐ শিখায়—সৌন্দর্য্যের ঐ উৎসে আমায় ঝাঁপ দিতে দাও। ঐ দেখ কি প্রাণ-মাতানো রূপের ছটায় বিশ্বে আলোকের অপরূপ লহর তুলে সে আমায় ডাক্‌ছে। ঐ দেখ, নৃত্যের সহস্র ভঙ্গিমায় হেলে দুলে আমায় সে বল্‌ছে—"ওহে প্রেমিক আমার, আমার রূপের এই অনন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে জীবন তোমার সার্থক কর। তোমার প্রেমের ইন্ধনে আমার রূপের শিখাকে আরও উজ্জ্বল ক'রে তোল। এস, তোমাতে আমাতে মিলে, প্রেমিকে আর প্রেমাস্পদে মিলে, সম্মিলিত মহিমায় বিশ্বকে একবার চমকে দিই।"

পতঙ্গ স্তব্ধ হ'ল। বুঝলুম পাগলকে আট্‌কে রেখে কোন লাভ হবে না। আগুনে পুড়বার জন্যেই ওর জন্ম হয়েছে, আগুনে পুড়েই বিধাতার দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য সে পূর্ণ করবে।

যাও বাছা, অন্তর যে পথে তোমায় নিয়ে যায়, সেই পথেই তুমি যাও। আমার আশীর্ব্বাদ, ভগবান্ তোমার জীবন সার্থক করুন। পতঙ্গটিকে আমি

তার গেলাসের কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলুম। পাগলের মত সেই অগ্নি-শিখায় ঝাঁপ দিয়ে সে পড়লো। ক্ষণিকের তরে অগ্নিশিখা বর্দ্ধিত তেজে জ্বলে উঠ্‌লো। পরমুহূর্ত্তে পতঙ্গের প্রাণহীন দেহ টেবিলের উপর এসে পড়লো।

ঠং ক'রে দেওয়ালের ঘড়িতে রাত একটা বাজার শব্দ শোনা গেল। আপন মনে আমি বল্‌লুম—লেখা বাকী আছে, এখন শুতে গেলে চল্‌বে না। পতঙ্গের কাছে আমিই বা হার মান্‌বো কেন? আমি আমার পাগলামিতে, অর্থাৎ লেখার কাজে মনোনিবেশ করলুম।

সুন্দরবনে

শেখ হবিবর রহমান

[শেখ হবিবর রহমান যশোহর জেলার ঘোষগাতি নামক গ্রামে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিক্ষাবিভাগে কর্ম্ম করিতেন—ইদানীং ব্যারাকপুর সরকারী স্কুল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ছাত্রজীবন হইতেই ইনি সাহিত্যসেবা করেন। ইনি বহু কাব্য, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, জীবনী, ঐতিহাসিক নিবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থগুলির মধ্যে শেখ সা'দীর গুলিস্তান ও বুস্তানের সরস অনুবাদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।]

সুন্দরবনে শিবশা ও পশর নদী যেখানে মিলিত হইয়াছে তাহাকে বলে নীলকমলের মোহনা। মাঝিরা বলে :—

শিবশা গহীন নদী সর্ব্বলোকে কয়,
বিনা বাতাসে পানি গাছের আগায় বয়।

শিবশার সঙ্গে বিশাল নদ পশর মিলিত হইয়াছে এখানে।

একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর
শিবশার সাথে হেথা মিলেছে পশর।

এইস্থানে যে কল্পনাতীত দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, জীবনে তাহা কখনই ভুলিব না। যে দিকে তাকাও শুধু জল আর জল। জল ও আকাশ ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যাইতেছিল না ; পশ্চিমদিকে বহু দূরে বনের সামান্য কৃষ্ণরেখা। ভূগোলে পড়িয়াছিলাম পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও একভাগ স্থল, এখানে আসিলে এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। এই অনন্ত বিশাল জলরাশি ; ইহার মধ্যে কত জীবনমরণের রহস্য লুক্কায়িত আছে কে জানে? পয়ঃ-প্রকৃতির কত গুহ্য লীলাই এখানে না চলিতেছে। কেহ তাহা দেখে না, কেহই তাহা জানে না! চারিদিকে স্তব্ধ অতিবৃদ্ধ বিশাল বৃক্ষরাজি মহাকালের নীরব সাক্ষীর মত গম্ভীরভাবে কোন্ আদিম যুগ হইতে এই সলিলের খেলা দেখিতেছে। মনে মনে ভাবিলাম, চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে বহিতে থাকে, তখন এখানে কি প্রলয়ের খেলাই না আরম্ভ হইয়া যায়! পবন আর বরুণের সে মহাযুদ্ধ কোন্ মানব দেখিতে আসিতেই বা সাহসী হইতে পারে? অসংখ্য দৈত্যদানবের লীলাভূমি এই সুন্দরবন। সেই প্রলয় তাণ্ডব তাহাদেরই উপভোগের জন্য, ক্ষীণপ্রাণ মানবের জন্য নয়।

প্রায় এক ঘণ্টায় চৌমোহনা পাড়ি দিয়া আমরা পশরে আসিয়া পড়িলাম। ক্রমে 'আগুনজল' নামক স্থানে আমরা বেলা প্রায় চারিটার সময়ে আসিয়া নঙ্গর করিলাম। এই স্থলে আসিয়াই আমি সর্ব্বপ্রথমে কাননপ্রকৃতির সুন্দর দুলাল কুরঙ্গকুলের স্বচ্ছন্দ লীলাবিহারের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার প্রথম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। ক্ষুদ্রবৃহৎ শতাধিক হরিণ বৃক্ষতলে তৃণাস্তৃত ভূমিতে স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে।—যেন বনবিবি তাঁহার বনের শিশুগুলির জন্য এই স্নিগ্ধ শ্যামল শান্তিনিকেতন রচনা করিয়া অগাধ মাতৃ-বাৎসল্যের পরিচয় দিতেছেন। সুন্দরবনে ভীষণ ব্যাঘ্রের পাশাপাশি এত নিশ্চিন্তভাবে অন্য কোনও জীবই চরিয়া বেড়াইতে পারে না। ব্যাঘ্র অপেক্ষা দ্রুততর গতি ও অধিকতর সতর্কতা এই দুইটি প্রকৃতিদত্ত শক্তিই হরিণদের প্রধান সম্বল। স্থানে স্থানে দুইচারিটি বানরকেও ইহাদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। ইহারা যেন রাখাল হইয়া হরিণদের চরাইতেছে। লোকালয়ে দেখি দুই চারিজন চতুর লোক শত শত সরলপ্রকৃতির লোককে চরাইয়া খায়, সুন্দরবনে তাহারই যেন অভিনয় চলিতেছে। দেখিলাম, কেহ

কেহ তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘোড়দৌড় খেলিতেছে। 'বাঁদরের বাঁদরামি' সর্ব্বত্রই সমান। দু'চারিটি শৃঙ্গধারী কুরঙ্গরাজ মাথা উঁচু করিয়া আমাদের দিকে আয়তলোচনে চাহিয়াই রহিল—তাহাদের দৃষ্টিতে নীরব প্রশ্ন—"তোমরা কি চাও?" কেহ কেহ অতি বিজ্ঞের মত আমরা কোন্ জাতীয় জীব সেই সমস্যার সমাধানে যেন নিরত ছিল। মানুষকে তাহারা ভয় করিতে শিখে নাই। কেহই ভয়ে পলাইল না।

বঙ্গোপসাগর-কূলে দুর্ব্বার চটি আমাদের শেষ লক্ষ্যস্থল। রাত্রিতে আমাদের নৌকা ছাড়া হইল।

বেলা প্রায় দশটার সময়ে সমুদ্র আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। পূর্ব্বদিকে আমবাড়িয়ার চরে নানাজাতীয় বৃক্ষরাজি ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া কুসুমিত-লোচনবৃন্দে যেন অনন্তের শোভা দেখিতেছিল। সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত বিশাল বঙ্গোপসাগর ধূ ধূ করিতেছে। সাগরের মধ্যে দু'চারিখানি নৌকা বহুদূরে যেন মোচার খোলার মতো ভাসিতেছিল। শুনিলাম, মঘেরা এইস্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা গাড়িয়াছে; এই আড্ডায় তিন-চারি হাজার মঘ বাস করে। মনে হইল আমাদের দেশের ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, তাহা হইলে বেকার-সমস্যা-সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনবৃদ্ধির সহায়তা হইতে পারে। বঙ্গোপসাগরে অজস্র মৎস্য। বিধাতা আমাদের বাড়ীর নিকটেই অগাধজলে অগাধ সম্পদ্ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা তাহার উদ্ধারের জন্য কোনরূপ চিন্তা বা চেষ্টাই করিতেছি না।

নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি দেশে মাছধরা একটি বিরাট ব্যবসায়—অসংখ্য লোকের উপজীবিকা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশের লোকেরা এ সম্বন্ধে কোনই চিন্তা করে না। মৎস্যের কাঁটা হইতে নানা শিল্পদ্রব্য এবং চর্ব্বি হইতে ঔষধাদি প্রস্তুত হইতে পারে। এখানকার মঘ-ধীবরেরা মৎস্য শুষ্ক করিয়া দেশ-বিদেশে চালান দিয়া থাকে; ইহাতে মৎস্যের স্বাদ বিকৃত হইয়া যায়, ইহার উপকারিতাও অনেকাংশে কমিয়া যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মৎস্য-রক্ষণের ব্যবস্থা করিলে দীর্ঘকালের মধ্যেও ইহার স্বাদ বা উপকারিতা কম হয় না। সে চেষ্টা আজিও হয় নাই।

অতঃপর আমরা ক্ষুদ্র একটি খাল বাহিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম। দুই পার্শ্বেই নিবিড় বনভূমি শোভা পাইতে লাগিল; স্থানে স্থানে মাটির ভিতর ইটের স্তূপ পরিদৃষ্ট হইল। কবে কাহারা এই সুদূর দক্ষিণদেশে সমুদ্রের ধারে বাস করিত, তাহাদের কথা আজ কেহই জানে না। কিন্তু এখনও তাহাদের অস্তিত্বের চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। সুন্দরবনের স্থানে স্থানে এইরূপ মানববসতির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, এই সমস্ত অঞ্চলে দস্যু-তস্করেরা অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার সহিত বাস করিত। সেগুলি তাহাদেরই বসতির চিহ্ন। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন—বহুপূর্ব্বে সুন্দরবনে বহু পুরজনপদ ছিল। কালক্রমে মাটি নিম্ন হইয়া যাওয়ায় সেগুলি ধ্বংস পাইয়াছে।

সম্মুখে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী। ভাটায় জল কমিয়া যাওয়ায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নৌকা-চলাচলের উপায় নাই। আমাদের নৌকায় বন্দুক নাই; চতুর্দ্দিকে বেশ শক্ত কাঠের বেড়া আছে বটে, কিন্তু ব্যাঘ্ররাজ যদি হুপ্ করিয়া ইহার উপর নিপতিত হন, তাহা হইলে এই বেড়াটা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে তাঁহার এক থাবার আঘাতের অধিক আবশ্যক হইবে না। পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—সুন্দরবনে আসিয়াছি অথচ সঙ্গে বন্দুক নাই। যে ডিঙ্গি পানীয় জলের জন্য আগে চলিয়া গিয়াছিল বন্দুক সে ডিঙ্গিতে ছিল। তবু আত্মরক্ষার জন্য এই নৌকাতেও বন্দুক সঙ্গে রাখা উচিত ছিল।

কল্য রাত্রির পর আমাদের আর আহার হয় নাই। বেলা প্রায় পাঁচটা বাজে; এক গণ্ডূষ জল পর্য্যন্ত নৌকায় নাই। সকলেই ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ও উদ্বেগে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা আমরা তখন ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমাদের নৌকায় তবু যেমন তেমন একটি বেড়া আছে। কিন্তু আমরা জল আনিবার জন্য যে ডিঙিখানি পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে ত' কিছুই নাই। তবে ডিঙ্গিতে বন্দুক ছিল।

সুন্দরবনের এই অংশের, এই সমুদ্রোপকূলের ব্যাঘ্র যেমন হিংস্র তেমনি নির্ভীক। তাহারা বন্দুকধারী মানুষকেও বড় একটা গ্রাহ্য করে না। অন্যস্থানের বাঘ তাড়াহুড়া করিলে সভয়ে সরিয়া যায়, কিন্তু ইহারা নাকি আগাইতে জানে, পিছাইতে জানে না। লোকে বলে, ক্রমাগত সমুদ্রগর্জন-শ্রবণে ইহাদের শ্রবণশক্তি লোপ পাইয়াছে। তাই তাড়ার কোন শব্দ ইহাদের কর্ণগোচর

হয় না। এ হেন ভীষণ ব্যাঘ্রসঙ্কুল স্থানে আজ আমাদের উভয় নৌকাই বিপন্ন! সুন্দরবনে পথ হারাইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। কারণ, সকল স্থানেই নদী, খাল ও বনের দৃশ্য প্রায় একই প্রকারের। আমরা অথবা আমাদের ডিঙ্গি পথ হারাইয়া থাকিলে পুনরায় সাক্ষাতের আশা সুদুরপরাহত।

আমরা ক্রমাগত "কু" দিয়া ডিঙ্গির সন্ধান লইতে লাগিলাম কিন্তু "কু"র কোনই উত্তর পাওয়া গেল না। সুন্দরবনে দূর হইতে চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিবার নিয়ম নাই ; কারণ, মনুষ্যকণ্ঠ-শ্রবণে ব্যাঘ্র মনুষ্যের সন্ধান পাইয়া শিকারে অগ্রসর হইতে পারে। অন্ধকারের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে ; কিন্তু উপায় নাই।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় তখন সকলেরই দেহমন একান্ত অবসন্ন। বিষম উদ্বেগে আমরা সকলেই অস্থির। সময় আর যায় না! ডি. এল. রায়ের রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যা নূতনভাবে আমাদের নৌকায় দেখা দিল। এখন খালে ধীরে ধীরে জোয়ারের জল প্রবেশ করিতেছিল, শনৈঃ শনৈঃ জল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। খালের স্রোত ফিরিয়া গেল। প্রায় ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমাদের নৌকা ভাসিয়া উঠিল। আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। একস্থানে আমাদের নৌকা আবদ্ধ হইল। উপরে বৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখা, নীচে কর্ত্তিত বৃক্ষ জলে পড়িয়া পথ অবরোধ করিয়া আছে। আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এই স্থানে আসিয়া থামিতে হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ খাল, খালের উপর হইতে আমাদের নৌকায় আসিতে ব্যাঘ্র মহারাজের একটুও অসুবিধা হইবার কথা নহে। প্রতি মুহূর্ত্ত আমাদের নিকট এক এক যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

দয়াময়ের অনুগ্রহে জোয়ারের জল বৃদ্ধি পাওয়ায় কিঞ্চিৎ বিলম্বে আমরা মুক্তি পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম, সম্মুখে মুক্ত প্রান্তর ; বেশ আলো। এখন আমাদের ডিঙ্গি নয়নপথে পতিত হইল। নৌকাচালক দুইজন অরক্ষিত নৌকায় থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া এতক্ষণ গাছের উপর উঠিয়া বসিয়া ছিল। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা নামিয়া আসিল।

আমরা দূর্ব্বার চটিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রিতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এইস্থানেই কাটাইতে হইবে। এরূপ ভয়ঙ্কর স্থান নাকি সমগ্র সুন্দরবনে

আর নাই। উত্তর-পূর্ব্বদিকে ভীষণ বন, নিরতিশয় নিবিড়। পশ্চিম-দক্ষিণকোণে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের মধ্যে মধ্যে কাশবন। স্থানে স্থানে ঢিবি, স্থানে স্থানে গর্ত্ত। এই সমস্ত কাশবনে ও গর্ত্তেই ব্যাঘ্রের থাকিবার স্থান। ইহারা সৌখিন বাবুদের মত অবসর-সময়ে এই মাঠে আসিয়া হাওয়া খায়, খেলা, করে। স্থানটি খেলার উপযুক্তই বটে। সবুজ দূর্ব্বাদলে আবৃত বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বনের পাশ দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিরাজমান। দূর্ব্বাদল জমাট বাঁধিয়া গালিচার মত কোমল ও পুরু হইয়া আছে। পা রাখিলে দিব্য আরাম অনুভূত হয়, দুই তিন আঙ্গুল ঘাসের মধ্যে পা দাবিয়া যায়।

আজ আর কেহই ডিঙ্গিতে শুইতে সাহসী হইল না। আমরা দশটি প্রাণী এই পানসীর মধ্যে সমস্ত দরজা জানালা অর্গলাবদ্ধ করিয়া শঙ্কার সহিত রাত্রি কাটাইলাম। বাহিরে নৌকার ছাদে বেশ জোরের সহিত হারিকেন জ্বলিতে লাগিল। সকলের বিশ্বাস যে, আলোর নিকটে বাঘ আসিতে ভয় পায়। সমস্ত দিন অনাহারজনিত অবসন্ন দেহে আমরা সন্ধ্যার সময়েই শুইয়া পড়িলাম। ব্যাঘ্রসম্বন্ধে নানা চিন্তায় মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াও বাঘের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। কি এক বিভীষিকায় যেন আমাদের সমগ্র নৌকা ছাইয়া রহিল।

রজনী-প্রভাতে সকলে গাত্রোত্থান করিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল আমরা সকলেই খোশ মেজাজে বহাল তবিয়তে বাঁচিয়া আছি।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ঠিক বাঙ্গালা পল্লীর মাঠের মত এই দূর্ব্বার চটির মাঠ। তাহারই মধ্য দিয়া আমরা হাঁটিয়া চলিলাম। স্থানে স্থানে হরিণ চলিবার সঙ্কীর্ণ পথ। প্রথমেই আমরা ফুলঝুরির বাওড়ে প্রবেশ করিলাম। ইহা একটি মধ্যমাকার দীর্ঘিকার মত। জল শুকাইয়া গিয়াছে; মধ্যে ছোট ছোট গর্ত্ত, তাহাতে অল্প অল্প জল আছে। জলের নাম জীবন কেন, তাহা এই সামান্য নগণ্য জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। এই সুদূর সুন্দরবনের সমুদ্রোপকূলে এই জলটুকু সহস্র সহস্র লোকের জীবনরক্ষার কারণ-স্বরূপ হইয়া আছে। এ অঞ্চলে সুপেয় পানীয় জল পাইবার আর উপায় নাই। এদিকের সমুদ্রগামী এবং জঙ্গলস্থ যাবতীয় লোক এই স্থান হইতে জল গ্রহণ করে। বাওড়ের দক্ষিণপার্শ্বে একটি তালবৃক্ষ। এ অঞ্চলের আর কোথাও

তাল বা ঐ জাতীয় বৃক্ষ নাই। যেন সে যুগ যুগ কাল একপায়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে যোগীর ন্যায় কি এক মহাধ্যানে নিমগ্ন আছে, আর ইঙ্গিতে তৃষ্ণার্ত্ত শ্রমক্লান্ত মানবসাধারণকে এই স্তূপের সলিলপূর্ণ জলাশয়ের সন্ধান বলিয়া দিতেছে।

আমরা ধীরে ধীরে সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী হইলাম। তখন জোয়ার আসিতেছিল; জোয়ারের সময়ে বিনা বাতাসেই সমুদ্রে বৃহৎ তরঙ্গ উঠে। সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিত জল লাফাইয়া লাফাইয়া উপরে উঠিতে থাকে। এই জোয়ারী তরঙ্গের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জলরাশি প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত গর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। দেখিয়া মনে হইল, যেন জলরাজ্যের একদল প্রবল সৈন্য স্থলভাগ জয় করিবার জন্য সমরোৎসাহে মাতোয়ারা হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে 'মার মার' শব্দে অগ্রসর হইতেছে। ইহার সম্মুখে পড়িলে বুঝি দুর্গের পাষাণ-প্রাচীরও চূর্ণ হইয়া যায়। বহুদূর হইতে ইহার গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া যায়। বায়ুপ্রবাহ না থাকা সত্ত্বেও আমরা নৌকা হইতে এই গর্জ্জন শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমরা দেখিতে পাইলাম, লোকালয় হইতে কত ছোটখাটো জিনিস ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রতীরে লাগিয়াছে। একস্থানে দেখিলাম, বাঙ্গালার বিষম উৎপাত কচুরিপানা শুকাইয়া আছে। বোধ হয়, লোনা জল খাইয়া তাহারা হজম করিতে পারে নাই; তাই অকালে কচুরি-লীলা শেষ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বিকালে আমরা আবার সমুদ্রতীরে ভ্রমণে বাহির হইলাম। সকলেরই হাতে এক একখানি লাঠি বা দা। বাঘ আসিলে ইহা লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে।

যে সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তি কাষ্ঠ, মধু, মৎস্য ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনে প্রবেশ করে তাহাদের নিকটে বন্দুক থাকে না; দা, কুড়াল বা লাঠি-ঠ্যাঙ্গা লইয়া এই হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য অধিবাসিগণ উদরের তাড়নায় ব্যাঘ্রভূমিতে প্রবেশ করে। অনেক সময়ে তাহারা ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িয়া যায়। তখন সকলে মিলিয়া হৈ চৈ করে ও লাঠি-ঠ্যাঙ্গা আস্ফালন করিতে থাকে। কোন কোন ব্যাঘ্র ইহাতে ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া যায়। দুই একটি কিন্তু আগন্তুকগণের পরিচয় লইবার জন্য সদম্ভে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন এই সমস্ত বনচারী মানবগণ বাঘের চোখে চোখ রাখিয়া দক্ষতার সহিত পিছাইয়া আসে।

বাঘের নাকি চক্ষুলজ্জাটা বড় বেশী ; চোখে চোখ রাখিতে পারিলে সে কিছুতেই কাহাকেও আক্রমণ করে না। তবে সেরূপ অবস্থায় বাঘের চোখে চোখ রাখাটাও সহজ ব্যাপার নহে। যেটুকু চক্ষুলজ্জা বাঘে দেখাইয়া থাকে, অনেক মানুষও কিন্তু তাহা দেখাইতে পারে না। চোখের সামনেই সে তাহার স্বজাতীয় মানুষের বুকে হাসিমুখে ছোরা মারিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না।

ব্যাঘ্র অত্যন্ত বলবান্ জন্তু হইলেও সে নেহায়েত কাপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে প্রায়ই গুপ্তভাবে শিকার ধরিয়া থাকে। অনেক সময়ে গাছ্ কাটিবার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঘ্র পা ফেলিয়া অগ্রসর হয়, যাহাতে কেহই তাহার পদশব্দ শুনিতে না পায়। কখন কখন সরীসৃপের ন্যায় বুকে ভর দিয়া অতি সন্তর্পণে সে শিকারের দিকে অগ্রসর হয়। আবার নদী বা খালের জলে ডুবিয়া শুধু নাসিকা জলের উপর ভাসাইয়া রাখিয়া সে কুমীরের মত কখন কখন শিকারের দিকে যাইতে থাকে। নিকটে গিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া খপ্ করিয়া শিকার ধরিয়া ফেলে। সে আর পলাইবার অবসর পায় না। তাই লোকে বলে, বাঘের তিনরূপ গতি, কখন সে বাঘ, কখন সাপ, আবার কখন কুম্ভীর। ব্যাঘ্র ছল-চাতুরীতে কম ওস্তাদ নহে। শিকারীর গুলি খাইয়া অনেক সময়ে সে মৃতের মত পড়িয়া থাকে ; শিকারী নিকটে গেলেই তাহাকে লম্ফ দিয়া আক্রমণ করে। অনেক দক্ষ শিকারীও ইহাদের এই চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া অকালে প্রাণ হারাইয়াছে। সুন্দরবনের বড় বড় নদী ইহারা অনায়াসে সাঁতরাইয়া পার হইয়া যায়। জল খাইবার অথবা মৎস্য শিকারের জন্যও ডাঙ্গার বাঘকে কুমীরের রাজ্যে অবতরণ করিতে হয়। জলের রাজা কুম্ভীর সুবিধা পাইলেই তখন ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। কুমীরের কাছে বনের রাজা বাঘের জারিজুরি খাটে না। বাঘের আর একটি শত্রু সাপ। বাঘের পক্ষে জলে কুমীর ডাঙ্গায় সাপ ভয়ের কারণ। বিষধর সর্পের দংশনে অনেক বাঘেরই রাজলীলার অবসান হয়। অজগর সাপ ঘুমন্ত বাঘকে জড়াইয়া ধরিয়া মারিয়া ফেলিতে পারে। অজগরের মরণ হয় হরিণ গিলিতে গিয়া। হরিণের শিঙ অজগরের গলায় আটকাইয়া যায়—তাহাতেই তাহার জীবনাবসান হয়।

ব্যাঘ্রের শরীরের ডোরা ডোরা দাগ বনের ঘাসপাতার ও রৌদ্রছায়ার সহিত এমনভাবে মিশিয়া থাকে যে, হঠাৎ ব্যাঘ্রের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। এইরূপে

প্রকৃতি তাহার দুর্দ্দান্ত শিশুর সহায়তা করিয়া থাকেন। তাই কেবলই মনে হইতে লাগিল দুই পাশের বনঝোপের মধ্যে মাতৃক্রোড়ের শিশুর মত ব্যাঘ্র কোথায় শায়িত আছে কে জানে?

আমরা সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে যাইবার সময়ে দেখিলাম, একদল লোক ফুলঝুরির বাওড় হইতে জল লইয়া নৌকা বোঝাই করিয়া সমুদ্রপথে মাণিকদার দিকে চলিয়া গেল। এই বিশাল বারিনিধি তাহার আশ্রিত মানবগণকে এক-বিন্দু পানীয় জল দিতেও অক্ষম! অতি নগণ্য ক্ষুদ্র ফুলঝুরির বাওড় মানবের যে কাজে লাগিতেছে ঐ বিরাট্ বিশাল সমুদ্র তাহা পারে না। কি ছোট, কি বড়, জগতে সকলেরই আবশ্যকতা আছে। নৌকাখানি ধীরে ধীরে দূর সমুদ্রে মিশিয়া গেল। আমরা তখন সম্মুখের অনন্ত শোভা দেখিতেছিলাম। কিন্তু মন ছিল পিছনের দিকে; কি জানি কখন শার্দ্দুলরাজ ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়েন।

আকাশ নির্ম্মল; একখণ্ড সামান্য মেঘও কোনস্থানে দৃষ্ট হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে কনক-তপন অস্তাচল-সমীপবর্ত্তী হইলেন। আর একটু পরেই সূর্য্যাস্ত। সমুদ্রে স্বর্ণময় সূর্য্যাস্ত দেখিবার স্বর্ণ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করিতে সম্মত হইলাম না।

জীবন বিপন্ন করিয়াও সুন্দরের পূজায় আত্মবিস্মৃতি—প্রেমের ইতিহাসে হয়ত এমন ঘটনা অনেক আছে। বিষয়ী অরসজ্ঞ ব্যক্তি এই সৌন্দর্য্যপূজার গুরুত্ব কিছুতেই বুঝিবেন না। জীবন এবং সম্পদ্ তাঁহার নিকট জগতে সর্ব্বাপেক্ষা কাম্য। কিন্তু যাঁহাদের প্রাণ আছে, তাঁহারা প্রেমের সাধনায়, সৌন্দর্য্যের পূজায় জগতের সবই ভুলিয়া যাইতে পারেন। এ সত্য সাধারণের অবোধগম্য।

চন্দ্রে যেমন গ্রহণ লাগে ঠিক সেইভাবে সহসা সূর্য্যের নিম্নপার্শ্ব যেন সাগরজলে আবৃত হইয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে ইহা নিম্নে সলিলের অন্তরালে একটু একটু করিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। সেই কনক-প্রতিমাকে যেন নির্দ্দয়ভাবে অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়া জগতের সমস্ত পদার্থের নশ্বরতা নীরবকণ্ঠে বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘোষণা করিতে লাগিল। আমি তখন স্থিরধীরভাবে পৃথিবীর স্থলভাগের এক প্রান্তসীমায়—সেই বঙ্গোপসাগরের

তীরের একটি উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান। পশ্চাতে মুক্ত প্রান্তর ও বহুদূর-প্রসারিত সুন্দরবন; সম্মুখে অনন্ত সাগর। আকাশের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে যেন দিগন্তবিস্তারিত আগুনের খেলা। হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া মুক্ত বিশ্বের এই নগ্ন সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিলাম। এই বিশাল সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির এই অনন্ত মাধুর্য্য প্রাণের কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া লইলাম। যে অনন্ত সম্পদ্, যে স্বর্গীয় বৈভব আজ এখানে এই মুহূর্ত্তে লাভ করিলাম, দুনিয়ায় তাহার তুলনা নাই। চিরদিন তাহা আমার হৃদয় সঞ্জীবিত রাখিবে, মন নূতন নতন মাধুরীতে পূর্ণ করিয়া রাখিবে।

অশোকের চরিত্র

সুরেন্দ্রনাথ সেন

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম.এ., পি.আর.এস., পি-এইচ.ডি., বি.লিট. (অক্সফোর্ড), ডি.লিট. (দিল্লী) ভারতবর্ষের প্রথমশ্রেণীর ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের অন্যতম। তিনি বরিশাল জিলায় মাহিলাড়া গ্রামে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইতিহাসের প্রথম আশুতোষ অধ্যাপক। প্রৌঢ়বয়সে তিনি নয়াদিল্লীতে ভারত গভর্ণমেন্টের ডিরেক্টর অব ন্যাশনাল আর্কিভ্স্—এই উচ্চপদ অলঙ্কৃত করেন। সেখান হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়-হলের প্রোভোষ্ট ও ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মরাঠা জাতির ইতিহাস লইয়াই তাঁহার প্রথম ও প্রধান গবেষণা। 'অশ্বিনীকুমার', 'অশোক' এবং নানাপ্রকার প্রবন্ধ রচনা করিয়াও তিনি যশস্বী হইয়াছেন।]

অশোকের শিল্পে যেমন, তাঁহার অনুশাসনের ভাষায়ও তেমনই অসাধারণ সংযম দেখা যায়। ধর্ম্মলিপির কোথাও অনাবশ্যক কোন বিশেষণ নাই, প্রিয়দর্শী সর্ব্বত্র সরল ভাষায় স্পষ্ট করিয়া তাঁহার বক্তব্য বলিয়া গিয়াছেন। অলঙ্কারের ভারে তাঁহার ভাষা আড়ষ্ট হয় নাই, সজ্জার বাহুল্যে তাঁহার শিল্প বিকৃত হয় নাই। সুতরাং মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, অশোকের জীবন

ছিল নিতান্তই সরল এবং ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কখনও আড়ম্বরের প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি নিশ্চয়ই অল্পভাষী ছিলেন এবং আত্মীয়-পরিজন ও পোষ্য-গণের সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতেন। আদর্শবাদী লোকেরা সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ হইয়া থাকেন, সুতরাং অশোকের চরিত্রেও বোধ হয় এই ভাবপ্রবণতা বিশেষভাবেই দেখা যাইত। সে সময়ের প্রচলিত কুসংস্কার হইতে তিনি বোধ হয় মুক্ত ছিলেন। পীড়ার কারণে বা বিবাহোপলক্ষে বা যাত্রাকালে হয়ত তাঁহার গৃহে তৎকাল-প্রচলিত নিরর্থক মঙ্গল অনুষ্ঠিত হইত না। তিনি পরিশ্রম ও তৎপরতার সহিত আপনার কর্ত্তব্য কাজগুলি করিয়া যাইতেন, কিন্তু জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সমাধানের চেষ্টা বোধ হয় তিনি করিতেন না। অনু-শাসনের কোথাও তিনি দার্শনিক তত্ত্বের বা যুক্তির অবতারণা করেন নাই। ব্রাহ্মণ-শ্রমণদিগকে তিনি সাধ্যমত দান করিতেন। পরলোকে তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং স্বর্গ-কামনাও তাঁহার ছিল। দেবদেবীদিগের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল কি না, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, কিন্তু তিনি সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জাগাইবার জন্য দিব্যরূপ-সমূহ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। বৈষ্ণব বিনয় বোধ হয় তাঁহার ছিল না। অনুশাসনের কোথাও "মুই অতি ছার"-ভাব নাই। বরঞ্চ তিনি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আত্মপ্রসাদ-সহকারেই উল্লেখ করিয়াছেন।

বাল্যজীবনে তিনি কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন আমরা জানি না। তবে পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের সময়ের কথা তিনি অনুশাসনে যেরূপ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে করা অন্যায় হইবে না যে, তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষা পরবর্ত্তী জীবনের আদর্শ ও আচরণের অনুকূল ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা-গ্রহণের পর তিনি সন্ন্যাস লইয়াছিলেন কি না, সে প্রশ্নের বিচার এখানে না করিলেও চলে। যদি পিতামহের মত তিনি অপ্রতিহত প্রতাপে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া যাইতেন, যদি তিনি পরবর্ত্তী কালের সুঙ্গ ও গুপ্ত নৃপতি-গণের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া নিজের শক্তি ও সম্পদের খ্যাতি প্রচার করিতে চাহিতেন, যদি শত্রু-নারীগণের বিলাপ তাঁহার চারণগণের উল্লাস বৃদ্ধি করিত, তাহা হইলে বোধ হয় মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা ও সম্পদের সহিত তাঁহার আচরণের অসঙ্গতি হইত না। কিন্তু কলিঙ্গের লক্ষনরশোণিতসিক্ত তরবারি চোল,

চের, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণীর কোটিনররুধিরপানে প্রবৃত্ত না হইয়া হঠাৎ বিজয়ের দীপ্ত মুহূর্ত্তে কোষবদ্ধ হইল। রণতূর্য্য, রণভেরী সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। অশোক দিগ্বিজয়-যাত্রা বন্ধ করিয়া অহিংসা ও শান্তির পথ আশ্রয় করিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বে কেবল আর একজন রাজপুত্র, কপিলাবস্তুর শাক্য রাজকুমার, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া মুক্তির পথ, নির্ব্বাণের পথ অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। অশোকের পরে মাত্র আর দুইজন মহামানব পৃথিবীতে প্রেমের ও শান্তির বাণীপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বেথেলহেমের সূত্রধর-পুত্র যীশু ও নবদ্বীপের ব্রাহ্মণকুমার নিমাই, উভয়েই পরাধীন জাতির লোক, রাজনীতির ভাষায় "দাস-জাতি"র মানুষ। একালের দর্শনের মতে দুর্ব্বল দাস-জাতিই ইহলোকে বিমুখ হইয়া পরলোকের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হয়। আঘাত করিবার শক্তি ও সাহস যাঁহাদের নাই, তাঁহারা ক্ষমা ও প্রেমের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাই যীশুর তিরোধানের বহু পরে রাজার জাতি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বিকৃত করিয়াছে, আর চৈতন্যের ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত কোন শক্তিমান্ রাজার জাতি গ্রহণ করে নাই।

অশোক দুর্ব্বল ছিলেন না। যিনি লক্ষ নরবলি দিয়া কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন, তিনি যে আরও লক্ষ বলি দিয়া তাম্রপর্ণী পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে পারিতেন না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। দিগ্বিজয়ের পথ হইতে সহসা এরূপ ভাবে আর কোন সম্রাট্ অহিংসার পথে আসিয়াছেন কিনা জানি না। ধার্ম্মিক রাজা হয়ত আরও হইয়াছেন, কিন্তু সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের চেষ্টা কয় জন করিয়াছেন জানি না। করিয়াছিলেন বাদশাহ আকবর, তাই তাঁহার অনুরক্ত প্রজাগণ দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বরের আসন দিয়াছিল। কিন্তু তিনিও রাজ্যলিপ্সা ত্যাগ করিয়া শান্তির পথ, অহিংসার পথ, সর্ব্বভূতের কল্যাণের পথ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

ইচ্ছা করিলে, অশোক আলেকজাণ্ডার, সীজার ও নেপোলিয়নের মত বীরখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন কি না, সে কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই। নেপোলিয়নের প্রতিভা না থাকিলেই যে নেপোলিয়নের মত রাজ্যলিপ্সা থাকিবে না, এমন কথা বলা যায় না। এখানে বিচারের বিষয়

এই যে, যাঁহারা বিশ্বের ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে মানুষের অধিকতর হিত-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, না দিগ্বিজয়-বিমুখ অশোক তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক নরহিতৈষী ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

অশোক চাহিয়াছিলেন পৃথিবীতে শাশ্বত শান্তি স্থাপন করিতে, সমাজ হইতে হিংসা, দ্বেষ, হত্যা, উপঘাত দূর করিতে। তাঁহার বিশাল হৃদয়ের ব্যাপক স্নেহ সমস্ত জীব-জগতের কল্যাণ-কামনায় নিরত ছিল। এরূপ মহা-পুরুষের জন্ম কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব। কারণ, ভারতের ঋষিগণ কখনও বিশ্বাস করেন নাই যে, জীব-কল্যাণের ব্যত্যয়ে মানব-কল্যাণ হইতে পারে। ভারতের তপোবনে যে শান্তি-বচন পঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে চেতন, অচেতন, কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই। প্রাচীন ঋষিরা সর্ব্বজীবের, সর্ব্বলোকের শান্তি কামনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে, সমস্ত লোক, সমস্ত জীব এক অঙ্গের নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ।

অশোক বৌদ্ধ হইলেও ভারতবর্ষের সন্তান। প্রাচীন ঋষির এই শান্তি-বচনের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধ নাই। নর ও পশু, সর্ব্বজীবের, সর্ব্বভূতের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিয়া অশোক পৃথিবীতে শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণী আজ আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, তাই জগতে এত অশান্তি। আজ আকাশ মৃত্যুর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বাতাস মৃত্যুর বাষ্পে বিষাক্ত, সলিলে হত্যার বিভীষিকা, বনস্পতি মারণ-যন্ত্রের আশ্রয়,—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আজ হত্যার অবাধ লীলা চলিতেছে। আজ শান্তি কোথায়? কল্যাণ কোথায়? মঙ্গল কোথায়? স্বার্থের সংঘাতে লোভ আজ হত্যার উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কে ইহাকে শান্ত ও সংযত করিবে? দুর্ব্বলের অহিংসা এই হিংসার পদতলে পিষ্ট হইয়া দলিত হইয়া মরিয়া যাইবে। এমন কোন দিগ্বিজয়ী বীর কি এখন নাই, যিনি অশোকের আদর্শ অনুসরণ করিতে পারেন? এখন কি এই হত্যা-সমাচ্ছন্ন, হিংসা-ক্ষুব্ধ লোভ-জর্জ্জরিত পৃথিবীর বুকে আর কোন ধর্ম্মবিজয়ী রাজর্ষির আবির্ভাব হইবে না? যদি না হয়, তাহা হইলেও পৃথিবী হইতে অশোকের বাণী, অশোকের আদর্শ, অশোকের ধর্ম্ম

একেবারে লুপ্ত হইবে না। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যে রাজর্ষি কলিঙ্গবিজয়ের নরহত্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া কল্যাণের পথে, শান্তির পথে, প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার কথা শান্তিকামী মানুষ হত্যা ও হিংসায় বিব্রত হইয়া একদিন কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করিবে।

অশোকের অহিংসানীতি

প্রবোধচন্দ্র সেন

[প্রবোধচন্দ্র সেন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল তারিখে পূর্ব্ববঙ্গে ত্রিপুরা জেলায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. পরীক্ষায় ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন খুলনা জেলার দৌলতপুর কলেজে ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন (১৯৩২-৪২)। বর্ত্তমানে বিশ্বভারতীতে বাংলাসাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক ও রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি বাংলা ছন্দের প্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রবর্ত্তক। তাঁহার প্রণীত পুস্তকসমূহের মধ্যে 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ', 'ধর্ম্মবিজয়ী অশোক' ও 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত' এবং তাঁহার সম্পাদিত 'মেঘদূত' উল্লেখযোগ্য।]

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যজ্ঞোপলক্ষে পশুহত্যা-নিবারণের উদ্দেশ্যেই অহিংসানীতির আবির্ভাব হয়েছিল। সে হিসাবে এটি একটি ধর্মনীতি এবং ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ ব'লেই স্বীকার্য। এই ধর্মনীতিটি প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছে তাও বিবেচ্য।

প্রথমেই দেখতে পাই অহিংসার আদর্শটি চরিত্রনীতি হিসাবে গীতায় পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হ'লেও ওটিকে কখনও যুদ্ধবিরোধী নীতি ব'লে স্বীকার করা হয়নি। অর্জুনকে অহিংসার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করা হয়নি, বরং যুদ্ধ করতেই উৎসাহিত করা হয়েছে। স্বয়ং বুদ্ধদেবের উপদেশেও কোথাও যুদ্ধের নিন্দা দেখা যায় না। বরং আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করতেন এমন প্রমাণ আছে।

এবার দেখা যাক অহিংসানীতির পরম অনুরাগী বৌদ্ধসম্রাট্ অশোক ওই নীতিটিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োগ করেছিলেন। এ-কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, কলিঙ্গযুদ্ধের পর রাজ্যলিপ্সু অশোকের মনে যে অনুশোচনা ও ধর্মকামতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে তাঁর রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি মগধের দিগ্‌বিজয়নীতি বর্জন ক'রে নূতন নীতি প্রবর্তন করলেন। ওই নূতন নীতির নাম হ'ল 'ধর্মবিজয়'। 'শরশক্য'বিজয় অর্থাৎ অস্ত্রবিজয়েরই নাম দিগ্‌বিজয়, আর প্রেম বা প্রীতির সাহায্যে যে বিজয় তাকেই অশোক ধর্মবিজয় নামে অভিহিত করেছেন। কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশোক যুদ্ধের দ্বারা রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্‌ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার ক'রে ধর্মবিজয়ের নীতি অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর অবিজিত প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়ে জানিয়ে দেন যে, তাঁর কাছ থেকে তাদের কোনো ভয় নেই, তিনি তাদের দুঃখের হেতু না হ'য়ে সুখেরই হেতু হবেন। তিনি নিজে দিগ্‌বিজয়নীতি পরিহার ক'রেই ক্ষান্ত হননি; তাঁর পুত্রপ্রপৌত্রেরাও যেন ভবিষ্যতে নবরাজ্য-বিজয়ের আকাঙ্‌ক্ষা মনে স্থান না দেন, সে ইচ্ছাও তিনি তাঁর গিরিলিপিতে চিরস্থায়ী রূপে অঙ্কিত ক'রে গিয়েছেন। এ-ভাবে অশোকের সাম্রাজ্যে রণভেরী গিয়েছিল স্তব্ধ হ'য়ে এবং তার স্থান অধিকার করেছিল ধর্মঘোষণা।

এইরূপে রক্তপাতবিতৃষ্ণা শুধু যে অশোকের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও এই অহিংসানীতির দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তৎকালে রাজাদের মধ্যে বিহারযাত্রা ক'রে মৃগয়া প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের রীতি খুবই প্রচলিত ছিল। পশুশিকার স্পষ্টতই অহিংসানীতির বিরোধী; তাই অশোক বিহারযাত্রার স্থলে ধর্মযাত্রা অর্থাৎ তীর্থাদি দর্শন ক'রে ধর্মপ্রচারের রীতি প্রবর্তন করেন। পূর্বে অশোকের রন্ধনশালার জন্যে প্রতিদিবস বহু প্রাণী নিহত করা হ'ত। পরে ওই প্রাণীদের সংখ্যা বহুলপরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রত্যহ মাত্র দুটি ময়ূর ও একটি মৃগ নিহত করার ব্যবস্থা হয়, অবশ্য প্রত্যহ একটি ক'রে মৃগ বধ করার রীতিতে প্রায়ই ব্যতিক্রম ঘটত। কিন্তু কালক্রমে এই তিনটি প্রাণী বধ করাও অশোকের পক্ষে দুঃসহ হ'য়ে উঠল এবং তিনি রাজমহানসে প্রাণিহত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ

ক'রে দিয়ে নিরামিষাহারী হ'লেন। এভাবে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণ-রূপে অহিংসাপথের পথিক হ'লেন। তখনকার দিনে একাজ যে কত কঠিন ছিল আজকাল তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা সহজ নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অবিমিশ্ররূপে অহিংসাপন্থী হওয়া সম্ভব হ'লেও রাজনীতিতে তা কতখানি সম্ভব তা অশোকের ইতিহাস থেকে বিচার ক'রে দেখা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তিনি একেবারেই বিমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুশাসন থেকেই প্রমাণিত হয় যে যুদ্ধের সম্ভাব্যতাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর্‌তে পারেন নি। যে অনুশাসনটিতে তিনি কলিঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে নিজের বেদনা ও অনুশোচনার কথা জ্ঞাপন ক'রে বলেছেন, ওই যুদ্ধে মানুষের যে দুঃখকষ্ট হয়েছিল এখন তিনি তার শতভাগ বা সহস্রভাগ দুঃখকষ্টকেও অত্যন্ত শোচনীয় ও গুরুতর ব'লে মনে করেন, সেই অনুশাসনটিতেই কিন্তু বলা হ'য়েছে, 'যদি কেউ আমার অপকার করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা চলে ততক্ষণই আমি তাকে ক্ষমা ক'রব'।

এই কথার ইঙ্গিত হচ্ছে এই—কলিঙ্গবিজয়ের পর অশোক যুদ্ধবিগ্রহ পরিহার করেছেন এবং ওই যুদ্ধের সহস্রাংশ দুঃখকষ্টও তিনি কোনো রাজ্যকে দিতে অনিচ্ছুক বটে, কিন্তু তা ব'লে কেউ যেন মনে না করেন, তবে তো অশোকের রাজ্যের অপকার করা খুবই সহজ। ওই অপচিকীর্ষুদের তিনি শাসিয়ে বলেছেন, তাঁরও ধৈর্য এবং ক্ষমার একটি সীমা আছে, ওই সীমা অতিক্রান্ত হ'লে তিনি অস্ত্রধারণ ক'রে তাদের শাস্তিবিধান ক'রতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই উপলক্ষে ওই ত্রয়োদশ গিরিলিপিটিতেই অশোক তাঁর সাম্রাজ্যান্তর্গত অটবী-রাজ্যের অধিবাসীদের জানাচ্ছেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হ'লেও তিনি শক্তিহীন ন'ন, তাদের কৃতকার্যের জন্যে তারা যদি লজ্জা প্রকাশ না করে তবে তাদের হনন করা হবে।

অন্যত্র যেখানে তিনি তাঁর অবিজিত প্রতিবেশী (অংত) রাজ্যের অধিবাসী-দের অনুদ্‌বিগ্ন হ'বার আশ্বাস দিয়ে জানাচ্ছেন, "আমার কাছে থেকে সুখই লাভ করবে, দুঃখ নয়", সেই অনুশাসনটিতেও তিনি কিন্তু তাঁর যুদ্ধবিমুখতার সীমাটুকু নির্দেশ ক'রে দিয়ে এ-কথা ব'লতে ভোলেন নি যে, যতটুকু পর্যন্ত ক্ষমা করা যায় ততটুকুই ক্ষমা করা হবে। তার বেশি নয়।

এ সমস্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হ'য়ে ওঠে যে, অশোক যুদ্ধবিমুখ ছিলেন বটে, কিন্তু সে শুধু রাজ্যবিস্তারমূলক যুদ্ধের বিরুদ্ধে। রাজ্যরক্ষামূলক যুদ্ধেরও তিনি বিরোধী ছিলেন এ-কথা মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। কলিঙ্গযুদ্ধের পরে অশোককে আর কখনও সমরসজ্জা কর্‌তে হয়েছিল কি না, অথবা রামকৃষ্ণকথিত অহিংস সর্পের মতো ফোঁস ক'রেই তিনি অপকারকদের নিরস্ত কর্‌তে সমর্থ হ'য়েছিলেন কি না, তা স্পষ্টরূপে জানা যায় না।

অশোক অনাবশ্যক যুদ্ধবিগ্রহ এবং রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তা ব'লে তিনি যে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ থেকেই বিরত ছিলেন তা নয়। তিনি যে এক সময়ে বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ ক'রে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ ক'রেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভিক্ষুবেশী অশোকের হৃদয়ে ভিক্ষুধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটেনি। ভিক্ষুব্রতী হ'লেও রাজনীতিপালনে তিনি কিছুমাত্র শৈথিল্য না দুর্বলতা প্রকাশ করেন নি। তাঁর ধর্মপ্রচারের ফলে সকলেই যে অপকার্য থেকে বিরত হ'য়ে ধর্মপ্রাণ হ'য়ে উঠেছিল তা মনে করা যায় না। ধর্মপ্রচার-সত্ত্বেও বহু লোকই নানাপ্রকার অপরাধে লিপ্ত হ'ত এবং অশোককেই তাদের শাস্তিবিধান কর্‌তে হ'ত। কেন না দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন, উভয়ই রাজার কর্তব্য। দুষ্টের দমন বল-প্রয়োগসাপেক্ষ এবং ওই বলপ্রয়োগে অশোক কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁকেও কারাগার রক্ষা কর্‌তে হ'ত। এবং অপরাধীদের কারারুদ্ধ কর্‌তে হ'ত। তবে বছরে একবার ক'রে তিনি কয়েদীদের কারামুক্তি (বন্ধনমোক্ষ) দিতেন। আর, যারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'ত তাদের প্রাণদণ্ডবিধানেও তিনি ইতস্ততঃ করেন নি। তবে তিনি বধদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের তিন দিনের সময় মঞ্জুর কর্‌তেন, যেন তারা ওই সময়ের মধ্যে দান, উপবাস প্রভৃতি ধর্মা-চরণের দ্বারা নিজেদের পারত্রিক কল্যাণ সাধন কর্‌তে পারে ও প্রজাসাধারণের মধ্যে অধিকতর ধর্মপরায়ণতার প্রেরণা রেখে যেতে পারে।

তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে অহিংসানীতির অনুসরণ কর্‌তেন বটে, কিন্তু প্রজাসাধারণকে অহিংসানীতিপালনে তিনি কতখানি বাধ্য করে-ছিলেন সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো যে, এ-বিষয়ে তিনি প্রজাদের শুধু উপদেশ দিয়েই নিরস্ত হ'য়েছিলেন ; কখনও তাদের বাধ্য করেছিলেন বা শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তিনি শুধু পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন যজ্ঞার্থে প্রাণিবধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জীবহিংসা না করাই ভালো।

কিন্তু এই উপদেশ পালিত না হ'লে কোনো শাস্তিবিধানের উল্লেখ তাঁর অনুশাসনে নেই। যজ্ঞার্থে প্রাণিবধ এবং মাংসাহার বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে জীবহিংসা এই দুএর মধ্যে প্রথমটিই অশোকের মতে অধিকতর অন্যায় ব'লে গণ্য হ'ত। যজ্ঞার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে তাঁহার যে-রকম স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সাধারণ জীবহিংসার বিরুদ্ধে তেমন স্পষ্টোক্তি কোথাও নেই। তা-ছাড়া যজ্ঞার্থে পশুবলির বিরুদ্ধে এই উক্তির কোনো ব্যতিক্রমের উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু সাধারণ জীবহিংসাবিষয়ক বিধানটির বহু ব্যতিক্রমের কথা দেখা যায় পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে। ওই লিপিতে দেখা যায় অশোক তাঁর রাজ্যাভিষেকের ষড়্‌বিংশ বৎসরে কতকগুলি জীবকে অবধ্য ব'লে ঘোষণা করেন ; এই অবধ্য প্রাণীদের তিনি একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা—শুক, সালিক, চক্রবাক, হংস, ষাঁড়, গণ্ডার, শ্বেতকপোত, গ্রামকপোত। তার পরেই ব'লেছেন, "মানুষ যে-সব চতুষ্পদ জীব খায় না (চামড়া প্রভৃতির জন্যে মানুষের কাজেও লাগে না) সেগুলিও অবধ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অশোক খাদ্যার্থে বা চর্ম প্রভৃতি লাভার্থে পশুবধ নিষেধ করেন নি, যদিও তিনি নিজে খাদ্যের জন্যেও পশুহত্যা থেকে বিরত ছিলেন। ওই লিপিতেই দেখা যায় বছরের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি মাছ ধরা ও বিক্রি করা অনুচিত ব'লে জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময়ে এই নিষেধবিধি প্রযোজ্য ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে জীবজন্তুসম্পর্কেও সম্পূর্ণ অহিংসানীতির পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও প্রজাসাধারণের উপর নিজের ধর্মবিশ্বাসকে চাপিয়ে দেওয়া সংগত মনে করেন নি। এখানেও তাঁর রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাই। তখনকার দিনে মাছমাংস খাওয়া সমগ্র দেশে সুপ্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় সমগ্র দেশকে নিরামিষভোজী ক'রে তোলা সম্ভবও ছিল না এবং সে চেষ্টা করাও যথার্থ রাজনীতির কাজ হ'ত না। অশোকও তাই মাছমাংস খাওয়া এবং খাদ্যার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে

জীবহত্যা নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু যজ্ঞার্থে জীবহত্যা ও নিষ্প্রয়োজন জীবহত্যার বিরুদ্ধেই প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। উপনিষদের যুগে পশুঘাত-মূলক যাগ-যজ্ঞের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা হ'য়েছিল, অশোকের আমলেই তার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই।

পূর্বে দেখেছি অশোক অহিংসানীতির সমর্থক হ'লেও সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধ-বিরোধী বা নরহত্যাবিরোধী ছিলেন না। রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং তজ্জাত অকারণ নরহত্যার তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রাজ্যরক্ষা-মূলক যুদ্ধ এবং অপরাধীদের প্রাণদণ্ডবিধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন। এখন দেখলাম অকারণ জীবহত্যা ও যজ্ঞার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে প্রচার করলেও তিনি রাজ্যমধ্যে খাদ্যার্থে বা অন্যবিধ প্রয়োজনে জীবহত্যার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নি। অর্থাৎ অশোক নিজে ব্যক্তিগত-ভাবে অহিংসানীতির উপাসক হ'লেও তিনি তাঁর রাজনীতিকে কখনও ওই অহিংসানীতির কুক্ষিগত ক'রে ফেলেন নি। ধর্মনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রগত পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গী*

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত

[সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ১৩০১ সনে বরিশাল জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে দীর্ঘকাল দেশসেবা-ব্রতে ব্রতী থাকিয়া ইনি অধিক বয়সে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইনি এক্ষণে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক। 'কাব্যালোক' নামে কাব্য-তত্ত্ব-সম্বন্ধে মৌলিক চিন্তা ও মনস্বিতাপূর্ণ এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বিদ্বৎ-সমাজে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।]

১

পুরাকালে ভারতবর্ষে কুরু, পঞ্চাল এবং বিদেহ নামে তিনটি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই তিন রাজ্যে বড় বড় মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি, বড় বড় রাজা,

* বৃহদারণ্যক, ৩য় অধ্যায়, ১ম-৯ম ব্রাহ্মণ

অনেক বেদবিদ্ পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, অতিপ্রাচীন সেই উপনিষদের যুগে বিদেহ রাজ্যে রাজা জনক রাজত্ব করিতেন। বিদেহের রাজা বলিয়া তাঁহার আর এক নাম ছিল বৈদেহ। রাজা জনক ছিলেন ক্ষত্রিয়রাজগণের মুকুট-মণি, আবার ব্রহ্মবিদ্গণেরও প্রধান। ব্রহ্ম-বিদ্যায়, বেদ-বিদ্যায়, ধনে মানে, যাগ-যজ্ঞে এবং দান-ধ্যানে বিদেহরাজ জনকের তুলনা ছিল না। নানা দেশ নানা দিক্ হইতে ব্রহ্মচারিগণ, বিদ্যার্থিগণ, বড় বড় পণ্ডিত, ঋষি এবং তাপসগণ পর্য্যন্ত রাজা জনকের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং অনেকেই তাঁহার সঙ্গে অধীত বিদ্যার আলোচনা করিয়া নিজে-দের শিক্ষা ও সাধনা সাঙ্গ মনে করিতেন। রাজা জনকের যেমন তুলনা ছিল না, তাঁহার রাজসভারও তেমন তুলনা ছিল না।

এই বিদেহাধিপতি রাজা জনক একবার এক প্রকাণ্ড যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। সে যজ্ঞের দক্ষিণা এত প্রচুর ছিল যে, ঋষিগণ সে যজ্ঞের নাম দিয়াছিলেন "বহু-দক্ষিণ" যজ্ঞ। প্রসিদ্ধ কুরু ও পঞ্চাল দেশের বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া বিদেহদেশে রাজা জনকের যজ্ঞসভায় সমবেত হইয়াছিলেন। যজ্ঞ যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, দক্ষিণা দেওয়ার সময় উপস্থিত, তখন সম্মুখস্থ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর দিকে তাকাইয়া রাজা জনকের কেমন এক কৌতূহল জন্মিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "এ এক অপূর্ব্ব সুযোগ। যজ্ঞস্থলে যাঁহারা মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেখিতেছি বেদবিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ কে, শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ কোন্ জন, এই সুযোগে আজ জানিয়া লইতে হইবে।"

রাজর্ষি জনকের আদেশে এক সহস্র ধেনু যজ্ঞসভার নিকটেই গোষ্ঠ-গৃহে আনীত হইল, প্রত্যেক ধেনুর শৃঙ্গে পাঁচ পাঁচ করিয়া দশ পাদ সুবর্ণ বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

রাজা জনক তখন ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া প্রণাম জানাইলেন, এবং গোষ্ঠগৃহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, ঐ এক সহস্র ধেনু আপনাদের নিকটেই অবরুদ্ধ আছে, প্রত্যেক ধেনুর শৃঙ্গে পাঁচ পাঁচ করিয়া দশ পাদ সুবর্ণ জড়ানো আছে। আপনারা সকলেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ। কে ছোট, কে বড় কিছুই জানি না। আপনাদের মধ্যে যিনি

শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ বা ব্রহ্মিষ্ঠ, তিনি দয়া করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ করুন।"

জনকের বাক্য শুনিয়া যজ্ঞ-সভা সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। কুরু-পঞ্চালের বেদ-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ সকলেই উপস্থিত। ইঁহাদের মধ্যে কাঁহার এত বড় বুকের পাটা যে, সভায় দাঁড়াইয়া বলিবেন, "আমিই ব্রহ্মিষ্ঠ, ও সহস্র ধেনু আমারই প্রাপ্য।" ব্রাহ্মণগণ নির্ব্বাক্ বসিয়া রহিলেন, দুঃসাহস দেখাইয়া, কেহই প্রগল্ভ হইতে চাহিলেন না।

স্তব্ধ শান্ত যজ্ঞ-ভূমি। একদিকে চিন্তাকুলচিত্ত সহস্র ব্রাহ্মণ, আর একদিকে স্বর্ণ-মণ্ডিত-শৃঙ্গ সহস্র ধেনু। মধ্যে যজ্ঞভূমির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৌতূহলী রাজর্ষি জনক। সকলেই লজ্জিত, সকলেই ব্যথিত, সকলেই বিস্মিত, রাজর্ষি কিনা শেষে এমন এক প্রগল্ভ প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। যজ্ঞাগ্নির শুভ্রশিখা লজ্জায় যেন লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সহসা সহস্র চক্ষু যজ্ঞ-সভার মধ্য-স্থলে আকৃষ্ট হইল। উদয়শৈল হইতে দিবাকরের ন্যায় জটা-মণ্ডিত-মৌলি দ্যুতিসমুজ্জ্বল-দেহ এক প্রৌঢ় ঋষি ধীরে ধীরে দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মচারীকে আদেশ করিলেন, "সামশ্রব, ধেনুসহস্রকে আমার আশ্রমে লইয়া যাও।" আদেশমাত্র সামশ্রবা গোষ্ঠগৃহ হইতে স্বর্ণ-মণ্ডিত-শৃঙ্গ সহস্র গোধন লইয়া আচার্য্যের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঋষিবর আবার ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণসভায় নিজ আসনে উপবেশন করিলেন। তবু মনে হইতে লাগিল, শান্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ-দ্বারা তিনি যেন সভাগৃহ উজ্জ্বল করিয়া সকলের ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া আছেন।

এতক্ষণে ব্রাহ্মণগণের চমক ভাঙ্গিল, ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য। যাজ্ঞবল্ক্য। তুমি নাকি ব্রহ্মিষ্ঠ। তুমি একথা বলিতেছ।" ব্রাহ্মণগণের মিলিত ক্রোধ তাঁহাকে যেন ভস্ম করিয়া ফেলিতে চাহিল। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য শান্ত নির্বিকার। রাজা জনক একান্তে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। স্তব্ধ সে যজ্ঞসভা আবেগ ও উত্তেজনায় চঞ্চল, কলমুখর হইয়া উঠিয়াছে। জনকের পুরোহিত ছিলেন অশ্বল। রাজ-পুরোহিত তিনি, তাই তাঁহার দম্ভের আর সীমা ছিল না। নিজে ব্রহ্মিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার বেশ অভিমান ছিল, এবং তিনি হয়ত ভাবিয়াছিলেন ও গোধন তাঁহারই।

কিন্তু এ কি। রাজা জনকের যজ্ঞসভায় জনকের পুরোহিতের সম্মুখে এই গোধন লইল অপর একজন ব্রাহ্মণ। দম্ভে দিশাহারা, ক্রোধে ক্ষিপ্ত, ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী, ধৃষ্ট হোতা অশ্বল সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমিই নাকি আমাদের মধ্যে ব্রহ্মিষ্ঠ?"

কিন্তু আশ্চর্য্য ঋষি এই যাজ্ঞবল্ক্য। হোতা অশ্বল যত উত্তেজিত হইয়াছিলেন, তত বিনীত হইয়া ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ আকাশে স্থিরশৃঙ্গ গৌরীশঙ্করের ন্যায় দাঁড়াইয়া প্রশান্তভাবে তিনি উত্তর করিলেন, "ব্রহ্মিষ্ঠের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। আমার ধেনুর প্রয়োজন ছিল মাত্র।" যাজ্ঞবল্ক্যের স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার প্রশান্ত বিনয়-মহিমায় সকলেই অবাক্ হইলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সেই সংক্ষুব্ধ কোলাহল যেন শান্ত হইয়া গেল। রাজা জনক প্রসন্ন হইলেন, এবং ব্রহ্মিষ্ঠই গোধন গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু হোতা অশ্বল কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেও থামিলেন না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সভায় দাঁড়াইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। একে পুরোহিতের প্রশ্ন, আবার সে পুরোহিত অভিমানে অহঙ্কারে ক্ষিপ্ত। কাজেই প্রশ্নগুলি ছিল কেবল যাগ-যজ্ঞের পরিভাষার উল্লেখে কণ্টকিত। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য একটির পর একটি করিয়া ধীরভাবে সমস্ত প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেওয়ায় হোতা অশ্বল বড় বিপন্ন হইলেন। তাঁহার সমস্ত অহঙ্কারই চূর্ণ হইয়া গেল, এবং অবশেষে তিনি নতমস্তকে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

হোতা অশ্বল এইরূপে বিরত হইলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণসভা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সত্যইতো সেখানে ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্‌গণ মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে নিজ নিজ জ্ঞান ও অনুভব অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও শান্তমনে সমুদয় প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেদিন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের মুখ হইতে জনকের যজ্ঞস্থলে যে নির্ম্মল জ্ঞানামৃত নিষ্যন্দিত হইয়াছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের একটি বড় অংশ রচিত হইয়াছে। ঋষিগণ যাজ্ঞবল্ক্যের

অপূর্ব্ব জ্ঞানবিভা দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। রাজা জনক নিজেকে ধন্য ধন্য বোধ করিয়াছিলেন। বাহিরের বহু-দক্ষিণ যজ্ঞ তো উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃত যজ্ঞের হোতা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য।

২

এইবার ব্রাহ্মণ-সভা হইতে উঠিলেন একজন নারী। মূর্ত্তিমতী ব্রহ্ম-বিদ্যার ন্যায় আপন পবিত্রশ্রীতে ব্রাহ্মণসমাজ আলোকিত করিয়া মহীয়সী তাপসী ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এই তাপসী ছিলেন বচক্রু ঋষির দুহিতা, নাম গার্গী, পিতার নামানুসারে কন্যা বাচক্রুবী নামেও পরিচিতা ছিলেন। সেই স্বাধীন পবিত্র বৈদিক যুগে নারী-পুরুষের অধিকার এখনকার মতো সমাজের অন্যায় শাসনে কোথাও এরূপ স্বতন্ত্র ছিল না। সে যুগে ঋষিপত্নী বা ঋষি-কন্যারা বেদবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়া শুধু যে ঋষি হইতেন তাহা নয়, ঋষিসমাজে এবং বড় বড় যজ্ঞসভায় তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইতেন, এবং আবশ্যকমত সে-সমুদয় সভায় তর্কবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে প্রবীণ পুরুষ-ঋষিগণকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেন। বিদ্যার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকার ছিল।

গার্গী উঠিয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যও উত্তর করিতে লাগিলেন।

গার্গীর শেষ প্রশ্ন শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য থমকিয়া দাঁড়াইলেন; যেন একটু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান গার্গি! আর প্রশ্ন করিও না, আর প্রশ্ন করিও না! তোমার মুণ্ড খসিয়া পড়িবে। তুমি বেদবিধি অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ।"

গার্গী ভয় পাইয়া থামিয়া গেলেন। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়ে যাইতে যাইতে অনুমানশক্তি টানিয়া টানিয়া গার্গী বেদ-শাস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করিতেছিলেন; ব্রহ্মেরও উপরে কে, এই প্রশ্ন করিতেছিলেন। ব্রহ্মের আবার উপরে কে? তিনি ত সকলের মূল, সর্ব্বময়, সর্ব্বান্তর্যামী। তাই যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর বাচালতায় অমন করিয়া ভয় দেখাইলেন।

শহরে আনে। যে ছিল গৃহস্থ, আত্মসম্মান হারাইয়া সে পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়ায়। ১৮৭৮ অব্দের দুর্ভিক্ষ-কমিশনে স্যর রিচার্ড টেম্পল এই সম্পর্কে বলেন, 'খাদ্যের সন্ধানে মানুষ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া যখন ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে, দুর্ভিক্ষে সেই অবস্থা সকলের চেয়ে ভয়াবহ। ইহার ফলে লোক নীতিভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রামে শৃঙ্খলার সহিত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়া এই ঘোরাঘুরি বন্ধ করিয়া ফেলা উচিত। কয়েকটি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্য-কেন্দ্র হইবে। উপযুক্ত সময়ে দ্রুত সাহায্যের ব্যবস্থা করিলে ঘোরাঘুরি বন্ধ হইবে।'

১৮৬৬ অব্দেও লোকে ঘরবাড়ী ছাড়িয়াছিল; ১৯৪৩ অব্দের মতোই সদর রাস্তায় মুমূর্ষু অবস্থায় মানুষ পড়িয়া থাকিত। আগস্ট মাসে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে-বার বিস্তর লোক মরিয়াছিল। দলে দলে অস্থিসার মানুষ লঙ্গরখানায় জমায়েত হইত। তাহাদের উপযুক্ত আশ্রয় ছিল না। সরকার লক্ষ্য করিলেন, বাহিরের লোক আসিয়া শহরের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। তখন একরকম জোর করিয়াই শহরের অন্নসত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দুঃস্থদের বাহিরে পাঠানো হইল। সত্তর বৎসর পরে সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাইয়াছি। সেবার কলিকাতা শহরে লোক জমিয়াছিল পনের-ষোল হাজার। ১৯৪৩ অব্দে সরকারী অনুমান, একলক্ষ।

সেবারও রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হইত। এ সম্বন্ধে আপত্তি উঠিয়াছিল। কটকের রিলিফ ম্যানেজার মিঃ কার্কউডের মতে, এই প্রকার সাহায্য-দানে গ্রহীতার নৈতিক অধোগতি হয়। এ কথা ঠিক যে, লোকে রান্না-করা খাদ্য গোপনে বিক্রি করিয়া উদ্দেশ্যের অপব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু আর একটা দিক্ ভাবিবার আছে। বহু পরিবারেই এইরূপ সাহায্য লইতে ইজ্জতে বাধে, তাহারা নিঃশব্দে মৃত্যুপথের যাত্রী হয়। ১৯৪৩ অব্দেও এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। যাহারা লঙ্গরখানায় যাইতে পারে না, তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য সরকারী তরফ হইতে কি বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল?

১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষের সূচনাতেই সরকার অবহিত হইয়াছিলেন, তাই সেবার বেশি লোকক্ষয় হইতে পারে নাই। খাদ্যের সন্ধানে লোকে গ্রাম ছাড়িবার পূর্বেই যাহাতে সাহায্য পৌঁছায়, দেহের শক্তি নিঃশেষ হইবার আগে যাহাতে কাজ পায়, অতি দ্রুত তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রার্থী সাহায্যের

যোগ্য কিনা, এ বিষয়ে স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য সকলের চেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। শহরের উপর অন্নসত্র খুলিলে এই প্রমাণের উপায় থাকে না; অনেক বাজে লোক সাহায্য পায়, অথচ অধিকাংশ দুঃস্থ সেবাকেন্দ্রে পৌঁছিয়া উঠিতে পারে না। যাহাতে এই রকম গোলযোগ না ঘটে, তখনকার ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। লোকজনকে তাহাদের ঘরবাড়ীতে বসাইয়া নামে নামে এবং গ্রাম হিসাবে ভাগ না করিলে সুশৃঙ্খল সাহায্য অসম্ভব, এই ছিল তাঁহার অভিমত। পঞ্চাশ হইতে একশ'টি গ্রাম লইয়া এক একটি সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইল; সমগ্র বাংলাদেশকে এইভাবে ভাগ করিয়া ফেলা হইল। প্রতি কেন্দ্রে এক একটি বড় শস্যাগার—সেখান হইতে গ্রামের শস্য-ভাণ্ডারে খাদ্য পাঠানো হইত। একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী প্রতিসপ্তাহে কাজকর্ম পরিদর্শন করিতেন। ১৮৭৩-৭৪ অব্দে দুর্ভিক্ষদমনের এই প্রচেষ্টা—সকল দিক্ দিয়া ইহাকে আদর্শস্থানীয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরে ইহা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইয়াছে।

থাকো *

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[কেদারনাথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে দক্ষিণেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে সরকারী চাকরি গ্রহণ করিয়া ইনি নানা স্থলে কাজ করেন এবং সরকারী কাজে চীনদেশে প্রেরিত হ'ন। রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্ক কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে ইনিই ছিলেন অগ্রগণ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে সাহিত্যসেবার জন্য 'জগত্তারিণী পদক' দান করেন। 'কোষ্ঠীর ফলাফল,' 'আই হ্যাজ,' 'ভাদুড়ী মহাশয়,' 'আমরা কি ও কে' ইত্যাদি ইঁহার রচিত গ্রন্থ। ইঁহার রচনা রঙ্গরসিকতায় অলঙ্কৃত। বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের) ২৯শে নভেম্বর ইনি পুর্ণিয়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন।]

বাল্যকালে একটি প্রৌঢ়াকে নিত্য সকালে দশ বাড়ী ঘুরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতে দেখিতাম; তাহাতে এমন কোন অসাধারণত্ব ছিল না যে, তাহা কাহারো লক্ষ্যের বস্তু হয়।

* লেখকের গ্রন্থসংগ্রহে বিলম্বের জন্য রচনাটি সর্ব্বশেষে মুদ্রিত হইল।

কোন কোন বর্ষীয়সী এই স্ত্রীলোকটিকে 'বউমা,' কেহবা 'থাকো' বলিতেন। পিসী, মাসী, খুড়ী প্রভৃতি সম্বোধনেই অন্য স্ত্রীলোকেরা থাকোর সহিত কথা কহিতেন। বধূরা 'মা'ও বলিত। পল্লীগ্রামে এই আত্মীয় সম্বোধন চিরপ্রচলিত ও এতই সহজ যে, কাহারো অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করে না। ব্রাহ্মণ-কন্যা কৈবর্ত্ত-কন্যাকে মাসীমা বলিতেছেন বা ব্রাহ্মণে মুসলমানে খুড়ো জ্যেঠা সম্বোধন, ইহাই ছিল পল্লীর মধুর বন্ধন, ইহাতেই ছিল পল্লীর শক্তি ও সুখ।

থাকো ছিল একটু ঢ্যাঙ্গা; রোগাও নয়, মোটা ত নয়ই; গৌরাঙ্গী, প্রশস্ত সুস্পষ্ট সিন্দূররেখা-সমুজ্জ্বল উন্নত ছিল তাহার ললাট। কপাল-ঢাকা অবগুণ্ঠন সর্ব্বদাই থাকিত। নাকে মাঝারি মাপের একটি টক্‌টকে সোণার নথ। কানে বা গলায় কিছু ছিল-না-ছিল তাহা স্ত্রীলোকেরাই দেখিয়া থাকিবেন। হাতে শাঁখা, নোয়া, আর দুগাছি মোটা বালা। থাকোকে কখনো ধোপদস্ত ধপ্‌ধপে কাপড় পরিতে দেখি নাই, মলিন বাসেও দেখি নাই, টক্‌টকে লালপেড়ে আধ্‌-ময়লা শাড়ী পরিতেই দেখিতাম।

কখনো কোন দিন থাকোকে হঠাৎ দেখিয়া মনে হইয়াছে,—বরাবর এই স্ত্রীলোকটিকে এক ভাবেই দেখিতেছি,—মুখে কথা নাই, খাটুনির বিরাম নাই। বিরক্তিও দেখি নাই, ব'সে গল্প করতেও শুনি নাই; খুব সামর্থ্য বটে। একা বিশ বাড়ীর তোলা-পাট সাম্‌লাইয়া বেড়ায়, অথচ ভদ্র-ঘরের মেয়েদের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। মেয়েদের গয়না পরার সাধ ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে স্বাভাবিক। সেই সাধ ইহার বোধ হয় খুব প্রবল, তাই এত খাটিতে পারে। বাড়ীপিছু আট আনা করিয়া পাইলেও মাসে দশ বারো টাকা হয়। ইত্যাদি।

থাকো এবাড়ী হইতে ওবাড়ী এত দ্রুত চলিয়া যাইত যে, তাহার মুখের একটা ঠিক ছাপ কাহারও চক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না। বহুদিন পরে একবার চকিতে দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলাম,—শান্ত গাম্ভীর্য্যের উপর চক্ষু দুইটিতে যেন প্রসন্নতা ও করুণা মাখানো! কই—এত যাতায়াতের মধ্যে চাঞ্চল্য কোথায়!

আমাদের অতশত ভাবিবার, বুঝিবার, বিশ্লেষণ করিবার বয়স তখন নয়। তরুণ-চাঞ্চল্যের মুখে ওসব ভাব, ওসব চিন্তা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, বিশেষ ছোট-লোক সম্বন্ধে।

যাহা হউক, মানুষের মন কোন একটা বিষয় গ্রহণ না করিতেও পারে, কিন্তু চক্ষু তাহা এড়াইয়া চলিতে পারে না ; প্রায়ই চোখে পড়িত—থাকো এক-ঘটি দুধ লইয়া এবাড়ী ওবাড়ী ফিরিতেছে ; কাহারো কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছে ; কাহারো কোলের ছেলে থাকোর কোলে। কোন দিন প্রত্যূষে গামছার তিন চারিটা ইলিস মাছ লইয়া তিন চার বাড়ী ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি কুটিয়া দিতেছে। কোথাও বাটনা বাটিতেছে। কোন বাড়ী এক কলস গঙ্গাজল আনিয়া দিল ; কাহারো বাড়ী পান সাজিতেছে। এমন ত্বরিত-কর্ম্মী দেখি নাই।

কি ভদ্র, কি ইতর কাহারো বাড়ী ঢুকিতে থাকোর কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না—এটা লক্ষ্য করিয়াছি। অথচ তাহার সম্ভ্রমের প্রতি এত বেশী নজর ছিল যে, মাথার কাপড় অসংযত হইতে, বা পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কখনো দেখি নাই। আর একটি বিষয় নজরে পড়িত—থাকোর এই তোলাপাট প্রধানতঃ গরীব বা পরিজন-বিরল মধ্যবিত্ত বাবুদের বাড়ীতেই ছিল। বড়লোকের বাড়ীতে তাহাকে এ-কাজ স্বীকার করিতে দেখি নাই, বড়লোকের মধ্যে তাহাকে নিয়োগীদের বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়াছি ; সেটার সময়-অসময় বা নিয়মিত সময় ছিল না—সুতরাং কাজের জন্য নিশ্চয়ই নয়।

গ্রামের তিন চার ঘর বড়লোকদের মধ্যে নিয়োগীরা ছিলেন অন্যতম ও আধুনিক, অর্থাৎ এক পুরুষে হালী বড়্‌মানুষ। তাহার মূলে ছিল,—রেড়ির তেলের কলকারখানা ও ফলাও কারবার,—জাহাজী চালান। তাহাতে গ্রামে লোক ও শ্রমিক-সমাগম, কর্ম্মচাঞ্চল্য, বাজার, বসতি, দোকান প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল, ও ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে নব-জীবনের সাড়া আনিয়া দিতেছিল।

নিয়োগী-কর্ত্তা লেখাপড়া সামান্যই জানিতেন ; কর্ম্মবুদ্ধি, শ্রম ও অধ্যবসায়-বলেই তাঁহার বৈভব। সুন্দর অট্টালিকা, গাড়ী-জুড়ি, দাসদাসী, দ্বারবান্ ; বহু পরিজন, বারোমাসে তের পার্ব্বণ, দোলদুর্গোৎসব, ক্রিয়া-কলাপ, দান-দাক্ষিণ্য, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, ভোজ, গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করা, সবই তাঁহার ছিল ; আর ছিল—এক পুত্র ও একটি নাতি। তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্ম, সামাজিক বিদায়, বস্ত্র-বিতরণ, কাঙ্গালী-ভোজন, দুর্গাপ্রতিমা, প্রতিমার সাজ

এ সবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল,—কোথাও কুণ্ঠার চিহ্ন মাত্র থাকিত না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি—"বাগবাজারের পোলের এ'পারে ইদানীং আর এরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম অন্য কোথাও দেখা যায় না।" আমরাও দেখি নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল—নিয়োগী-বাড়ীর শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মী-পুজা। সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীপ্রতিমা, সাজ-সমারোহ, আয়োজন, উপকরণ, ভোজ আর কোথাও দেখি নাই। তাহার ব্যয় দুর্গোৎসবের ব্যয়ের তুল্য বা সমধিক ছিল। এই উপলক্ষে—রাত্রি-জাগরণচ্ছলে যে আনন্দোৎসবের আয়োজন হইত, তাহারও বিশেষত্ব ছিল। গ্রামের লোকে যে-বৎসর যাহা দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই ব্যবস্থা করা হইত। তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির ভাগ্যে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সখের কি পেশাদার অপেরা, থিয়েটার, যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি দেখিবার শুনিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের সর্ব্বসাধারণকে প্রীতি ও আনন্দ-দানের উৎসাহ ছিল বলিয়া, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া—ধরণী ঠাকুরের কথকতা, জগা স্যাকরার চণ্ডী, প্রভৃতি বিশেষ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানগুলিও মধ্যে মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া চলিত। তাহাতে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দলাভ, শিক্ষা ও চিত্তপুষ্টি সহজেই হইত। এসব ছিল নিয়োগী মহাশয়ের "ছিল"র দিক্;—ছিল না কেবল—বনিয়াদী-বুদ্ধি-ঢাকা ব্যয়-বর্জনের পাকা হিসিবি-চাল ও চাপা হাসির মধ্যে বিদ্রূপ-মিশ্রিত বিজ্ঞ বক্তৃতা।

এরূপ সংসারে আর যা কিছু থাকুক না থাকুক—কুড়ে আর কু-পোষ্যের অভাব থাকে না। তাঁরও কুকুর বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিপাল্য জুটিয়াছিল।

তিনি একদিন আহারের সময় একটি বিড়ালকে দেখিতে না পাওয়ায়, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া মাছ খাওয়ায়, তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আমার এ শুভাকাঙ্ক্ষী উপকারীটি কে? পেটের জ্বালায় ভদ্রলোকেও চুরি করে;—সে খেতে পেলে হাঁড়ি ভাঙ্তে যাবে কেন? সকলে জেনে রেখো—আমি মুখ্খু চাষা, এই গ্রামেই মুড়ি-মুড়কি বেচেছি। এ ধন-দৌলত 'মা'র, আমি মজুর;—কার ভাগ্যে এ সব আসে, আর কাদের জন্যে তিনি

দেন, তা জানি না। এতে সবারই অধিকার আছে। এ বাড়ীতে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের তাড়াবার অধিকার কারু নেই। যত দিন নেউগীর একমুটো জুটবে—তাদেরও জুটবে।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন,—আহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল। * * *

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"এখন দু'টো পান পাব কি? আজ আর কলকেতা যাওয়া হ'ল না, শঙ্করীকে খুঁজে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গৃহিণী পানের ডিপে কর্ত্তার হাতে দিয়া বলিলেন,—"বেলা তিনটের পর কিছু খেতে হবে কিন্তু। শঙ্করী ত' এখন বাইরের লোক, তায় স্ত্রীলোক, —তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, গয়লা-বউ সাত-দেশ বেড়ায়— শঙ্করীকেও চেনে, আমি তাকেই ধরছি।"

কর্ত্তা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন ও বলিলেন,—"কিন্তু আনাই চাই।" তাহার পর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন,—"হ্যাঁ—বুধুয়ার বৌয়ের আর কোন কষ্ট নেই ত'? বুধুয়া বেটা কি পাজি গো—আমি বরাবর জানতুম ভালমানুষ—বদমাইস ব্যাটা—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গৃহিণী ঈষৎ হাস্য ও কোপ-মিশ্রিত কটাক্ষে— "তুমি চুপ করো ত" বলিয়াই দ্রুত সরিয়া গেলেন। কর্ত্তা বহির্ব্বাটিতে গিয়া বসিলেন ও চাড়ুয্যেমশাইকে সংবাদ দিলেন।

এই চাড়ুয্যেমশাই ছিলেন কর্ত্তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিয়োগী-বাড়ীর সর্ব্বত্রই তাঁহার অবাধ গতি ছিল; তাঁহার নিকট কর্ত্তার কিছুই গোপন ছিল না। উভয়ের মধ্যে একত্র ওঠা-বসা, হাস্যালাপ, সলা-পরামর্শ নিত্যই ছিল। নিয়োগী-বাড়ী ও নিয়োগী-কর্ত্তা সম্বন্ধে ইহার অধিক জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই,—এই সংক্ষিপ্ত সারটুকুই যথেষ্ট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বড়লোকদের বাড়ীর মধ্যে কেবল এই নিয়োগী-বাড়ীতেই থাকোর সহজ গতিবিধি দেখিয়াছি। কর্ত্তা ও চাড়ুয্যেমশাই সদর বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া গল্পাদি করিতেন, থাকোকে কখনো কখনো এক আধ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রশ্নের বা ইঙ্গিতের জবাব দিতেও শুনিয়াছি।

এক দিন থাকোকে নিয়োগীবাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া কর্ত্তা কথাচ্ছলে চাড়ুয্যেকে বলিলেন,—"দ্যাখ চাড়ুয্যে, ভগবান্ সব

সুখ দিলেও কপালে না থাকলে—ক'টা সুখই বা লোকে ভোগ করতে পারে।"

কথাটা শেষ না হইতেই থাকো সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল ; —"কারো সুখের হিসেব রাখবার মুহুরিগিরী না ক'রে নিজেরাই সেটা ভোগ করুন না।" বলিতে বলিতে থাকো বাহির হইয়া গেল।

চাড়ুয্যে হাসিয়া বলিলেন,—"ওকে জিততে পারবে না।"

বেলা তিনটার সময় বিড়াল কোলে করিয়া থাকো তাড়াতাড়ি নিয়োগী-বাড়ী ঢুকিতেছিল। সদরেই কর্ত্তা ও চাড়ুয্যেমশাইকে দেখিয়া, কর্ত্তার কোলে শঙ্করীকে দিয়া তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অন্দরে গিয়া ঢুকিল।

কর্ত্তা অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন, শঙ্করীকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাঁহার অল্পই ছিল ; সামলাইয়া বলিলেন,—"এ জাতের অসাধ্য কিছুই নেই,—এরাই একাধারে জগতের সোণার কাঠি রূপোর কাঠি।"

* * * *

দুর্গোৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নিয়োগী-বাড়ীর সাজসজ্জা তেমনি আছে, কারণ চার দিন পরেই শ্রীশ্রীকোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, এবং সে পূজার সমারোহ, ব্যয়, আনন্দ, কোনটিই দুর্গোৎসব অপেক্ষা কম নহে। প্রকৃত কথা—নিয়োগী-বাড়ীর দুর্গোৎসব যেন কোজাগর-পূর্ণিমান্তে—প্রতিপদে শেষ হইত।

এবার কিন্তু একটি ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। একাদশীর রাত্রে পুরোহিত ঠাকুরের মা গঙ্গালাভ করায়, সে-বৎসর তাহার দ্বারা লক্ষ্মীপূজা আর সম্ভব নহে। নিয়োগী মহাশয় এই ঘটনায় বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন ; কারণ, তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা ভঙ্গ করিতে ভয় পান, অথচ এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তরও নাই।

পুরোহিত ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ভাল লোকই এনে দেব,—সুপাণ্ডিত—"

ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়াই চিন্তাকুল কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এ মুখ্খুর বাড়ীর কাজে "টুনি সাহেব"কে ত' (প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সপাল টনি সাহেব) দরকার নেই—পূজা করতে পারেন এমন লোকই দরকার।"

পুরোহিত বলিলেন,—"বেশ—তাই হবে ; কালীঘাটের তন্ত্ররত্ন মশাইকে ঠিক ক'রে আসছি। তিনি নিত্য লক্ষ নাম জপ ক'রে সন্ধ্যার পর একটু দুধ খান।"

কর্ত্তা আরো বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"থামুন থামুন,—লক্ষ্মীপূজো ত' 'গেরোন' নয় যে আমার পূর্ণাভিষেকের জন্যে তান্ত্রিক জাপক চাই। কারু সার্টোফিক্‌ট্ আমাকে শোনাতে হবে না। দুধ খেয়ে শঙ্করীও থাকতে পারে।"

চাড়ুয্যেমশাই পুরোহিত ঠাকুরকে ইসারায় চুপ করিতে বলিয়া স্বয়ং বলিলেন,—"অত-শতয় কাজ নেই, তোমার জানাশোনা একটি ভাল লোক দিলেই হবে।"

কর্ত্তাও সহাস্যে বলিলেন,—"তবে চল, ও কাজ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল ; আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

উভয়ে অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্রী পূজার চা'ল বাছিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া উঠিয়া চাড়ুয্যেমশাইকে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন।

চাড়ুয্যেমশাই আরম্ভ করিলেন,—"কর্ত্তা বিপদে প'ড়ে তোমার শরণ নিতে এলেন—"

মৃদুহাস্যে কর্ত্রী বলিলেন,—"বিপদ্‌টা কি শুনি, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি!"

চাড়ুয্যে বলিলেন,—"লক্ষ্মীর চিন্তাই ওই ; কিন্তু আজ একটু রকম-ফের আছে। পুরুতঠাকুরের মা'র গঙ্গালাভ হয়েছে—শুনেই থাকবে।"

কর্ত্রী সহজ ভাবেই বলিলেন,—"আহা, ব্রাহ্মণের মেয়ে বেশ গেছেন।"

কর্ত্তা চাড়ুয্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"শুনলে চাড়ুয্যে, আমরা যেন আচার্ষি-বাড়ী জানতে এসেছি, তিনি ভাল গেছেন কি মন্দ গেছেন, কোন' দোষ পেয়েছেন কি না।" পরে গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"বেশ গেছেন! আমার মাথা! তুমি আমার বিপদ্‌টি ত' আর ভাব্‌লে না ; কেন—আর পাঁচটা দিন তাঁর সবুর সইল না।"

কর্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া সহাস্যে বলিলেন,—"ওমা—একবার কথা শোনো! তিনি ঢের সবুর সয়েছেন ; মেয়েমানুষের অত বেশী বাঁচা ভাল নয়।"

কর্ত্তা স্ত্রীর মুখে ঐ বাঁচাবাঁচির কথাটা শুনিলে বড়ই কাহিল বোধ করিতেন ; তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"তোমার কাছে ও কথা শুন্‌তে ত' কেউ আসেনি।"

গৃহিণী মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"না শুনলেই বুঝি এড়ানো যায়। আচ্ছা থাক্‌। তা পুরুতঠাকুরের মা মরায় তোমার এত দুর্ভাবনা কেন?—যা পারবে দিও।"

কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার সেই ভাবনায় ত' ঘুম হচ্ছে না। বলি—পূজা করবেন কে—সেটা ভেবেছ?"

গৃহিণী গাম্ভীর্য্যের ভান করিয়া বলিলেন—"তাই ত'—মস্ত ভাবনার কথা বটে।" তার পর সহজভাবে বলিলেন,—"আমরা যাঁর যজমান সে ভাবনা তাঁর, তিনিই ব্রাহ্মণ দেবেন। সে কথা ত' তাঁকে ব'লেই দিয়েছি।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"বটে? কি রকম ব্রাহ্মণের কথা বল্‌লে শুনি?"

গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ যাচাই-বাচায়ের ভার সদ্‌গোপেরা আবার কবে থেকে নিলে? তুমি আগোড়পাড়ার ইংরিজি ইস্কুলে গিছ্‌লে না কি। পুরুত হ'য়ে লক্ষ্মীপুজো করবেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হ'লেই হ'ল,—তার আবার এ-রকম ও-রকমটা কি?"

কর্ত্তা কেবল চাড়ুয্যের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"দেখ্‌লে—কেমন সহজে মিটে গেল।"

চাড়ুয্যেমশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাইকোর্ট যে!"

*   *   *   *

আজ শ্রীশ্রীকোজাগর-লক্ষ্মীপূজা। মা—পদ্মাসনা,—কমলালয়া।

গ্রামের মধ্যস্থলে নিয়োগী মহাশয়ের গোলাপী রঙ্গের বাড়ী আজ মা'র আবির্ভাবের অপেক্ষায়—সৌন্দর্য্যে, সজ্জায়, শোভায়, সৌরভে, পদ্মের মতই দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে আবাহনের সুরে সানাই আকাশে বাতাসে সুমধুর নিবেদন পাঠাইতেছে। গ্রামের বালক-বালিকারা ভ্রমরের মত আনন্দ-গুঞ্জন তুলিয়া দলে দলে যাতায়াত করিতেছে।

সন্ধ্যা হইল। পুষ্পমাল্যবেষ্টিত ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, সেজ্‌ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দালানের জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা দেবদ্যুতি বিকীর্ণ করিলেন

পূজা-সম্ভার, উপকরণ-পারিপাট্য, পুষ্পপ্রাচুর্য্য ও বিবিধ সুগন্ধ দ্রব্যের মধ্যে তৃপ্তি-প্রফুল্ল পবিত্র মনে পূজারী পূজারম্ভ করিলেন।

পূজা শেষ হইল।

পূজারী শেষ-আরতি করিতে উঠিলেন—তন্ময়, যন্ত্রবৎ। গাঢ় সুগন্ধ ধূমাবরণে এক একবার জ্যোতির্ম্ময়ী মা'কে কি লোকাতীতই দেখাইতেছিল! মধ্যে মধ্যে পূজারীর কণ্ঠনিঃসৃত মা-মা রব কানে আসিতেছিল,—অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয়! সে যেন কোন সুদূরের,—এ পৃথিবীর নয়! শেষ আরতি শেষ হইল। পূজারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সকলেই প্রণাম করিল;—সকলেই মুগ্ধ, আবিষ্ট ও স্তব্ধ।

পূজার দালানের দক্ষিণ গায়ে স্ত্রীলোকদের অন্দর হইতে যাতায়াতের একটি দ্বার আছে; পূজারী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ওগো মায়েরা—এ বাড়ীর গিন্নীমাকে এখানে একবার আসতে বলুন।"

ফিরিয়া দেখি—সেই পূর্ব্ব-পরিচিত বেশে থাকো উপস্থিত হইয়া বলিতেছে—"আপনি কি আমাকে ডাক্‌চেন?"

পূজারী বলিলেন,—"না, তোমাকে ডাকিনি, এ বাড়ীর গিন্নীকে এখানে একবার ডেকে দিতে বল্‌চি।"

থাকো ধীরভাবে বলিলেন,—"তার প্রতি কি আদেশ বলুন।"

পুরোহিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তাঁর প্রতি এখানে আসতে আদেশ।"

থাকোকে তখনো দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, কি ভাবিয়া ব্রাহ্মণ একটু শান্তভাবে বলিলেন,—"বোলো, তিনি না এলে আমি দর্পণ বিসর্জন করতে পারচি না, অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এখনি ভোজ আর নাচ-গান দিয়ে দালান-উঠোন একাকার হ'য়ে যাবে, তার আগে আমার সমাপ্ত করা চাই,—যেন বিলম্ব না করেন।"

থাকো বিনীতভাবে বলিল,—"আমি ত আপনার আদেশ পালন করবার জন্যে উপস্থিত রয়েছি, আপনি কি বলবেন বলুন না।"

পুরোহিত চকিতভাবে থাকোর মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল তাহার আধ-ময়লা কস্তা-পেড়ে কাপড়ই দেখিয়াছিলেন। আবিষ্টের

মত বলিলেন,—"ওঃ—তা না ত' কি মা নিজে আসেন! কি ভুল-ই করেছি। আমি নূতন লোক—আজ মাত্র এসে—কিছু মনে ক'র না মা।"

থাকো বাধা দিয়া বলিল,—"ও-সব কি বল্‌চেন বাবা,—আমাকে কি কর্‌তে হবে বলুন।"

পূজারী যে নিজে বড় লজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহার কথায় সেইটুকুই প্রকাশ পাইল; কিন্তু বাস্তবিক তিনি থাকোর দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। চট্‌কা-ভাঙ্গার মত বলিলেন,—"হ্যাঁ—তা তুমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বে। দ্যাখ মা,—কৃপাময়ী আজ এখানে স্বয়ং উপস্থিত, তোমার যা কিছু প্রার্থনা থাকে—মাকে জানিয়ে প্রণাম কর, আজ তোমার কোন কামনাই ব্যর্থ হবে না—আমার এই কথাটি মনে রেখ, মা। এই জন্যই তোমাকে ডেকেছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলটি গলায় দিয়া থাকো বদ্ধাঞ্জলি হইতেই, পূজারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"ওকি মা, তবে কি আমার কথাটা তোমার বিশ্বাস হ'ল না! খুব সাবধান, আগে বেশ মনস্থির ক'রে অভীষ্টটি ভেবে-চিন্তে নাও; মনে রেখ—এ শুধু প্রতিমা প্রণাম করা নয়,—একাগ্রচিত্তে মার কাছে আজ যা চাইবে তাই পাবে। গরীব ব্রাহ্মণের কথা অবিশ্বাস কোরো না।"

বিনীত কণ্ঠে—"আমার যে ভাবা আছে বাবা," বলিয়াই থাকো প্রণতা হইল।

পূজারী তাহার প্রতি চাহিয়া অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"আমার কথার গুরুত্বটা একবার ভাব্‌লেও না!" এই কথাটাই তাঁর সমস্ত শরীর-মনকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল,—একটু অভিমানও অনুভব করিতে লাগিলেন।

মিনিট-দুই মধ্যে থাকো চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিতেই পূজারী আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"এত বড় গুরুতর বিষয়ে তোমার এই তাচ্ছিল্য-ভাব দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি;—আমার কথাটা তা-হ'লে বিশ্বাস করনি দেখছি! যাক্—যদি গোপন রাখ্‌বার মত কিছু না হয় ত' মা'র কাছে কি প্রার্থনা করলে—বলবে কি?"

"গোপন কি বাবা, মেয়েদের—বিশেষ ক'রে 'মায়েদের' যা সবার বড় কামনা—মাকে তাই জানিয়েছি।" এই ব'লে থাকো নীরব হইল।

পূজারী মূঢ়বৎ চাহিয়া বলিলেন,—"বুঝতে পার্‌লুম না যে মা।"

থাকো নিম্ন-দৃষ্টিতে সলজ্জভাবে বলিল,—"বাবা,—মা আমাকে কৃপা ক'রে সব সুখ দিয়েছেন,—স্বামী, একটি ছেলে, একমাত্র নাতি, আর এই যা কিছু দেখছেন। বড় ভয়ে ভয়ে এতদিন ভোগ করচি। বড় সুখের সঙ্গে বড় ভয়ও থাকে, বাবা! তাই মা'কে বললুম—এই সুখের মাঝখানে—সব অটুট থাকতে থাকতে, তিনি দয়া ক'রে আমাকে তাঁর পাদপদ্মে নিয়ে নিন।"

পূজারী বিচলিতের মত বলিয়া উঠিলেন,—"অঁ্যা—করলি কি মা! এ কি সর্ব্বনাশ করলি। আমি যে এত ক'রে বল্‌লুম—খুব সাবধান—মা উপস্থিত—আজ যা চাইবে তাই পাবে।"

থাকো বলিল,—"তাই ত' চেয়েছি, বাবা।"

পূজারী এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়া ফেলিলেন,—"আমার মাথা চেয়েছ,—এত ঐশ্বর্য্যের, এত সুখের মধ্যে, এ কি চাওয়া। আমি মিছে এত শাস্ত্র ঘেঁটে মলুম,—তোমাদের চিন্‌তে পারলুম না।"

সুমধুর বিনম্র কণ্ঠে—"আপনি যে 'মেয়েলি-শাস্তোর' পড়েননি বাবা।" বলিতে বলিতে থাকো চক্ষের নিমেষে পুরোহিতের পদধূলি লইয়া, বিজয়িনীর মত হাসিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিল।

পুরোহিত বিমূঢ়বৎ—অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

* * * *

তাহার পর কয়েক মাস গত হইয়াছে। একদিন প্রাতে দেখি গ্রামের ইতর-ভদ্র স্ত্রীলোকেরা—মায় বৌ-ঝি, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অসংযত,—গঙ্গার ঘাটে ছুটিয়াছে।

কারণটা জানিবার জন্য একজন বর্ষীয়সীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—"আরে বাবা, সর্ব্বনাশ হ'ল, আমাদের থাকো চল্‌লো।"

গত কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার কথাটা স্মরণ হওয়ায় বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

গিয়া দেখি—ঘাটে লোকারণ্য। সকলেরি বদনে বিষাদ, নয়নে জল, কণ্ঠে 'হায়-হায়' ছাড়া ভাষা যেন স্বয়ং মূক হইয়া গিয়াছে। থাকোকে শায়িত অবস্থায় সেই পরিচিত বেশেই দেখিলাম,—সেই লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী,—সেই নথ,—সেই শাঁখা আর বালা।

ভাষা পাইলাম কেবল কর্ত্তা ও গৃহিণীর মুখে।

থাকো বলিতেছে,—"ছিঃ, পুরুষ মানুষের অমন হ'তে নেই, পায়ের ধূলো দাও।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"ভগবান্ এতটা দিলেন, সে সুখ একদিন ভোগ করলে না, এই আমার দুঃখ।"

থাকো সিক্তকণ্ঠে বলিল,—"ওগো, তুমি জান না,—আমার এত সুখ যে তা সয়ে থাকতে আর সাহস হচ্ছিল না ; মেয়ে মানুষের অত সুখ বেশী দিন করবার লোভ রাখতে নেই গো।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাত দু'খানি কষ্টে বক্ষের উপর তুলিয়া জোড় করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চক্ষু বুলাইয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"এঁদের—নিয়ে—থে—ক।" হাত আর মাথায় উঠিল না,—দুই ধারে পড়িয়া গেল।

চাড়ুয্যেমশাই বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন ; শতকণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল।

দর্পণ-বিসর্জ্জন শেষ হইয়া গেল। পল্লীলক্ষ্মী বিদায় লইলেন।